مَعَ النَّبِيِّ ﷺ-এর অনুবাদ

নবীজির ﷺ পাঠশালা

আদহাম শারকাভি

নবীজির পাঠশালা ﷺ
আদহাম শারকাভি

অনুবাদ : মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
সম্পাদনা : আহমাদ ইউসুফ শরীফ
প্রুফ সমন্বয় : হাসমাদ রাগিব
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
পৃষ্ঠাসজ্জা : সাজ্জাদ হোসেন রাকিব

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ এর অনুবাদ

নবীজির ﷺ পাঠশালা

আদহাম শারকাভি

মাকতাবাতুল আসলাফ

নবীজির পাঠশালা ﷺ
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২০
ISBN : 978-984-94066-7-9

অনলাইন পরিবেশক

নিয়ামাহ বুক শপ
০১৭৫৮ ৭১ ৫৪ ৯২
www.niyamahshop.com
/niyamahbook
ঘরে বসে যেকোনো বই যেকোনো সময়ে

মূল্য : ৪১৫ টাকা

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

Nobijir Pathshala a translation of Ma'an Nabi by Adham Sharkavi published by Maktabatul Aslaf of Bangladesh.

মাকতাবাতুল আসলাফ

দোকান নং ১৮, আন্ডারগ্রাউন্ড
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

ভেতরের পাতায়

৭	লেখক পরিচিতি
৯	সাদাকাহ
১৫	ইবাদতপ্রাণ জুরাইজ
২২	আসিয়া বিনতে মুযাহিম
২৮	দ্বীন এবং সঠিক পন্থা
৩৩	মেঘখণ্ড
৩৯	মুগিস ও বারিরা
৪৪	স্বর্ণের কলস
৪৯	ফেরাউন-কন্যার চুল আঁচড়াত যে বাঁদি
৫৫	কুষ্ঠ, টাক ও অন্ধ ব্যক্তি
৬৪	মদ
৬৯	কাঠের পা
৭৫	সারা এবং ফিরআউন
৮২	আদম ও মুসা আলাইহিমাস সালাম-এর আলাপচারিতা
৮৯	শত মানুষের হন্তারক যে ব্যক্তি

৯৮ গুহায় আটকে-পড়া তিন ব্যক্তি

১১৩ সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর ফায়সালা

১২২ বংশীয় গৌরব

১২৮ দুগ্ধপোষ্য সন্তান

১৩৪ স্বপ্ন

১৫২ উট হারিয়ে ফেলা সেই ব্যক্তিটি

১৫৯ আসহাবুল উখদুদ

১৭৫ আলেমকে উপদেশদানকারী নারী

১৮৩ সালেহ আলাইহিস সালাম-এর উটনী

১৯১ হাজেরা ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম

২২৪ মুসা আলাইহিস সালাম ও খিজির আলাইহিস সালাম

২৪৪ নিজের ওপর জুলুমকারী ব্যক্তিটি

২৫৩ ইউনুস আলাইহিস সালাম

২৬৪ ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম

২৭২ রাসুল-কন্যা যাইনাব ও আবুল আস ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

২৮৭ আল্লাহর ওপর স্পর্ধা প্রদর্শনকারী

২৯৫ জাহেলি যুগের প্রথম শপথগ্রহণের ঘটনা

লেখক পরিচিতি

ড. আদহাম শারকাভি একজন ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত দায়ি। জন্ম ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী লেবাননের 'সুর' তথা টাইর শহরে। পড়াশোনা করেছেন আরবী সাহিত্যে। ড. শারকাভি বৈরুতের الجامعة اللبنانية তথা লেবানিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে ডিগ্রী অর্জন করেন। এবং পরবর্তীতে সেখানেই আরবী সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে।

পড়াশোনা শেষে আরবী ভাষায় লেখালেখির মাধ্যমে দাওয়াহর কাজে মনযোগী হন। লেখালেখি করতেন 'কিস বিন সাঈদাহ' ছদ্মনামে। ২০১২ সালে তার প্রথম বই 'হাদিসুস সাবাহ' প্রকাশিত হয়।

এছাড়া তার রচিত অন্যান্য বই হচ্ছে—

- কিশ মালিক,
- ইনদামা আলতাকাইতু উমার বিন খাত্তাব,
- হাদিসুল মাসা,
- আন শাইয়িন ইসমুহুল হুব্ব,
- রিওয়াআতু নাবজ,
- রিওয়াআতু নুতফাহ,
- রিওয়াআতু লিইয়াত্বমাইন্না ক্বলবি,
- লিরিজালি ফাকত্ব,
- ওয়া ইযাস সুহুফু নুশিরাত,
- আন-ওয়াতানি মিন লাহমি ওয়া দাম্মি,
- ওয়া তিলকাল আইয়্যাম ইত্যাদি।

আলোচ্য 'মাআন নাবী ﷺ' বইটি ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ড. শারকাভি বিবাহিত। তিনি এক ছেলে ও তিন কন্যা সন্তানের জনক। আল্লাহ তার কলমকে উম্মাহর কল্যাণার্থে কবুল করুক।

সাদাকাহ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ

> *'(পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য থেকে) জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু সাদাকাহ করব। অতঃপর সে সাদাকাহর মাল নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) এক চোরের হাতে তুলে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—"(কাল রাতে) এক চোরকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে।" তা শুনে দানকারী বলল, "আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য, আজ আমি অবশ্যই সাদাকাহ করব।" এবার সে সাদাকাহ নিয়ে বের হয়ে (না জেনে) এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে এল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—"রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে।" লোকটি বলল, "আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য, তবুও আমি সাদাকাহ করব।" এরপর সে সাদাকাহ নিয়ে বের হয়ে কোনো এক ধনী ব্যক্তির হাতে তুলে দিল। সকালে লোকেরা*

বলতে লাগল—“ধনী ব্যক্তিকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে।” লোকটি বলল, “আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য, (আমার সাদাকাহ) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ল!” পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো— “চোর তোমার সাদাকাহ পেয়েছে, হয়তো (এ কারণে) সে চুরি করা থেকে বিরত থাকবে; তোমার সাদাকাহ ব্যভিচারিণী পেয়েছে, হয়তো (এ কারণে) সে তার ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকবে; আর ধনী ব্যক্তি তোমার সাদাকাহ পেয়েছে, হয়তো (এ থেকে) সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে সাদাকাহ করবে।”’[১]

প্রথম পাঠ

এটা মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস—আপনি কোনো মন্দ কাজের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললে তারা বলবে, এ তো দেখি কাপুরুষ! দান-সাদাকাহ করলে বলবে, লোক দেখিয়ে বেড়ায়! বিদগ্ধ-বিজ্ঞজনের সঙ্গে ওঠাবসা করলে বলবে, চাটুকারিতা করে! গুনাহে-লিপ্ত-ব্যক্তির সঙ্গে মুসাফাহা করলে বলবে সে তো তারই মতো! স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ করলে বলবে, সে তো একটা গৃহপালিত মেষ-শাবক! তাদের সঙ্গে গুনাহের কাজে লিপ্ত না হলে বলবে, লোকটি রুক্ষ স্বভাবের, একেবারে রসকষহীন! তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘুষের মতো উপরি উপার্জন গ্রহণ না করলে বলবে, এ তো দেখছি আস্ত বেকুব!

একজন নারী পর্দা করলে তারা বলবে, মেয়েটি আধুনিকতার কিছুই বুঝে না! হিজাব-নিকাবে চেহারা ঢেকে রাখলে বলবে, তার চেহারা নিশ্চয় কুৎসিত! স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করলে বলবে, মেয়েটির আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই!

আপনি তাই এদিক সেদিক না দেখে, লোকের কথায় কান না দিয়ে নিজের বেছে নেয়া সঠিক পথে অবিচল থাকুন। মানুষকে খুশি করতে নিজেকে সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে সরিয়ে নেবেন না।

ভালোভাবে যদি মানুষের অবস্থাদি খেয়াল করেন তবে দেখবেন, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতিই সন্তুষ্ট হতে পারেনি! মানুষের প্রতি আর কীভাবে হবে?

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৪২১

দ্বিতীয় পাঠ

হাতে ধরে ধরে মানুষকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসুন!

তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন—বিপথগামী বান্দাদের সুপথে ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন।

মানুষ যদি পুরোপুরি আল্লাহ তাআলার অনুগত হতো, তাহলে তো আর নবী-রাসুলের খুব কোনো প্রয়োজন হতো না।

সত্য দ্বীনের পথ ছেড়ে যারা বিচ্যুতির দিকে পা বাড়িয়েছে তাদের জন্যই আল্লাহ তাআলা নবী-রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন।

ফিরআউনের মতো দাম্ভিক দুরাচার যখন বলে বসল, 'أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى'–'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু' [১], আল্লাহ তাআলা তখন তার কাছে মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে পাঠিয়ে বলে দিলেন, 'فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى'—'আর আপনারা দুজন তার সঙ্গে নম্রভাষায় কথা বলবেন। এতে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।' [২]

যারা নিজেদের উপাস্য প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ তাআলার কন্যা-সন্তান বলার মতো অপরাধ করেছিল তাদের কাছে তিনি সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

অতএব মানুষের অপরাধের দিকে এমনভাবে তাকাবেন না যে, আপনিই তাদের পালনকর্তা; বরং এমনভাবে তাকান যে, আপনিও তাদের মতো একজন বান্দা।

হেদায়াতের পথে চলার যে নেয়ামতে আল্লাহ তাআলা আপনাকে ধন্য করেছেন তার আলোকে মানুষের হাত ধরে ধরে তাদেরকে আল্লাহর দিকে নিয়ে আসুন। নিজের শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে আপনি মানুষকে হেদায়াত দান করতে পারবেন না। বরং আপনি যে হেদায়াতের পথে চলছেন তা আল্লাহ তাআলারই দেয়া অনুদান। একজন বিপদগ্রস্ত মানুষকে আপনি যতটা দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, একজন গুনাহগারকে হেদায়াতের পথে আনতে একই দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখুন। আদর্শিক বিচ্যুতির তুলনায় রোগশোক খুবই সামান্য বিষয়। একজন

[১] সূরা নাযিয়াত, আয়াত-ক্রম :২৪
[২] সূরা ত্ব-হা, আয়াত-ক্রম : ৪৪

মানুষ শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে এর বিনিময়ে সে সওয়াব অর্জন করে বা গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু একজন মানুষের চিন্তা-চেতনা অসুস্থ হয়ে পড়লে, আদর্শিক বিচ্যুতি ঘটলে তার পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

তৃতীয় পাঠ

এ কথাতে কোনো ভুল নেই যে, আমাদেরকে মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে আপনাকে হতে হবে প্রখর ধী-শক্তিসম্পন্ন চৌকষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যাতে একজন মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আপনি ধোঁকায় পড়ে না যান। এমন অনেক গুনাহগার বান্দা আছে যারা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসে। আমাদের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধান্ধাবাজ ধর্মব্যবসায়ীদের চাইতে তারা আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বহুগুণ বেশি ভালোবেসে থাকে। তবে শয়তানের কুমন্ত্রণা আর প্রবৃত্তির তাড়নার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তারা আজ গুনাহের গড্ডালিকায় ভেসে যাচ্ছে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত—

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

> *'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এক লোক ছিল। যার নাম ছিল আবদুল্লাহ আর ডাকনাম হিমার। সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হাসাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*

> *তাকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন। তাকে চাবুক মারা হলো। তখন তার গোত্রের এক লোক বলল, "হে আল্লাহ! আপনি তার উপর লানত (অভিসম্পাত) বর্ষণ করুন! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হলো!" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ্ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসে।"'* [১]

অন্তর এক গোপন রহস্যের আধার। যার ভেতরের অবস্থা জানেন একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলা। যে পর্দা করে না সে তো আর সরাসরি ব্যভিচারিণী নয়। যে গান-বাদ্য শুনে সে তো আর কুরআন তেলাওয়াতকে অপছন্দ করে না। আমি এ কথা বলছি না যে, পাপাচারে লিপ্ত লোকজন গুনাহ করেও নির্দোষ! কিংবা তাদের পক্ষপাতিত্বও করছি না। আমি কেবল বলছি যে, তাদের ফিরে আসার পথ রুদ্ধ নয়। আপনি হাতে ধরে ধরে তাদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসুন।

চতুর্থ পাঠ

আমরা যদি মানুষের সঙ্গে বিনম্র আচরণে অভ্যস্ত হতে না পারি তবে মানুষের সামনে দ্বীনদারদের যে রুক্ষ ও মন্দ চিত্র দাঁড়াবে তার জন্য আমরাই দায়ী থাকব।

এতে তারা হয়তো গুনাহের পথ ছেড়ে আমাদের মতো এমন কাঠখোট্টা ধার্মিক হওয়ার পথ ধরতে চাইবে না। আমরা যদি মানুষের জন্য আদর্শ হয়ে উঠতে না পারি তাহলে মানুষকে দোষারোপ করাও আমাদের উচিত হবে না। কারণ, তারা নিশ্চয়ই আমাদের মতো দ্বীনদার হতে চায় না। অতএব সৃষ্টির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে আমরা যেন আবার আল্লাহ্ তাআলাকে ক্রুদ্ধ না করে বসি!

নিয়মিত নামাজি ব্যক্তির সামান্য মুসাফাহা একজন বেনামাজিকে মসজিদে আনতে পারে। পর্দাশীলা নারীর একটু মুচকি হাসি এবং মিষ্টি কথা একজন পর্দাহীনা নারীকে হিজাব-নিকাবের পথে আনতে পারে। একজন অনুগত বান্দার একটু সুমিষ্ট কথা আল্লাহর অবাধ্য বান্দাকে আনুগত্যের পথে টানতে পারে। যদি আপনার সদাচরণে অন্যের মধ্যে এইসব পরিবর্তন নাও ঘটে তাহলেও আপনি কমপক্ষে দাওয়াতের সওয়াব তো পেয়েই যাবেন (ইনশাআল্লাহ)।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৭৮০

হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তিটি যথাক্রমে একজন চোর, ব্যভিচারিণী ও (কৃপণ) ধনীকে সাদাকাহ দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তো তাকে এ কথা বলেননি—'যদি তুমি কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সাদাকাহ করতে তাহলে তা অধিক ফলপ্রসূ হতো। যদি তুমি কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে সাদাকাহ করতে তাহলে তা অধিক উত্তম হতো। যদি তুমি কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে সাদাকাহ করতে তাহলে তা অধিক উপকারী হতো!' বরং (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হয়েছে—আল্লাহ তার সাদাকাহ কবুল করেছেন। আর আমল কবুল হওয়ার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তার আমল কবুল হওয়ার কারণে চোর হয়তো চৌর্যবৃত্তি ছেড়ে দেবে। ব্যভিচারিণী নারী হয়তো ব্যভিচার ছেড়ে দেবে। (কৃপণ) ধনী লোকটি হয়তো তার অনুসরণ করবে (অর্থাৎ নিজের মাল থেকে দান-সাদাকাহ করতে শুরু করবে)।

ইবাদতপ্রাণ জুরাইজ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: اللهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ، فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ، قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ مِنْكَ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي، قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: لَا، أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا.

> *'জুরাইজ ছিলেন একজন ইবাদতপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি একটি ইবাদতখানা তৈরি করে সেখানে অবস্থান করতেন। একদিন তার কাছে তার মা এলেন। তিনি তখন নামাজে নিমগ্ন ছিলেন। মা ডাকলেন, "হে জুরাইজ!"*

তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! (একদিকে) আমার মা আর (অন্যদিকে) আমার নামাজ। এই বলে তিনি নামাজেই নিমগ্ন রইলেন। (ডাকে সাড়া না পেয়ে) মা ফিরে গেলেন। পরের দিন তিনি আবার এলেন। জুরাইজ সেদিনও নামাজ আদায় করছিলেন। মা ডাকলেন, "হে জুরাইজ!" আজও তিনি (মনে মনে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! একদিকে আমার মা (আমাকে ডাকছেন) আর (অন্য দিকে) আমার নামাজ। এরপর তিনি নামাজেই মশগুল রইলেন। মা ফিরে গেলেন। পরের দিন আবার এলেন। সেদিনও তিনি নামাজে নিমগ্ন ছিলেন। এবারও (মা) ডাকলেন, "হে জুরাইজ!" তিনি (মনে মনে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! (একদিকে) আমার মা (আমাকে ডাকছেন), (অন্যদিকে) আমার নামাজ। এরপর তিনি নামাজেই নিমগ্ন রইলেন। বিরক্ত হয়ে এবার তার মা বদদুআ করলেন, "হে আল্লাহ! দুশ্চরিত্রা নারীর সম্মুখীন করার আগ পর্যন্ত তুমি তার মৃত্যু দিয়ো না।"

এরপর বনি ইসরাইলের মধ্যে জুরাইজ ও তার ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল। সেখানে (বনি ইসরাইলের মধ্যে) এক দুশ্চরিত্রা নারী ছিল যার সৌন্দর্যের উপমা দেয়া হতো। সে বলল, "যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের সামনে তাকে (জুরাইজকে) ফিতনায় ফেলতে পারি।" এরপর সে জুরাইজের সামনে নিজেকে মেলে ধরল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলেন না। অবশেষে সে এক মেষ-রাখালের কাছে গেল। লোকটি জুরাইজের ইবাদতখানার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করত। দুশ্চরিত্রা নারী তাকে নিজের দিকে প্রলুব্ধ করল। ফলে সে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে (অপকর্মে জড়িয়ে পড়ল)। এতে নারীটি গর্ভবতী হয়ে গেল। যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন বলে দিল যে, এ সন্তান জুরাইজের। লোকেরা (এ কথা শুনে) জুরাইজের কাছে এসে জড়ো হলো এবং তাকে ইবাদতখানা বেরিয়ে আসতে থেকে বাধ্য করল। তারা তার ইবাদতখানা ভেঙে তাকে বেদম প্রহার করতে আরম্ভ করল। তিনি জানতে চাইলেন, "হয়েছেটা কী, (তোমরা আমাকে এভাবে মারছ কেন)?" তারা বলল, "তুমি তো এ দুশ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছ এবং তোমার ঔরসে

সে সন্তানও প্রসব করেছে।” তখন তিনি বললেন, “শিশুটি কোথায়?” তারা শিশুটিকে নিয়ে এল। এরপর তিনি বললেন, “আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি নামাজ আদায় করে নিই।” তারপর তিনি নামাজ আদায় করলেন। নামাজ-শেষে শিশুটির কাছে এসে তার পেটে টোকা দিয়ে বললেন, “বেটা! তোমার পিতা কে?” (কুদরতের ফায়সালায় সঙ্গে সঙ্গে) শিশুটি উত্তর করল, “অমুক রাখাল।” বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা জুরাইজের দিকে এগিয়ে এল এবং তাকে চুম্বন করতে লাগল আর তার গায়ে হাত বুলাতে লাগল। বলতে লাগল, “আমরা আপনার ইবাদতখানা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করে দেবো।” তিনি বললেন, “না, বরং পুনরায় মাটি দিয়ে তৈরি করে দাও, পূর্বে যেমন ছিল।” লোকেরা তাই করল।’[১]

প্রথম পাঠ

অনেক সময় কথার দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ মুখে একটা কথা বলল আর তা কবুল হয়ে গেল। তাই সন্তানদের বিরুদ্ধে কখনো বদদুআ করা যাবে না। কেননা এ বদদুআ এমন সময় হয়ে যেতে পারে যখন দুআ কবুল হয়ে থাকে।

একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, তার হাত অবশ হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হাতে কী হয়েছে? লোকটি বলল, জাহেলি যুগে আমার পিতা আমার হাত অবশ হয়ে যাবার জন্য বদদুআ করেছিলেন তাই তা অবশ হয়ে গেছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহু আকবার! জাহেলি যুগের পূর্বপুরুষদের বদদুআ ইসলামে আসার পরও কীভাবে কার্যকর হয়ে গেল![২]

চলুন আমরা বদদুআর পরিবর্তে কল্যাণ কামনা করে দুআ করি।

কী আশ্চর্যের কথা—একটি মেয়ে সামান্য একটি পাত্র ভেঙে ফেললে আমরা অবলীলায় বলে উঠি, আল্লাহ তোমার অন্তর ভেঙে দিক! কথাটি যদি দুআ কবুলের

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৫৫০; সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪৩৬

[২] ইবনু হাজার আসকালানি, আল-ইসাবাহ, ৬/২৪৬

সময় বলা হয় তাহলে কী অবস্থাটা হবে! সামান্য এক পাত্র কি একটি অন্তরের সমান হতে পারে? এমন বদদুআ না করে আমরা কি এ কথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তোমাকে সংশোধন করে দিন?

ভাইবোন পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে কোনো কোনো মা রাগান্বিত হয়ে বলে ফেলেন—আল্লাহ তোমাদের থেকে যেন এসবের প্রতিশোধ নেন! কথাটি যদি দুআ কবুলের সময় বলা হয়ে থাকে, তাহলে কেমন হবে? আমাদের সন্তানরা কি আল্লাহ তাআলার প্রতিশোধ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে? আমরা যদি বলতাম—আল্লাহ তোমাদের উভয়কে সংশোধন করে দিন, তাহলে কী এমন সমস্যা হতো!

চলুন, 'আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করে দিন' এ কথা না বলে বলি—'আল্লাহ তোমার হৃদয়কে প্রশস্ত করে দিন।'

'আল্লাহ তোমার ওপর রাগান্বিত হোন' এ কথা না বলে বলি—'আল্লাহ তোমাকে সঠিক বুঝ দান করুন।' চলুন, সন্তানদের ধ্বংস করার পূর্বে প্রথমে নিজের মুখখানি একটু সংশোধন করে নিই।

দ্বিতীয় পাঠ

সাধারণভাবে একজন মানুষ চায়, অন্যরাও তার মতো হয়ে যাক। ব্যভিচারী লোকের আকাঙ্ক্ষা থাকে—সকল মানুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হতো! পুরুষালি স্বভাবের নারীদের আকাঙ্ক্ষা থাকে—যদি সকল নারীই তাদের মতো পুরুষের ভঙ্গিমা গ্রহণ করত! চোরদের আকাঙ্ক্ষা থাকে—সকল মানুষ যদি চুরি করত!

এ কারণেই হকপন্থীদের সদাচারে বাতিলপন্থীরা সবসময় ব্যাপক অস্বস্তি বোধ করে। একজন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করা মানেই চোরদের চেহারায় চপেটাঘাত করা। একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তির আবির্ভাব ব্যভিচারীদের মধ্যে পিঠের চামড়া তুলে ফেলার মতো আঘাত তৈরি করে। একজন ভদ্র কর্মচারীর ব্যক্তিত্ব ঘুষখোর কর্মচারীদের মনে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে। আর হকপন্থীরা সবসময় বাতিলপন্থীদের ভুলত্রুটির সমালোচনা করে থাকে। এ কারণেই বাতিলপন্থীরা চায়, হকপন্থীরা সবাই যেন তাদের মতো হয়ে যায়।

ইবাদতপ্রাণ জুরাইজ রহমতুল্লাহি আলায়হি'র ইবাদত বনি ইসরাইলের পাপিষ্ঠ লোকজনকে একধরনের অস্থিরতার ভেতর ঠেলে দিয়েছিল। তাই জুরাইজকে

তারা তাদের মতো বানানোর জন্য তার কাছে ব্যভিচারিণী পাঠিয়ে দেয়।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর তাওহিদি ইয়াকিন তথা একত্ববাদের ঘোষণা তৎকালীন পৌত্তলিকদের তটস্থ করে রেখেছিল। তিনি তাদের মতো হতে অস্বীকৃতি জানানোয় তারা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল।

লুত আলাইহিস সালাম-এর সঠিক পন্থা তার সম্প্রদায়ের সমকামী লোকদেরকে ভীত করে তুলেছিল।

ফলে তারা বলেছিল—

اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ

> *'লুত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পুতঃপবিত্র সাজতে চায়।'*[১]

তৃতীয় পাঠ

মুমিন ব্যক্তি কোনো বিপদের গন্ধ পেলে সঙ্গে সঙ্গেই নামাজের দিকে ধাবিত হয়। কেননা সে জানে, পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান আকাশে (আল্লাহ তাআলার কাছে)। জুরাইজ এর ওপর একসঙ্গে কতগুলো বিপদ আপতিত হয়েছে! ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়েছে, লোকজন অন্যের সন্তানকে অবৈধভাবে তার সন্তান বলে দাবি করেছে। কিন্তু জবাবে তিনি বলেছেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি নামাজ পড়ে নিই। মাত্র দুরাকাত নামাজের মাধ্যমে আসমান-জমিনের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন। দুধের শিশু তার তাকওয়া, নিষ্কলুষতা ও নির্দোষ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে!খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু। কুরাইশরা তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি বলেন, আমাকে একটু নামাজ আদায় করার সুযোগ দাও।[২]

তিনি জানতেন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সবচেয়ে উত্তম জিনিস হলো নামাজ।

গোটা মানবজাতির সরদার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাই ধরুন না! নামাজের সময় হলে তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতেন,

---

[১] সুরা নামল, আয়াত-ক্রম : ৫৬

[২] ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতিআব, ২/৪৪০

'বিলাল, আমাদেরকে একটু প্রশান্তি দাও।'[১]

একদল বলে নামাজের মাধ্যমে আমাদেরকে একটু প্রশান্তি এনে দাও। আরেকদল বলে নামাজের আহ্বান থেকে আমাদেরকে একটু প্রশান্তি দাও। অর্থাৎ নামাজের জন্য ডেকো না। দুই দলের মধ্যে কত ব্যবধান!

চতুর্থ পাঠ

যথাযথ তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগকে শুরুতেই সত্য মনে করবেন না। অন্যের ওপর অপবাদ আরোপ করা মানুষের চিরাচরিত স্বভাব। তাই সরাসরি প্রত্যক্ষ না করে কারও প্রতি অবিচার করবেন না। অমুক-তমুকের কথায় কান দিয়ে কোনো নারীর ইজ্জত-আব্রু নিয়ে আলোচনা করবেন না। মনে রাখবেন, হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

> *'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোনো কথা শোনামাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।'*[২]

মানুষ মানেই যশ-খ্যাতি। তাই কারও যশ-খ্যাতি হরণ করাটা তার রক্ত ঝরানোর সমতুল্য। যদি আপনি সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে কোনো অপরাধের কথা জানতে পারেন তাহলে হাদিসের এই বাণী স্মরণ করুন—'আল্লাহ তাআলা দোষ গোপনকারী। দোষ গোপন করাকে তিনি বিশেষ পছন্দ করেন।'[৩]

বিশেষ প্রয়োজন না হলে কারও দোষ প্রকাশ করবেন না। পক্ষান্তরে যদি আপনার কাছে উপদেশ চাওয়া হয় তাহলে জানা সত্ত্বেও উপদেশ না দেওয়াটা হবে প্রতারণা। মনে রাখবেন, দোষ-ত্রুটি গোপন করা এক বিষয় আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তির কারণে সতী-সাধ্বী নারীকে বিপদে ফেলা বা পাপাচারিণী নারীর কারণে কোনো নেককার পুরুষকে বিপদে ফেলা ভিন্ন বিষয়।

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, ২৩০৮৮। সনদ সহিহ।
[২] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৪৯৯২। সনদ সহিহ।
[৩] বায়হাকি, সুনানুল কুবরা, ৭/১৫৭ [১৩৫৫৯]। সহিহ লিগাইরিহি।

পঞ্চম পাঠ

আপনি আল্লাহর সঙ্গে থাকুন, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে থাকবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে রাতের আঁধারে চুপিসারে বেরিয়েছিলেন। পরে যখন ফিরে এসেছেন তখন দিনের উজ্জ্বল আলোয় বিশাল বাহিনী সমেত সদর্পে প্রবেশ করেছেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম মাজুলম হয়ে কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন, আর বের হয়েছেন মিশরের শাসক হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে। এবং শাসক হয়েছেনও।

আসহাবে কাহফের যুবকদল দ্বীন রক্ষার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দেশ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় আল্লাহ্ তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গোটা দেশকে তারা নিজেদের অনুসারী হিসেবে পেয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা না চাইলে মানুষের পক্ষে কারও ক্ষতি করা অসম্ভব। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা না হলে কেউ কারও উপকারও করতে পারে না।

যে নিজের রুটি-রুজির ব্যবস্থাই নিজে করতে পারে না তার পক্ষে অন্যের রিজিকের ব্যবস্থা করা কখনোই সম্ভব নয়। এমনি যার নিজের মৃত্যুর ওপর নিজেরই কোনোরকম দখল নেই তার কাছে জীবনের মিনতি করা বড় ধরনের বোকামি। তাই আপনি বরং আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

আসিয়া বিনতে মুযাহিম

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ فِرْعَوْنَ أَوْتَدَ لِامْرَأَتِهِ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، فَكَانَ إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا ظَلَّلَتْهَا الْمَلَائِكَةُ، فَقَالَتْ: { رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } [التحريم: ١١]، فَكَشَفَ لَهَا عَنْ بَيْتِهَا فِي الْجَنَّةِ

> *'ফিরআউন তার স্ত্রীর হাতপায়ে চারটি পেরেক মেরেছিল। ফিরআউনের লোকেরা চলে গেলে ফেরেশতারা এসে তার উপর ছায়া মেলে দিলেন।*

তখন তিনি বললেন—

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

> *হে আমার রব! জান্নাতে আপনার কাছাকাছি একটি ঘর আমার জন্য নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।* [১]

তখন তাকে জান্নাতে নির্মিত তার বাড়িটি দেখানো হয়।[২]

---

[১] সুরা তাহরিম, আয়াত-ক্রম : ১১

[২] মুসনাদু আবি ইয়া'লা, ১১/৩১৬ [৬৪৩১]; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/২২১। সনদ সহিহ।

প্রথম পাঠ

শত্রুর ঘর থেকেই আল্লাহ তাআলা শত্রুর বিরুদ্ধে যোদ্ধা তৈরি করেন।

যে বলেছিল , 'أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى'—'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু'[১], তার প্রাসাদ থেকেই নবী (মুসা আলাইহিস সালাম) বের হয়েছেন।

তার শয়ন-কক্ষ থেকেই উঠে এসেছেন ইতিহাসের এক মহীয়সী নারী।

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন—প্রকৃতপক্ষে সে কত দুর্বল। একজন মুসার খুঁজে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করেছে, তবুও তাকে পায়নি। অথচ তার চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই মুসা আলাইহিস সালাম তারই প্রাসাদে লালিত-পালিত হয়েছেন।

হাজার হাজার নারী যে ফিরআউনকে সিজদা করত বাধ্য হয়ে সে নিজের স্ত্রীর কাছেই অক্ষম ও অধম বলে প্রমাণিত হলো। কারণ, অন্তরের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তাআলার হাতে। মানুষ তো কেবল রক্ত-মাংসের দেহের ওপর ক্ষমতা রাখে।

দ্বিতীয় পাঠ

চিন্তা-চেতনা ও সত্য-অনুধাবনে রিক্তহস্ত এই জ্ঞানপাপীরা মনে করে—ধর্ম হলো আফিম। এটি এক নেশা। কপর্দকহীন-নিঃস্ব লোকজন একে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটিয়ে দেয়। একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন নিরাশায় আলোর ঝলক ভেবে মরুভূমিতে মরীচিকার পেছনে দৌড়ে যায় তেমনিভাবে এরা জান্নাতের আশায় বেঁচে থাকে।

অথচ আসিয়া বিনতে মুযাহিম ছিলেন মিশরের রানি। মিশর-সম্রাটের স্ত্রী। প্রবল প্রতাপ দেখে পথভ্রষ্ট লোকজন আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা করত, তিনি তার স্ত্রী।

তিনি (আসিয়া) আদেশ করা মাত্রই তা বাস্তবায়ন করা হতো। কাউকে ডাকলে তৎক্ষণাত ছুটে আসত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জান্নাতের নহর পাবার আশায় তিনি ঈমান গ্রহণ করেননি। ক্ষুধা মেটানোর জন্য জান্নাতের ফলফলাদি লাভের আশায় তিনি ঈমান গ্রহণ করেননি। দুনিয়ার বাড়িঘর সংকীর্ণ বলে জান্নাতের

[১] সুরা নাযিয়াত, আয়াত-ক্রম : ২৪

বালাখানার প্রত্যাশা করেননি। তিনি তো বিশাল প্রাসাদের, ঐতিহাসিক শহরের আর দেশের সকল মানুষের রানি ছিলেন। তিনি জানতেন আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা উত্তম এবং চিরস্থায়ী। অন্তরের প্রাচুর্যই আসল ঐশ্বর্য। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভই প্রকৃত সম্পদ। জান্নাতের তুলনায় দুনিয়ার সকল ঘরই অতি সংকীর্ণ। সব জেনেবুঝে স্বামী ফিরআউনকে যেন তিনি এ কথাই বলেছিলেন যে, তোমার মালিকানাধীন সবকিছু তুমি নিয়ে যাও আর আমাকে আমার রবের জন্য ছেড়ে দাও।

তৃতীয় পাঠ

ঈমান এক আশ্চর্য শক্তি।

বিশ্বজুড়ে ইসলামের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ার পর একবার বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, উমাইয়া ইবনে খলাফের শাস্তির মুখে আপনি কীভাবে ধৈর্যধারণ করতেন? তিনি বলেন, নির্মম শাস্তির মুখে আমি ঈমানের স্বাদ অনুভব করে ধৈর্যধারণ করতাম। ঈমান এক আশ্চর্য শক্তি। কারও অন্তরে তা স্থান গেড়ে নিলে এটা তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

তর্কের খাতিরে বলা যায় যে, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষে এভাবে ধৈর্য ধারণ খুব বেশি আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ, বিলাল তো একজন পুরুষ। আর দৈহিকভাবে নারীর তুলনায় পুরুষ অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। তাছাড়া তিনি তো ইতিপূর্বে একজন দাস ছিলেন। কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ করার অভ্যাস তার আগে থেকেই ছিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো একজন নারী, যিনি মান-সম্মান ও নেয়ামতের রাজ্যে বেড়ে উঠেছেন, তিনি এমন শাস্তির মুখে কীভাবে ধৈর্যধারণ করলেন!একটি কাষ্ঠ-খণ্ডে রেখে ফিরআউন তার হাত-পায়ে পেরেক মেরেছিল। সেসময় তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অবিচল; কুঠার দ্বারা যে পাহাড়ের পাথর কেটে নেওয়া হলেও সে ক্রন্দন করে না। তিনি যেন তখন এক বিশালকায় বৃক্ষ; করাতের ধারালো দাঁত দ্বারা যাকে কাটা হলেও আর্তনাদ করে না।

পৃথিবীতে তার কোমল দেহকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। আর তার ঈমানে-অবিচল অন্তর ঊর্ধ্বাকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল, ঠোঁটের কোণে তার মুচকি হাসি লেগে ছিল। যেমনটা ইবনে কাসিরে বলা হয়েছে। ফিরআউন এতে পাগল হয়ে যায়। সে বলতে থাকে—এ দেখি শাস্তির খড়গে পড়েও হাসছে! সে তো আর জানত না—তিনি জান্নাতের যে বাড়ির আবেদন করেছেন আল্লাহ তাকে সে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ পাঠ

আল্লাহ তাআলা তাকে ফিরআউনের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন। যিনি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ফেরেশতা পাঠিয়েছেন তিনি চাইলে তাকে মুক্তির জন্যও ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে পরীক্ষার জায়গা বানিয়েছেন। ঈমান ও আমলের প্রকৃত ভোগের জায়গা বানাননি। আসিয়া পরকালের ফসলের আশায় দুনিয়াতে (ঈমান ও আমলের) বীজ বপন করে গিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলাও তার ফল ও ফসলকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন।

তাই মুমিনদের ওপর কোনো শাস্তি নেমে এলে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কোনোরকম মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকুন। যেমনটা বোকার দল বলে থাকে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে বাতিলপন্থীকে জয়ী হতে দেখলে বলে—আল্লাহ কোথায় গেলেন!

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে অন্যদের ওপর ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। এটি তার কোনো অক্ষমতা নয়; বরং জালেমদেরকে তিনি সামান্য সুযোগ দিয়ে রেখেছেন মাত্র। আর এই সুযোগ প্রদানের অর্থ এই না যে, আল্লাহ তাআলার বাহিনী ক্ষুদ্র। বা তাতে সৈন্য-স্বল্পতা রয়েছে। বরং মূল বিষয় হলো, তিনি দুনিয়ার জীবনকে পরীক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন।

এখানে জালেমের যদি জুলুম করার স্বাধীনতা না থাকে তাহলে সে পরীক্ষায় ফেল করবেই-বা কীভাবে? আবার ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির যদি ইনসাফের স্বাধীনতা না থাকে তাহলে সে কীভাবে সফল হবে? স্বাধীনতা না থাকলে আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে জান্নাতেই-বা যাবে কীভাবে? অর্থাৎ স্বাধীনতা পেয়েও যারা আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে বিলিন করে দেবে, প্রথম সুযোগে জান্নাত তো তাদের জন্যই।

এই পথে নুহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর কষ্ট করেছেন। ইয়াহইয়া

আলাইহিস সালাম-কে করাত দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর ইসমাইল আলাইহিস সালাম-কে জবাই করার জন্য ধারালো ছুরির নিচে শোয়ানো হয়েছে। নিশ্চয়ই জান্নাত অত্যন্ত মূল্যবান।

পঞ্চম পাঠ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে সে মানুষের সঙ্গে ওয়াদা রক্ষা করবে, কস্মিনকালেও এমনটা ভাবতে যাবেন না।

ফিরআউন আসিয়া বিনতে মুযাহিমের সঙ্গে ঘর-সংসার না করে, তার স্বভাব চরিত্র না জেনেই তাকে শূলীতে চড়িয়েছিল এমনটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই। তার প্রতি তার স্ত্রীর যথাযথ ভালোবাসা, অনুরাগ ও যত্ন-আত্তি থাকা স্বত্ত্বেও সে তাকে শূলীতে চড়িয়েছিল। কারণ, সে তো আল্লাহ-প্রদত্ত ইহসানের প্রতিই লক্ষ রাখেনি। মানুষের ভালোবাসা ও ইহসানের বদলা সে কীভাবে দেবে?

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েক বছর উমাইয়া ইবনে খলফের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কিন্তু কঠোর শাস্তি দেওয়ার সময়ও সে তার প্রতি লক্ষ রাখেনি। কারণ গোলামের ওপর জুলুম করার পূর্বে সে আল্লাহর (বিধানের) সঙ্গে জুলুম করেছে।

জনৈক মনীষী চমৎকার কথা বলেছেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে না তুমি তাকে ভয় করো!'

যে আল্লাহর শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ রাখে না, তার কাছে তুমি শিষ্টাচার আশা কোরো না।

যে আল্লাহর হকই আদায় করে না সে মানুষের হক কীভাবে আদায় করতে পারে!

এ কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ

> 'যখন তোমাদের কাছে এমন কোনো পাত্র মিলে যায় যার দ্বীন, ধর্ম ও

আলাইহিস সালাম-কে করাত দ্বারা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর ইসমাইল আলাইহিস সালাম-কে জবাই করার জন্য ধারালো ছুরির নিচে শোয়ানো হয়েছে। নিশ্চয়ই জান্নাত অত্যন্ত মূল্যবান।

পঞ্চম পাঠ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে সে মানুষের সঙ্গে ওয়াদা রক্ষা করবে, কস্মিনকালেও এমনটা ভাবতে যাবেন না।

ফিরআউন আসিয়া বিনতে মুযাহিমের সঙ্গে ঘর-সংসার না করে, তার স্বভাব চরিত্র না জেনেই তাকে শূলীতে চড়িয়েছিল এমনটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই। তার প্রতি তার স্ত্রীর যথাযথ ভালোবাসা, অনুরাগ ও যত্ন-আত্তি থাকা স্বত্ত্বেও সে তাকে শূলীতে চড়িয়েছিল। কারণ, সে তো আল্লাহ-প্রদত্ত ইহসানের প্রতিই লক্ষ রাখেনি। মানুষের ভালোবাসা ও ইহসানের বদলা সে কীভাবে দেবে?

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েক বছর উমাইয়া ইবনে খলফের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কিন্তু কঠোর শাস্তি দেওয়ার সময়ও সে তার প্রতি লক্ষ রাখেনি। কারণ গোলামের ওপর জুলুম করার পূর্বে সে আল্লাহর (বিধানের) সঙ্গে জুলুম করেছে।

জনৈক মনীষী চমৎকার কথা বলেছেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে না তুমি তাকে ভয় করো!'

যে আল্লাহর শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ রাখে না, তার কাছে তুমি শিষ্টাচার আশা কোরো না।

যে আল্লাহর হকই আদায় করে না সে মানুষের হক কীভাবে আদায় করতে পারে!

এ কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ

> *'যখন তোমাদের কাছে এমন কোনো পাত্র মিলে যায় যার দ্বীন, ধর্ম ও*

> *আচার-আচরণ তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। তা না করলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে।'*[১]

কারণ, যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা, সে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকেও (বৈধভাবে) সন্তুষ্ট রাখবে।

তাই মুত্তাকি ও পরহেজগার পাত্র ছাড়া অন্যত্র মেয়ে বিয়ে দেবেন না। সে যদি তাকে ভালোবাসে তাহলে অবশ্যই তার সম্মান করবে আর যদি তাকে নাও ভালোবাসে তাহলে তাকে অন্তত অপমান করবে না।

[১] সুনানু তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ১০৮৫। সনদ হাসান।

দ্বীন এবং সঠিক পন্থা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاً، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا

'বনি ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তি স্বগোত্রীয় আরেক ব্যক্তির কাছে একহাজার দিনার ঋণ চাইল। সে ঋণদাতা বলল, "কয়েকজন সাক্ষী আনো, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব।" ঋণগ্রহীতা বলল, "সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" ঋণদাতা বলল, "তা হলে একজন জামিনদার উপস্থিত করো।" ঋণগ্রহীতা বলল, "জামিনদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" ঋণদাতা বলল, "তুমি সত্যই বলেছ।" এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দিনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণগ্রহীতা নৌপথে সফর করে নিজ প্রয়োজন সমাধা করল। অতঃপর যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোনো যানবাহন সে পেল না। উপায়ান্তর না দেখে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র লিখল। অতঃপর চিঠিসহ এক হাজার দিনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র-তীরে এসে বলল, "হে আল্লাহ! তুমি তো জানো আমি অমুকের কাছে এক হাজার দিনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে জামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম জামিন হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। এতে সে রাজি হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, তাতে সে রাজি হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার কাছে সোপর্দ করলাম।" এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দিল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গেল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্র-তীরে গেল যে, হয়তো-বা ঋণগ্রহীতা কোনো নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার ভেতরে মাল ছিল। সে কাষ্ঠখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ি নিয়ে গেল। যখন সে তা ছিঁড়ল, তখন মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দিনার নিয়ে এসে হাজির হলো এবং বলল, "আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশে সবসময় যানবাহনের খুঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে

এখন আসলাম, তার আগে আর কোনো নৌযান পাইনি।" ঋণদাতা বলল, "তুমি কি আমার কাছে কিছু পাঠিয়েছিলে?" ঋণগ্রহীতা বলল, "আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোনো নৌযান আমি পাইনি।" সে বলল, "তুমি কাঠের টুকরোর ভেতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন।" ঋণগ্রহীতা তখন আনন্দচিত্তে এক হাজার দিনার নিয়ে ফিরে গেল।'[১]

প্রথম পাঠ

মানুষ মানুষের জন্য।

বর্ণিত আছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে দুআ করতে শুনলেন, সে বলছে, 'হে আল্লাহ, আপনি কোনো সৃষ্টির কাছে আমার কোনো প্রয়োজন রাখবেন না।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'আমি তো দেখছি তুমি মৃত্যু কামনা করে দুআ করছ!'

বাহ্যিকভাবে মানুষ একে অন্যের কাছে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। যে আপনার কাছে কিছু চায় সে তো আপনার মধ্যে কল্যাণ আছে বলেই চায়। অন্যের প্রতি সুধারণ পোষণ করা আভিজাত্যেরই পরিচায়ক। মানুষের ধন-সম্পদই একমাত্র দানযোগ্য বস্তু নয়। হ্যাঁ, অধিকাংশ সময় ধন-সম্পদই বেশি প্রয়োজন হয়ে থাকে। শুধু ধন-সম্পদই নয়, বরং প্রতিটি বস্তু ও বিষয়েরই জাকাত রয়েছে। প্রাচুর্যের জাকাত হলো—দরিদ্রদের উপর দয়া করা। ইলমের জাকাত হলো—কেউ তা তলব করুক বা না-করুক কারও কাছেই তা গোপন না করা। বুদ্ধি-বিবেচনার জাকাত হলো—কারও প্রয়োজন হলে তাকে সদুপদেশ দেওয়া। শরীরের জাকাত হলো—কোনো খোঁড়া ব্যক্তিকে আগলে নিয়ে যাওয়া কিংবা কোনো অন্ধকে পথ পার করে দেওয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাঠ

যে সৎ উদ্দেশ্য অন্যের মাল গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলা তাকে তা পরিশোধ করার সুযোগ দান করেন।

আর যে আত্মসাৎ করার জন্য অন্যের মাল নিয়ে নেয় আল্লাহ তাআলা তাকে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২২৯১

ধ্বংস করে দেন। সৎকর্ম ছেড়ে ভিন্ন পথে চলার থেকে নির্বুদ্ধিতা আর হতে পারে না। আবার মন্দের বিনিময়ে ভালো আচরণও কখনো কখনো চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে।

তবে এটাও লক্ষ রাখতে হবে যে আপনার মাধ্যমে যেন ভালো কাজগুলো মিটতে না থাকে। অনেকেই এখন আর অভাবী লোকজনকে ঋণ দেয় না। কারণ, ইতিমধ্যে বহু মানুষ তার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চম্পট দিয়েছে। অনেকেই অত্যধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ ছাড়া মেয়ে বিয়ে দেন না। কারণ, তারা মনে করেন যে, অল্প মোহরানায় মেয়ে বিয়ে দিলে মেয়েটিকে সস্তা মনে হয়। বহু মানুষ রয়েছে, যারা পঙ্গু-ভিক্ষুকদের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা এইসব পঙ্গু-ভিক্ষুক অনেক সময় ধোঁকাবাজ হয়ে থাকে।

আমাদের বাপ-দাদারা চমৎকার একটি কথা বলতেন, 'তুমি ধোঁকাবাজ হলেও তোমাকে যে বিশ্বাস করে তাকে অন্তত ধোঁকা দিয়ো না।'

তৃতীয় পাঠ

এই ঘটনায় কাকে দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন—তা নির্ণয় করা মুশকিল; যে ব্যক্তি এটা মেনে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই তার ঋণপ্রদানের সাক্ষী এবং জামিন সেই ব্যক্তি, নাকি ঐ ব্যক্তি যে ওয়াদা ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে হাজার দিনারকে সমুদ্রে ভাসিয়ে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে? একেই বলে সত্যিকারের আভিজাত্য। একজন অভিজাত ব্যক্তি কোনো সাক্ষী এবং জামিন ছাড়াই ঋণ দিয়ে দিচ্ছে। আরেকজন অভিজাত ব্যক্তি এক টুকরো কাঠে ভরে ঋণ পরিশোধ করার শেষ চেষ্টা করছে।

চতুর্থ পাঠ

ভালো কাজের নিয়ত করুন, আল্লাহ তাআলাই পথ খুলে দেবেন। ঋণগ্রহীতা যখন ঋণদাতার মাল ফেরত দেওয়ার নিয়ত করেছে কাঠের টুকরোটি তখন চিঠিতে পরিণত হয়ে গেছে। আর সমুদ্র পিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আপনি ভালো স্বামী হওয়ার নিয়ত করুন ভালো স্ত্রী পাবেন। শেখার নিয়ত করুন উত্তম শিক্ষক পেয়ে যাবেন। বিশ্বস্ত হওয়ার নিয়ত করুন, এমন ব্যক্তি পাবেন যে

আপনাকে বিশ্বস্ত মনে করবে। আল্লাহ তাআলা যার অন্তরে কল্যাণ দেখতে পান তার জন্য তিনি কল্যাণের দ্বার প্রশস্ত করে দেন।

পঞ্চম পাঠ

যদি কেউ আল্লাহর নামে আপনার কাছে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দান করুন।

কেউ আল্লাহর নামে কিছু চাইলে তাকে সেটা প্রদান করুন। মানুষ সাধারণত অভিজাত লোকের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে না। যে আল্লাহ তাআলাকে মাধ্যম বানাচ্ছে তার অবস্থা কী হতে পারে! সাক্ষী তলব করা, চুক্তিনামায় লিখে রাখা—এগুলো নিষিদ্ধ কিছু নয় (বরং সুন্নাত)। বাস্তবতা হলো দুনিয়ার জীবনে জীবন-মৃত্যু, প্রতারণা ও ধোঁকা সবকিছুই রয়েছে। তাই নিজের লেনদেন সম্পর্কে লিখে রাখতে কোনোরূপ কার্পণ্য করা যাবে না। এমনিভাবে কেউ আপনার কাছে পাওনা থাকলে তার প্রাপ্য হক লিখে রাখতে চাইলে বিরক্ত হবেন না।

কুরআনুল কারিমের সবচেয়ে দীর্ঘতর আয়াতটি ঋণ সংক্রান্ত।

আল্লাহ তাআলা এতে ঋণ সংক্রান্ত বিষয় লিখে রাখতে এবং তার ওপর স্বাক্ষী রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটাও বলেছেন—

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

> *'যদি একজন অপরজনকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা।'*[১]

[১] . সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৮৩

মেঘখণ্ড

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ ء لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ ء فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ

> *'একদিন এক লোক কোনো এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ মেঘের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেঘখণ্ডটি একদিকে সরে যেতে লাগল। এরপর এক প্রস্তরময় ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সে লোক পানির অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। চলার পথে এক লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন, যিনি কোদাল দিয়ে বাগানের সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এ দেখে তিনি তাকে বললেন, "হে আল্লাহর বান্দা, আপনার নাম কী?" তিনি বললেন, "আমার নাম অমুক" (আগন্তুক এই নামটিই মেঘখণ্ডের মধ্যে শুনতে পেয়েছিলেন)। বাগানের মালিক এবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর বান্দা! আপনি আমার নাম*

জানতে চাইলেন কেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "এ পানি যে মেঘের, এর মধ্যে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, আপনার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও।" এরপর তিনি বললেন, "আপনি এ বাগানের ব্যাপারে কী করেন?" মালিক বললেন, "যেহেতু আপনি জিজ্ঞেস করছেন, তাই বলছি, প্রথমে আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফসলের হিসাব করি। অতঃপর এর এক তৃতীয়াংশ সাদাকাহ করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার-পরিজনের জন্য রাখি এবং এক তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে খরচ করি।"'[১]

প্রথম পাঠ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন করে আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি লক্ষ রাখেন। যে ব্যক্তি তার হাতে থাকা উপায়-উপকরণকে আল্লাহর কাজে লাগায় আল্লাহ তাআলাও নিজের মালিকানাধীন জিনিসকে তার কাজে লাগিয়ে দেন। বিশ্বজগতের সবকিছুই আল্লাহ তাআলার হাতে। তাই তিনি যেমন চান আপনি তেমন হয়ে যান। তাহলে আপনি যেমন চান আল্লাহ আপনার জন্য তেমন হয়ে যাবেন।

সবসময় বিশ্বাস রাখুন যে, দুনিয়ার নিয়ম-কানুনগুলো মানুষের ওপর চলে, আল্লাহর ওপর নয়। তিনি একজন নেককার বান্দার সুবিধার্থে গোটা বিশ্বজগত পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালায় ব্যতিক্রম করেছেন। নবুওয়াতের কারণে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে যা দিয়ে থাকেন কখনো কখনো সততার কারণে নেককার বান্দাদেরকেও তা দিয়ে থাকেন।

আপনার কি জানা নেই যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর জন্য জ্বলন্ত আগুন ঠান্ডা ও নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল। ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর জন্য হিংস্র মাছ আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর গলায় ধারালো ছুরি অকেজো হয়ে গিয়েছিল। একজন মাত্র ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা এই মেঘখণ্ড পাঠিয়েছিলেন। সেদিন মানুষের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করার ইচ্ছা আল্লাহ তাআলার ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, তার এক নেককার বান্দা রয়েছে।

[১] . সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৯৮৪

যে অন্যদের কারণে বঞ্চিত হতে পারে না। তাই তার জন্য বিশ্বজগতের রীতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

মেঘ তো সকলকে বৃষ্টি বর্ষণ করে কিন্তু এই মেঘখণ্ডটি কেবল একজন ব্যক্তির জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেছিল। সে তার দ্বীনকে বিশুদ্ধ করেছে তাই আল্লাহ তার দুনিয়াকে ঠিক করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ

পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করা প্রকৃত প্রসিদ্ধি নয়, বরং আসমানে (আল্লাহ তাআলার দরবারে) পরিচিতি লাভ করাটাই প্রকৃত প্রসিদ্ধি লাভ।

এই লোক তো সামান্য একজন কৃষক, দুনিয়ার মানুষ যাকে চেনে না, কিন্তু তিনি নেতৃস্থানীয় ফেরেশতাদের কাছে পরিচিত ছিলেন; যে কারণে এক ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করো।

কোনো তারকা-শিল্পী আমাদের নাম ধরে ডাকলে আমরা আনন্দে যেন উড়তে থাকি। কোনো মন্ত্রী আমার নাম ধরে ডাকলে আমার পা যেন আর মাটিতেই পড়তে চায় না। রাষ্ট্রপতি আমাদের নাম ধরে ডাকলে সেদিন খুশির আতিশয্যে আমরা চোখে কাউকে দেখতে পাই না। ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসি। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ডাকছে, তাতেই এই অবস্থা! তাহলে সকল রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলা যখন নির্দেশ পাঠান যে, আমার অমুক বান্দার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করো, তখন সে ব্যক্তির অবস্থা কেমন হতে পারে!

তৃতীয় পাঠ

মানুষ বলে থাকে কাজকর্মও ইবাদত। হ্যাঁ, এটা সঠিক কথা। কিন্তু যে কাজকর্মের কারণে আল্লাহর হক ছুটে যায় তা শয়তানের ইবাদত। কিছু মানুষ ফজর-নামাজের জন্য অ্যালার্ম দিয়ে রাখে আবার কিছু মানুষ অফিস-টাইমের জন্য অ্যালার্ম দিয়ে রাখে।

দুই ব্যক্তির মধ্যে কত তফাত! একজন মনে করে, তাকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আরেকজন মনে করে, তাকে আয়-উপার্জন ও রুজি-রোজগারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইবাদতের জন্য যেমন সময় রয়েছে তেমনি কাজকর্মের জন্যও সময় রয়েছে।

যে ব্যক্তি কাজকর্মের কারণে ইবাদতকে পিছিয়ে রাখে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিষ্টাচার-বহির্ভূত কাজ করে থাকে। এর মাধ্যমে সে বিশ্বাস করে যে, সে নিজেই নিজের রিজিকের ব্যবস্থা করে। অথচ কর্মের মাধ্যমে আমরা যে রিজিক তালাশ করি সেটা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় কাজ করে তার থেকে কীভাবে আমাদের পছন্দনীয় জিনিস আশা করতে পারি! তিনি বলেন—

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> *'শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।'*[১]

মালিকের কাজ করার পূর্বে যদি আমরা আল্লাহ তাআলার কাজ করি তাহলে আমাদের কাজকর্ম ইবাদত হবে।

তবে ইবাদতের অজুহাতে যে অন্যের উপার্জনের ওপর ভরসা করে বসে থাকে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয় যে কাজকর্মের কারণে নামাজ ছেড়ে দেয়।

আমাদের সাইয়িদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

> *'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।'*[২]

আরেক হাদিসে তিনি বলেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ

[১] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৬৮
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২০৭২

مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

> *'যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারও রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোনো লোকের কাছে এসে চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভালো, চাই সে দিক বা না দিক।'*[১]

যে ব্যক্তি মসজিদে অবস্থান করে আর ভাই তার খরচ চালায় তার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তার ভাই, (যে খরচ চালায়) তার চেয়ে উত্তম।

এই তুলনার মধ্যে জীবন-সফলতার রহস্য নিহিত। বিষয়টি এমন নয় যে আপনি বলবেন, আমি ইবাদত করব নাকি কাজ করব? ঈসা আলাইহিস সালাম মহাসম্মানিত নবী ও রাসুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তালার জমিনে একজন কাঠমিস্ত্রি হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেছেন।

শুআইব আলাইহিস সালাম ছাগল চড়াতেন। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হবার পর তার কন্যাগণ সেগুলো চড়িয়েছেন। মুসা আলাইহিস সালাম তার এক মেয়েকে বিয়ে করার পর ছাগল চরানোই ছিল তার বিয়ের মোহর। এই ছিল নবী ও রাসুলগণের চিত্র। তাহলে তাদের তুলনায় সাধারণ লোকজনের অবস্থা কী হতে পারে!

চতুর্থ পাঠ

মানুষ তার কর্ম-অনুপাতেই প্রতিদান পেয়ে থাকে।

যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জমিতে কাজ করে আল্লাহ তাআলা অন্যদের শাস্তি প্রদানের ফায়সালা করলেও তার জমি রক্ষা করে থাকেন। তাই আপনি নিশ্চিত থাকুন,

আল্লাহর জন্য আপনি যে সম্পদ ব্যয় করছেন আল্লাহ অবশ্যই তা বৃদ্ধি করবেন। সাদাকাহর কারণে মালে কখনো ঘাটতি দেখা দেয় না। রাত্রি-জাগরণের জন্য আপনি যে সময়টুকু ব্যয় করেছেন এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আপনার মধ্যে সেই উদ্দীপনা তৈরি করে দেবেন যা অন্যরা দীর্ঘ ঘুমের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে।

বরকত বলেও যে একটা কিছু আছে আমরা সে দিকে ভ্রুক্ষেপই করি না। পৃথিবীর

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৪৭০

সকল জিনিস একদিনেই হয়ে যায়নি। আমরা দেখি অনেকেই হারাম উপায়ে সম্পদ জমা করে, তারপরও তারা অভাব-অনটনের অভিযোগ করে থাকে।

আবার এমন ব্যক্তি সম্পর্কেও আমরা জানি যে, তারা হালাল উপার্জন করে। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যে, এই সামান্য উপার্জনেও তার দিব্যি কেটে যাচ্ছে! কীভাবে সম্ভব হয়?

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রিজিক চাই না, কেননা তা তো ইতিমধ্যে বণ্টিত হয়ে গেছে; বরং আমি তাতে বরকত চাই।

মুগিস ও বারিরা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

إِنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ، أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَاجَعْتِهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ، قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ

> *‘বারিরার স্বামী ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তাকে ‘মুগিস’ নামে ডাকা হতো। আমি যেন এখনও তাকে দেখছি—তিনি বারিরার পিছে কেঁদে কেঁদে ঘুরছেন, আর তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে) বললেন, “আব্বাস! বারিরার প্রতি মুগিসের ভালোবাসা এবং মুগিসের প্রতি বারিরার অনাসক্তি দেখে আপনি কি আশ্চর্যান্বিত হন না?” এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বারিরাকে) বললেন, “তুমি যদি তার কাছে আবার ফিরে যেতে (তাহলে কতই-না ভালো হত)! তিনি বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাকে হুকুম দিচ্ছেন?” তিনি বললেন, “আমি কেবল সুপারিশ করছি।” বারিরা বললেন, “তাকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।”’* [১]

বারিরা এক আনসারি সাহাবির বাঁদি ছিলেন। তার স্বামীর নাম ছিল মুগিস। বারিরা স্বাধীনতা লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এজন্য তিনি মনিবের সঙ্গে কিতাবাত (টাকার বিনিময়ে স্বাধীনতা) চুক্তি করেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু’র কন্যা আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বাধীনতা লাভের জন্য

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৫২৮৩

তাকে আর্থিক সাহায্যের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বারিরা স্বাধীনতা লাভের পর স্বামীর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেন। কারণ, বাঁদি স্বাধীন হয়ে গেলে আর স্বামী গোলাম রয়ে গেলে শরিয়ত তাকে স্বামীর সঙ্গে থাকা বা না-থাকার ইচ্ছাধিকার প্রদান করে থাকে।

বারিরা তার স্বামী মুগিসকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুগিস বারিরাকে পাওয়ার জন্য কাঁদতে কাঁদতে মদিনার অলিগলিতে তার পিছুপিছু ঘুরতেন। কিন্তু মুগিসের প্রতি তার কোনো সমবেদনা বা দয়া জাগ্রত হতো না। মুগিস এভাবে বারিরাকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ছুটে গেলেন দয়ালু নবীজির কাছে। বারিরার কাছে তার জন্য সুপারিশ করার আবেদন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারিরাকে বলেন, "তুমি যদি তার সঙ্গে ঘর সংসার করতে! সে তো তোমার স্বামী! তোমার সন্তানের পিতা!" বারিরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন?" তিনি বলেন, "আমি কেবল সুপারিশ করছি।" বারিরা বললেন, "তাহলে তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"

প্রথম পাঠ

এক পক্ষ থেকে ভালোবাসা অধিকাংশ সময়ই লাঞ্ছনা বয়ে আনে।

তবে এটাও ঠিক যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে এমন এক অন্তর দিয়েছেন যা কোনো প্রিয় ব্যক্তিকে দেখা মাত্রই তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর বিপরীতে আমরা যেন নিজের সম্মানজনক অবস্থান হারিয়ে না বসি তার জন্য তিনি আমাদেরকে ইচ্ছাশক্তিও প্রদান করেছেন। আপনি যাকে ভালোবাসেন তার কাছে আপনার হৃদয়ের অভিব্যক্তি পেশ করুন, কিন্তু ভালোবাসার জন্য তাকে চাপাচাপি করবেন না। একবার পরীক্ষা করুন, আরেকবার ভালবাসুন। তবে আপনার মধ্যে বিবেচনাশক্তি থাকতে হবে।

আগের যুগের মানুষজন বলতেন, কখনো কখনো দুই-এক পৃষ্ঠা উল্টানো যথেষ্ট হয় না; বরং পুরো কিতাব পরিবর্তন করতে হয়! অর্থাৎ প্রয়োজনে নিজেকে আমূল পালটে ফেলতে হবে। অথবা ভালোবাসার ঠিকানা পালটে নিতে হবে।

দ্বিতীয় পাঠ

নারীরা কোনো বিক্রয়-পণ্য নয় যে, যে ব্যক্তি মোহর প্রদান করবে তার কাছেই তাকে হস্তান্তর করতে হবে।

ন্যায়সঙ্গতভাবে অন্তর কারও প্রতি আকৃষ্ট থাকা সত্ত্বেও মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে বসতে বাধ্য করাটা জুলুম। দেহ-হত্যার চেয়ে অন্তরকে হত্যা করাটা অধিক কষ্টদায়ক এবং পাপের কারণ। আপনি প্রাচীন যুগের আরবদের কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন। তারা মেয়েদেরকে মেয়েদের পছন্দসই পুরুষের কাছে বিয়ে দিত না। তাদের, বরং আরবের সকল সম্প্রদায়ের, বরং গোটা বিশ্বের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম তার অনুসরণ করুন। তিনি বলেছেন—

'পরস্পর ভালোবাসাময় নারী-পুরুষের জন্য বিয়ে ব্যতীত অন্য কোনো পথ নেই।'

তবে এই ভালোবাসা হতে হবে দ্বীনের জন্য। দ্বীনের সীমারেখা মেনে। দুনিয়ার মোহে কিংবা নাজায়েজ পদ্ধতির ভালোবাসায় কোনো প্রকার কল্যাণ নেই। এই মোহ অল্প সময়ে কেটে যায়। জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ নারাজ হন।

তৃতীয় পাঠ

আপনি সত্যিকারের পুরুষ হয়ে উঠুন। সামাজিক রীতিনীতি এবং সংস্কৃতির অনুসরণ করেন বলে আপনি ওই কোমল হৃদয়কে ধোঁকা দেবেন না যে হৃদয় আপনাকে ভালোবাসে। প্রতিটি মানুষেরই হৃদয় রয়েছে। যদি আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমাকে বিয়ে করতে না পারেন, তাহলে অচিরেই আপনি হয়তো অপর কোনো ব্যক্তির প্রিয়তমাকে বিয়ে করবেন। আমাদের অধিকাংশ রীতিনীতি ও সংস্কৃতিগুলো একটি মূর্তি। এগুলোকে ভেঙে ফেলা আবশ্যক। শুধু ইসলামি শরিয়ত মেনে বিয়ে করুন। আপনার জীবন হবে অনাবিল আনন্দে ভরপুর।

চতুর্থ পাঠ

আপনি সুপারিশ করুন।

হাড্ডির চেয়ে অন্তর জোড়ানোর প্রতি অধিক মনোযোগী হোন। কেননা তা ভেঙে যাওয়াটাও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। যদি আপনি দুটি মনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিতে

পারেন তাহলে অমত করবেন না। যদি আপনি পারিবারিক কোনো ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দিতে পারেন তাহলে কালবিলম্ব করবেন না। কারও হাতে কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তা দ্বারা প্রকৃত মর্যাদা নির্ণিত হয় না। বরং সে মানুষের জন্য কতটুকু এগিয়ে এসেছে তা দেখেই আসল মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়।

ডালপালার কারণে বৃক্ষকে মূল্যায়ন করা হয় না, বরং বৃক্ষের ফলের কারণে তাকে মূল্যায়ন করা হয়।

পৃষ্ঠার সংখ্যা আর মান দেখে কিতাবের মূল্যায়ন হয় না বরং তাতে লিখিত বাক্যাবলিতেই তা নির্ধারণ হয়। তেমনিভাবে আমলের মাধ্যমে একদল মানুষ অন্যদলের ওপর মর্যাদা লাভ করে থাকে।

ইতিহাসে যাঁরা স্থান করে নিয়েছেন তাদের প্রতি লক্ষ করুন, তাদের সকলেই পৃথিবীকে বিভিন্ন জিনিস দিয়েছেন। কেউ কোনো ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। কেউ গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ যুদ্ধ বন্ধ করেছেন। কেউ রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছেন। সমস্ত মানুষই তো পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। তারা যে সুন্দর জিনিস রেখে যায় শুধু তাই স্থায়ী হয়। তাই কোনো কৃতিত্ব না রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন না।

পঞ্চম পাঠ

কবুল না হওয়ার অজুহাতে সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।

চেষ্টা করাটাই যথেষ্ট। যা বাস্তবায়ন হবে শুধু তার জন্যই নয়, বরং আমরা যা করব তারও প্রতিদান পাব। এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। হাদিসে এসেছে—কেয়ামতের দিন এমনও নবী আসবেন যাঁদের সঙ্গে কোনো উম্মত থাকবে না।

আপনার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হলে এটাকে অপমান মনে করবেন না। আপনি যতই উচ্চাসনের অধিকারী হন না কেন, কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি লক্ষ করুন, তিনি একজন নারীর কাছে সুপারিশ করছেন! যে কি না বাঁদি ছিল! তবুও সে নবীর সুপারিশ কবুল করেনি! তিনি কি এটাকে অপমান মনে করেছিলেন? সুপারিশ করার পর তা রক্ষা না করায় তিনি কি সেই নারীর প্রতিপক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন?

অহংকার করে সুপারিশের সওয়াব নষ্ট করবেন না।

ষষ্ঠ পাঠ

কল্যাণমূলক কোনো কাজকে হালকা মনে করবেন না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সবচেয়ে ইবাদতপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। বড় বড় দিনে রোজা রাখতেন। অন্ধকার রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন। কিন্তু তবুও তিনি সুপারিশ করা ছেড়ে দেননি।

ব্যস্ততার সময় সংকীর্ণতার অজুহাত পেশ করবেন না। যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। আপনি কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়েও বেশি ব্যস্ত মানুষ? ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উম্মতের নবী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তবুও নগণ্য, সাধারণ মানুষদের জন্য তার কাছে সময় ছিল। স্বামীর জন্য তিনি স্ত্রীর কাছে সুপারিশ করতেন। দাসের জন্য মনিবের কাছে সুপারিশ করতেন। অথচ আমাদের কাছে সাধারণ নগণ্য কেউ এলে আমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই!

স্বর্ণের কলস

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

'এক লোক অপর লোক হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরিদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ-ভর্তি কলস পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, "আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি।" বিক্রেতা বলল, "আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই বেচে দিয়েছি।" অতঃপর তারা উভয়েই অপর এক লোকের কাছে এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, "তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে?" একজন বলল, "আমার একটি ছেলে আছে।" অন্য লোকটি বলল, "আমার একটি মেয়ে আছে।" মীমাংসাকারী বললেন, "তোমার মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিয়েতে ব্যয় কোরো এবং বাকি অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও।"'[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪৭২

প্রথম পাঠ

এ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই মুত্তাকি।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলেছেন, হারামে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় হালালের ১০ ভাগের ৯ ভাগ পরিত্যাগ করা হলো তাকওয়া।

আমি মনে করি এটি অত্যন্ত কঠিন। এতে হয়তো কিছুটা বাড়াবাড়িও রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর উক্তিটি সবচেয়ে সুন্দর। তিনি বলেছেন,

'পরকালে যা উপকার করবে না তা পরিত্যাগ করার নাম হলো যুহদ তথা দুনিয়া-বিমুখতা। আর পরকালে যা ক্ষতি করতে পারে তা পরিত্যাগ করা হলো তাকওয়া।

তাই মুত্তাকি হবার জন্য অধিকাংশ হালাল পরিত্যাগ করা শর্ত নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যা হালাল করেছেন কখনোই তা পরকালের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো বিষয় সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় না বরং ঘোলাটে ও সন্দেহপূর্ণ থেকে যায়, এমনসব ক্ষেত্রে তাকওয়ার বিষয়টি সামনে আসে।

উল্লিখিত ঘটনায় জমিক্রেতা স্বর্ণের কলস নেওয়ার ক্ষেত্রে পরহেজগারি অবলম্বন করেছে। সে মনে করেছে, এটা তার সম্পদ নয়। বিক্রির সময় শুধু মাটি বিক্রি হয়েছে মাটির ভেতরের জিনিস নয়। আর বিক্রেতাও কলসটি গ্রহণের ক্ষেত্রে পরহেজগারির পন্থা অবলম্বন করেছে। কেননা সে মনে করেছে, জমিটি ভেতরের সবকিছুসহ বিক্রি করা হয়েছে।

শুধু কাগুজে চুক্তি নয় বরং তাকওয়ার মাধ্যমে যদি লেনদেন হতো তাহলে কতই-না ভালো হতো! ফাঁকফোকরপুর্ণ নিয়ম-কানুন নয় বরং সবাই যদি সচ্চরিত্রের মাধ্যমে লেনদেন করত তাহলে কতই-না উত্তম হতো! আমাদেরকে বুঝতে হবে, বিচারের মাধ্যমে অন্যের জিনিস পেয়ে গেলেই তা হালাল হয়ে যায় না।

আমাদের সাইয়েদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বলেছেন—

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

> *'আমি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নই। তোমরা আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে আসো। হয়তো তোমাদের কেউ অন্যজনের চেয়ে প্রমাণ পেশের ব্যাপারে অধিক বাকপটু। আর আমি তো যেমন শুনি তার ভিত্তিতেই বিচার করে থাকি। কাজেই আমি যদি কারও জন্য তার অন্য ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দিই, তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, (তার বাকপটুতা ও ধূর্ততার কারণে) আমি তার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করলাম তা তো কেবল এক টুকরা আগুন।'*[১]

দ্বিতীয় পাঠ

এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়—ব্যক্তি-মালিকানা মানব-সভ্যতার অতি পুরনো এক বিষয়।

অথচ কমিউনিস্টরা এখন প্রচার করা শুরু করেছে যে, প্রাচীনকালে নাকি ব্যক্তি-মালিকানা বলে কিছু ছিল না। মানব-সভ্যতায় সর্বপ্রথম নাকি কমিউনিজম চালু ছিল। কেউই কোনো জিনিসের মালিক হতো না! প্রত্যেক জিনিসে সাম্যবাদ কার্যকর ছিল! ভূমি কারও ব্যক্তিমালিকানাধীন ছিল না; বরং সকলের ছিল! নারীরা যে কারও অধিকারভুক্ত ছিল!

এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এক দাবি। এক্ষেত্রে তাদের কাছে ঐতিহাসিক কোনো দলিল-প্রমাণ নেই।

সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলাম তা সম্পূর্ণ বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছে।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ হলেন আদম আলাইহিস সালাম। তার সন্তানেরা সরাসরিভাবে তার ঔরস থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। কে স্ত্রীর অধিক হকদার এটা নিয়ে তার সন্তান— হাবিল ও কাবিল—দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ হয়েছে। এতে কাবিল হাবিলকে হত্যা করে ফেলে।

তাহলে প্রাচীন মানব-সভ্যতায় থাকা কমিউনিস্টদের সাম্যবাদ কোথায় গেল?

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার পূর্বে সেখানে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। কাবিল-হাবিল উভয়ে নিজেদের মালিকানাধীন সম্পদ কুরবানি হিসেবে পেশ করেছিলেন।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭১৬৯

কাবিল ছিলেন কৃষক আর হাবিল মেষ-রাখাল। এক্ষেত্রে কৃষি-সম্পদ উভয়ের মালিকানাধীন ছিল না; বরং এটা কেবল কাবিলের অধিকারভুক্ত ছিল। তেমনিভাবে মেষ উভয়ের অধিকারভুক্ত ছিল না বরং এটা শুধু হাবিলের ছিল।

মানুষ তখনও চাষাবাদ করত। পণ্যের অদল-বদল করত। যা ইদানীংকালের ক্রয়-বিক্রয়ের মতোই ছিল।

ব্যক্তি-মালিকানা তখন মানুষের বিবাদ-বিসংবাদের উপলক্ষ ছিল না। সম্পদের প্রতি মানুষের লোভ ও আকর্ষণ প্রবৃত্তিগত। মালিকানাকে অবণ্টিত রাখা কোনোভাবেই এ সমস্যার সমাধান নয়। বরং এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

তাদের সমাধান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ যেন কেউ এমনটা দাবি করে বসলো, যৌন উত্তেজনার প্রতিষেধক হলো, পৃথিবীর সকল নারীকে প্রত্যেকের বৈধ সম্পদ বানিয়ে ফেলা!

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহ তাআলা ন্যায়ানুগভাবে রিজিক বণ্টন করেছেন, সমান হারে নয়। কেননা সমতার তুলনায় ইনসাফ অধিক মর্যাদাপূর্ণ। কাউকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে তো ধন-সম্পদ দেওয়া হয়নি। যেমন লুকমান আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছিল। কাউকে ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সুস্থতা দেওয়া হয়নি। কাউকে স্ত্রী দেওয়া হয়েছে কিন্তু সন্তান দেওয়া হয়নি। কাউকে স্বামী দেওয়া হয়েছে কিন্তু চরিত্রবান স্বামী দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা খুব কম সংখ্যক মানুষকে দুনিয়ার সকল নেয়ামত দিয়ে থাকেন।

অভাবগ্রস্ত লোকজন ধনীদের কাছে যায়। তেমনিভাবে ঝগড়া-বিবাদের সময় মানুষকে বুদ্ধিমানের কাছে যাওয়া উচিত।

উপরোল্লিখিত ঘটনায় ক্রেতা-বিক্রেতা তাকওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্ণের কলস নিয়ে মধুর এক বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। তাই বিচার নিয়ে তারা এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে গিয়েছে।

তিনি এক চমৎকার সমাধান প্রদান করেন। যার মাধ্যমে তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের তাকওয়ারও কোনো ক্ষতি হয়নি।

তাই প্রথমে বিপদের ধরন-প্রকৃতি বোঝা উচিত। কেউ আছে ছোট বিপদকে বেশ বড় করে দেখে। তাদের উদাহরণ যেন সেই বোকা লোকের মতো, যে সুরমা লাগাতে গিয়ে চোখ অন্ধ করে ফেলেছিল।

চতুর্থ পাঠ

অভিজাত লোকদের বিবাদও কত চমৎকার হয়!

লোভী মানুষেরা যেমন নিজেদের অধিকার চায় তেমনি তারা অন্যদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। কিন্তু অভিজাত লোকদের বিষয়টা ভিন্ন। তাদের বিবাদ-বিসংবাদে কখনো বিচার-আচারের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না।

এক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

বৃদ্ধ হয়ে গেলে তিনি দুঃখবোধ করতে থাকেন। এই বলে তিনি আফসোস করেন যে, এ ঘরটিতে আর আগের মতো বিচার-সালিশ বসবে না।

তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। সে পিতাকে বলল, 'আমি আপনার পক্ষ থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করব।' পিতা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি তোমার কাছে একজন কৃপণ ও অভিজাত লোক বিচার নিয়ে আসে তাহলে তুমি কী করবে?' ছেলে বলল, 'আমি অভিজাত লোক থেকে নিয়ে কৃপণকে দেব।' পিতা জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি দুজন কৃপণ বিবাদ নিয়ে আসে?' ছেলে বলল, 'আমার পক্ষ থেকে অর্থ দিয়ে তাদের মীমাংসা করে দেব।' পিতা জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি দুজন অভিজাত লোক বিবাদ নিয়ে আসে?' ছেলে বলল, 'অভিজাত লোকদের বিচার-আচারের প্রয়োজন হয় না।' ছেলের বুদ্ধিমত্তা দেখে পিতা আনন্দিত হয়ে যান।

ফেরাউন-কন্যার চুল আঁচড়াত যে বাঁদি

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِيَ بِي فِيهَا، أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادِهَا «. قَالَ: « قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: بَيْنَا هِيَ تُمَشِّطُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ سَقَطَتِ الْمِدْرَى مِنْ يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهِ. فَقَالَتْ لَهَا ابْنَةُ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّ أَبِيكِ اللهُ. قَالَتْ: أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْبَرَتْهُ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ، وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلَادُهَا فِيهَا، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتَدْفِنَنَا. قَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ «. قَالَ: « فَأَمَرَ بِأَوْلَادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَاحِدًا وَاحِدًا، إِلَى أَنِ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبِيٍّ لَهَا مُرْضَعٍ، كَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: يَا أُمَّهْ، اقْتَحِمِي، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَاقْتَحَمَتْ

'মেরাজের রাতে একস্থানে এসে আমার নাকে সুঘ্রাণ লাগলে জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করি, "এই সুঘ্রাণ কীসের?" জিবরাইল বললেন, "ফেরাউন-কন্যার চুল আঁচড়াত যে বাঁদি, এই ঘ্রাণ তার ও তার সন্তানদের।" আমি বললাম, "এর কারণ কী?" তিনি বললেন, "বাঁদিটি একবার ফিরআউনের মেয়ের চুল আঁচড়াচ্ছিল, হঠাৎ তার হাত থেকে চিরুনি পড়ে যায়। (চিরুনিটি উঠানোর সময়) সে বলে, বিসমিল্লাহ। ফিরআউনের মেয়ে তাকে বলল, আমার পিতার নামে এটা উঠালে? সে বলল, না বরং আমার এবং তোমার পিতার রব আল্লাহর নামে। সে বলল, আমি কি পিতাকে বিষয়টি জানিয়ে

দেব? সে বলল, হ্যাঁ জানাতে পার। মেয়ে গিয়ে পিতাকে সব জানিয়ে দিল। ফিরআউন তাকে ডেকে বলল, হে অমুক, আমি ছাড়া কি তোমার অন্য কোনো রব আছে? সে বলল, হ্যাঁ আমার এবং তোমার রব আল্লাহ। সে তখন একটি তামার পাতিলে তেল ফুটিয়ে তাতে তাকে এবং তার সন্তানকে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বাঁদি ফিরআউনকে বলল, আপনার কাছে আমার একটি আবদার আছে। ফিরআউন বলল, কী? বাঁদি বলল, আমার এবং আমার সন্তানদের হাড্ডিগুলো একটি কাপড়ে মুড়ে দাফন করবেন। ফিরআউন বলল, ঠিক আছে। এটা আমাদের ওপর তোমার অধিকার। এরপর ফিরআউন তার সামনেই সন্তানদের একজন একজন করে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। একসময় তার দুগ্ধপোষ্য ছেলের পালা আসে। তার জন্য বাঁদিটি যেন আপন সিদ্ধান্তে দোদুল্যমান ছিল। শিশুটি তখন বলে ওঠে, হে আমার মা! আপনি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন! কেননা, পরকালের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি অতি সামান্য। বাঁদিটি তাই করল।"'[১]

প্রথম পাঠ

কোলে থাকা অবস্থায় কতজন শিশু কথা বলেছে, এ ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

সহিহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা হল তিনজন। ঈসা আলাইহিস সালাম, আবেদ জুরাইজের ঘটনায় বিবৃত রাখালের ছেলে, আরেক শিশু, যে তার মায়ের দুয়ার প্রতিবাদ করেছিল। তার ঘটনা সামনে উল্লেখ করা হবে। [২]

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা শিশুটিও এই তালিকায় রয়েছে।

এটি ইসরাইলি বর্ণনা হলেও আমাদের শরিয়ত একে প্রত্যাখ্যান করেনি।

আমাদের সাইয়েদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা বনি ইসরাইলের সূত্রে রেওয়ায়াত করতে পারো এতে কোনো সমস্যা নেই।[৩]

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস-ক্রম : ২৮২১। সনদ হাসান।
[২] 'দুগ্ধপোষ্য সন্তান' নামে এই বইয়েরই ১২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে সেই ঘটনা।
[৩] রাসুল সা. বলেছেন, "আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের

এ ছাড়াও আসহাবুল উখদুদ বা গর্তবাসীদের শিশুও কোলে থাকাবস্থায় কথা বলেছে। সহিহ মুসলিমে তার আলোচনা এসেছে। সব মেলালে এ-জাতীয় শিশুদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়জনে।

দ্বিতীয় পাঠ

মৃত্যুর আশঙ্কা হলে ঈমান গোপন করা সমস্যাকর কিছু নয়।

ফিরআউনের বংশেরই এক মুমিন ঈমান গোপন করেছিলেন। কুরআনে তার প্রশংসা করে বলা হয়েছে—

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

> *‘ফিরআউন-গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এ-জন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ?’*[১]

ওই অবস্থায় তার জন্য ঈমান গোপন করাটা কয়েক দিক থেকে উপকারী ছিল।

প্রথমত: এর মাধ্যমে তিনি নিজের জীবনকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। কেননা ফিরআউন ঈমানের প্রশ্নে নিজের স্ত্রীকেও ছাড় দেয়নি। স্ত্রীকেও সে হত্যা করেছে। মুসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনলে সে কোনো নিকটাত্মীয়ের প্রতিও দয়া করত না।

দ্বিতীয়ত: তিনি ফিরআউনের প্রাসাদের কাছে অবস্থান করতেন। প্রাসাদের সকল অবস্থা এবং চক্রান্ত সম্পর্কে জানতেন। আর এটা তো স্বতঃস্বিদ্ধ বিষয় যে, তরবারির মাধ্যমে শত্রুর মুকাবিলা করার চেয়ে শত্রুর প্রাসাদে গুপ্তচর হয়ে থাকা অনেকগুণে উত্তম।

তৃতীয়ত: ঈমান প্রকাশ করার মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণ ছিল। অন্য কোনো কল্যাণ এতে ছিল না। কেননা তাকে হত্যা করা হলে তিনি আসিয়া এবং চুল

ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল।” সহিহ বুখারি, ৩৪৬১।

[১] সুরা মুমিন, ৪০: ২৮

আঁচড়ানো-বাঁদির মতো শহিদের মর্যাদা পেতেন। আর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সফলতা ও মুক্তির ওপর দাওয়াতের সফলতা প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

তবে আমাদের জন্য এটা বলা সম্ভব নয় যে, আসিয়া এবং চুল আঁচড়ানো-বাঁদি তাদের ঈমান প্রকাশের ক্ষেত্রে ভালোভাবে পরিণামের কথা চিন্তা করেননি।

শহিদকুলের সরদার হলেন হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তেমনিভাবে ঐ ব্যক্তিও এ মর্যাদা লাভ করে যে কোনো জালেম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধের কথা বলে এবং জালেম শাসক তাকে হত্যা করে ফেলে।

চুল আঁচড়ানো-বাঁদি দৃঢ়তা, সাহসিকতা এবং ঈমানি শক্তির সওয়াব পাবে। বর্তমান যুগ অনুযায়ী সে কেবল একজন সেবিকা। আর ফিরআউন মিশরের হিসেবে একজন বাদশাহ, শাসক, নিজ দাবিতে ইলাহ ও মাবুদ। ফিরআউনের মতো ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক এমন বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে একজন সেবিকার এই চ্যালেঞ্জ!

কসম আল্লাহর, এই সাহসিকতার ওপর আর কোনো সাহসিকতা হয় না!

তৃতীয় পাঠ

ঈমান যখন কারও অন্তরের গভীরে স্থান লাভ করে, তখন এটা তাকে রক্তমাংসে গড়া সামান্য একজন মানুষ থেকে এক পাহাড় বানিয়ে দেয়। যা কখনো নড়ে না। কখনো নরম হয় না। যুগে যুগে এটিই ছিল মুমিনদের চরিত্র।

কোমল এক নারী আসিয়া। তিনি শূলীতে চড়েছেন! দুর্বল নারী, যিনি চুল আঁচড়াতেন ফেরাউন-কন্যার, তিনি উত্তপ্ত তেলের সামনেও কম্পিত হননি! মক্কার উত্তপ্ত বালু বিলালকে নমনীয় করতে পারেনি! উমাইয়া ইবনে খালাফ বুকে শক্ত পাথর রেখেও তাকে টলাতে পারেনি! এইসব শাস্তির মুখেও তার জবান থেকে আহাদ... আহাদ... শব্দ বন্ধ হয়নি! জাদুকররা মুসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণ করেছিলেন। এ কারণে আড়াআড়িভাবে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে শূলীতে চড়ানো হয়েছে।

তারা সেদিন ফিরআউনকে বলেছিলেন—

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

তুমি যা ইচ্ছে করতে পার। যা করবার এই পার্থিব জীবনেই তো তুমি

> করবে।[১]

হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ

> *‘তোমাদের আগের লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যাকে ধরে নিয়ে তার জন্য জমিনে গর্ত করা হতো। তারপর করাত এনে মাথায় আঘাত করে দুটুকরা করে ফেলা হতো। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড্ডি খসানো হতো। তা সত্ত্বেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না।”*[২]

আপনি জান্নাতের পথে কোনো বিপদাপদের সম্মুখীন না হলে একে আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগ্রহ মনে করুন। তিনি জানেন, আপনি বিপদে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না, তাই তিনি তা আপনার থেকে দূর করে দিয়েছেন। আর যখন তিনি পরীক্ষা করবেন তখন আপনাকে নরম হলে চলবে না। পূর্ববর্তীদের মাধ্যমে সমবেদনা লাভ করতে হবে। প্রত্যেক অবাধ্যের মুখের উপর যেন আপনি সে কথাই বলে দিতে পারেন জাদুকররা যা ফিরআউনকে বলে দিয়েছিলেন—

إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

> *যা করবার এই পার্থিব জীবনেই তো তুমি করবে।*[৩]

চতুর্থ পাঠ

সাদাকাহকারীর কাছেও ধন-সম্পদ পছন্দনীয় বস্তু। যে পর্দা পালন করে, ফ্যাশন-স্টাইল তার কাছে অপছন্দনীয় নয়। যে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুর ঘাটে উপস্থিত হয় সেও জীবনকে ভালোবাসে।

---

[১] সুরা ত্বহা, আয়াত-ক্রম : ৭২
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৯৪৩
[৩] সুরা ত্বহা, আয়াত-ক্রম : ৭২

ফিরআউনের বাঁদি, যার চোখের সামনেই তার সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে, তার মাতৃত্ববোধ কম ছিল না। কিন্তু তারা জানেন আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। এই বাঁদির প্রতি লক্ষ করুন, তিনি মৃত্যু থেকে মাত্র কয়েক মুহূর্ত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছেন, তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা সন্তানকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, সেই মুহূর্তে তিনি ফিরআউনেকে বলছেন, যাতে তার এবং সন্তানদের হাড্ডিগুলো একসঙ্গে দাফন করা হয়। যদি তার মধ্যে মায়ের মমতাবোধ না থাকত তাহলে তিনি এমন অত্যাচারীর কাছে এই আবেদন করতেন না।

পঞ্চম পাঠ

অত্যাচারীরা অত্যাচারীই থাকে।

যুগে যুগে শুধু তাদের নাম আর পরিচয়ে পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা একই থাকে। ফিরআউন মুমিনদেরকে হত্যা করেছে। তাদেরকে শূলীতে চড়িয়েছে। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায় তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। উমাইয়া এবং আবু জেহেল উভয়েই মুমিনদেরকে শাস্তি দিয়েছে।

একজনের মাল লুট করা হয়েছে তো অপরজনকে বন্দী করা হয়েছে। তৃতীয় একজনের সম্মান হরণ করা হয়েছে তো চতুর্থ জনের বাড়িঘর ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আবার পঞ্চম কারও সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। এভাবেই অবাধ্যরা নিজের অজান্তেই একে অপরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। প্রতি যুগে তারা একই স্থানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। অত্যাচারী ও অবাধ্যদের এই ধারাবাহিকতা যেন শেষ হবার নয়।

কুষ্ঠ, টাক ও অন্ধ ব্যক্তি

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ ثَلَاثَةً فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هَذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّيْ أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَعْمَى فِيْ صُوْرَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ

فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِيْ وَفَقِيْرًا فَقَدْ أَغْنَانِيْ فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

'বনি ইসরাইলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেতরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেত রোগীটির কাছে এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কোন জিনিস অধিক প্রিয়?" সে জবাব দিল, "সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।" ফেরেশতা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হলো। অতঃপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন ধরনের সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়?" সে জবাব দিল, "উট।" অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হলো। তখন ফেরেশতা বললেন, "এতে তোমার জন্য বরকত হোক।" এরপর ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, "তোমার কাছে কোন জিনিস অধিক পছন্দনীয়?" সে বলল, "সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে।" ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, "কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়?" সে জবাব দিল, "গরু।" অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন। এবং ফেরেশতা দুআ করলেন, "এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক।" অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের কাছে আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন জিনিস তোমার কাছে অধিক প্রিয়?" সে বলল, "আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি।" তখন ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তার

> করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌঁছতে পারব।" সে বলল, "প্রকৃতপক্ষেই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকির ছিলাম। আল্লাহ আমাকে সম্পদশালী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম, আল্লাহর জন্য তুমি যা কিছু নেবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার কাছে কোনো প্রশংসাই দাবি করব না।" তখন ফেরেশতা বললেন, "তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিনজনের পরীক্ষা নেয়া হলো মাত্র। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার অপর দুই সাথির ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"' [১]

প্রথম পাঠ

শুধু অকল্যাণের মাধ্যমে পরীক্ষা হয় না বরং কল্যাণ দিয়েও পরীক্ষা হয়।

অকল্যাণমূলক পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ হলো সফলতা। কল্যাণমূলক পরীক্ষায় শুকরিয়া তথা কৃতজ্ঞতা হলো সফলতা।

এই তো সুলাইমান আলাইহিস সালাম। তিনি রানি বিলকিস আসার সংবাদ পেয়ে মানুষ ও জিন উভয় শ্রেণির সভাসদদের একত্রিত করলেন। তাদেরকে ইয়ামান থেকে বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসতে বললেন। শক্তিশালী জিন তা করতে সক্ষম হয়নি। একজন মুমিন ব্যক্তি এক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার ইসমে আজম জানতেন। যার মাধ্যমে তার কাছে দুআ করা হলে তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। চোখের পলকেই সিংহাসন তার সামনে উপস্থিত হয়ে যায়। সুলাইমান আলাইহিস সালাম বুঝতে পারলেন, তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাই তিনি অহংকার করেননি। শুধু বলেছেন—

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

> 'এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, নাকি অকৃতজ্ঞতা। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪৬৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৯৬৪। (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

> *করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল।*[১]

প্রাচুর্যের পরীক্ষায় সফলতা হলো নিজের জন্য প্রয়োজন-মাফিক খরচ করা আর অন্যান্য মানুষের জন্য অবারিত দানের দরজা খোলা রাখা। এ পরীক্ষায় ব্যর্থতা হলো কার্পণ্য করা। ফকিরের মতো জীবনযাপন করা আর ধনীর মতো হিসাব করা।

শক্তি পরীক্ষার সফলতা হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। দুর্বলকে সাহায্য করা। অকৃতকার্যতা হলো সীমালংঘন করা। অন্যের ওপর জুলুম করা। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

আপনার শক্তি যদি আপনাকে ধোঁকা দেয়, আপনি যদি মানুষের ওপর জুলুম করেন তাহলে মনে রাখবেন, আপনার ওপর শক্তিমান আল্লাহ রয়েছেন।

বিয়ে বিলম্বিত হওয়াটাও একটা পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে, আপনি কী করেন। আপনি কি আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেন নাকি অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়েন।দুআ কবুলে দেরি হওয়াটাও পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা দেখতে চান, এ-ক্ষেত্রে আপনি কী করেন। ধৈর্য ধারণ করেন, ইস্তেগফার পড়েন, নাকি রাগান্বিত হয়ে দাজ্জাল (তাগুতের) কাছে ধরনা দেন। স্মরণ করুন, যখন যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর সন্তান হচ্ছিল না, তিনি সিজদায় লুটিয়ে দুআ করেন। মেহরাবে থাকা-অবস্থায় সন্তানের সুসংবাদ আসে। আমরা তো এমন জাতি যারা সিজদায় পড়ে প্রার্থনা করে আর মেহরাবে তাদের সুসংবাদ শোনানো হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আপনার জবান থেকে প্রশংসা শুনতে চান। আল্লাহ তাআলা বান্দার জবানে নিজের প্রশংসাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। দেখতে চান, তার নেয়ামত পেয়ে আপনি কী করেন?

শুধু ধন-সম্পদের ক্ষেত্রেই কৃপণতা হয় না। যদিও ধন-সম্পদই কৃপণতার মূল।

[১] সুরা নমল, আয়াত-ক্রম : ৪০

আপনি জানেন, কোনো একটি পরামর্শ কারও উপকার করতে পারে, তাহলে তাকে সেটা না বলা কৃপণতা। কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য না দেওয়া হলে হয়তো কারও হক ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তা জানা সত্ত্বেও সাক্ষ্য না দেওয়া কৃপণতা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দিতে পারেন কিন্তু সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না মেটানো কৃপণতা। কোনো বৃদ্ধের ভারী বোঝা বহন না করা কৃপণতা। পথহারা মুসাফিরকে গাড়িতে আরোহণ না করানো কৃপণতা। আপনার কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম স্মরণ করা হলো কিন্তু আপনি তার ওপর দুরুদ পাঠ করলেন না, এটাও কৃপণতা।

বদান্যতা সর্বক্ষেত্রেই উত্তম গুণ। চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও সহযোগিতা—সর্বক্ষেত্রে...

ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে বদান্যতা সর্বোত্তম। যদিও অন্যগুলোর মূল্যও কম নয়।

আলোচ্য ঘটনায় কৃপণের পরিণাম দেখুন।

এই কুষ্ঠরোগীর কাছে উপত্যকা-ভর্তি উট ছিল। কিন্তু যখন তাকে বলা হলো, আল্লাহর পর আপনাকে ছাড়া আমার আর কোনো সাহায্যকারী নেই, তখন সে মাত্র একটি উট প্রদান করতেই কৃপণতা করেছে। তাই আল্লাহ তার সকল উট নিয়ে নিয়েছেন।

টাকওয়ালা লোকটির প্রতি লক্ষ করে দেখুন। তার পরিণাম কী হলো! উপত্যাকা-ভর্তি গরু থাকা সত্ত্বেও সে একটি মাত্র গরু দিতে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ তার সকল গরু নিয়ে গেছেন।

কিন্তু যে নিজের পূর্বের অবস্থা স্মরণ করে ফেরেশতাকে দিতে চেয়েছে, বলা হয়েছে আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদে বারাকাহ দান করুন!

একটি ঘটনাই আপনাকে চিরদিনের জন্য উঁচুতে উঠিয়ে দিতে পারে। আবার একটি ঘটনাই আপনাকে চিরকালের জন্য নীচে নামিয়ে দিতে পারে। জীবন তো বহু ঘটনার সমষ্টি মাত্র। তাই ব্যর্থতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

তৃতীয় পাঠ

ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে ভালোবাসার দলিল নয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে চমৎকার বিষয় হলো, আল্লাহ্ তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও নমরুদ উভয়কে গোটা দুনিয়া দিয়েছিলেন। যদি ধন-সম্পদ মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড হতো তাহলে একজন নবী এবং এক অবাধ্যকে সমান সম্পদ দেওয়া হতো না। রোমের রাজা-বাদশাহরা রেশমের উপর ঘুমাত। স্বর্ণের থালা-বাসনে পানাহার করত। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুলায় কয়েকদিন পর্যন্ত আগুন জ্বলত না। খন্দকের দিন তিনি পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। ছোটকালে ধনাঢ্য কুরাইশদের ছাগল চড়িয়েছেন। দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন করেছেন। আর দরিদ্র অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সময় ঋণের কারণে তার বর্ম এক ইহুদির কাছে বন্ধক হিসেবে ছিল। অথচ আল্লাহর তাআলার কাছে তিনি ছিলেন গোটা বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।

অতএব কোনো নেয়ামত প্রাপ্ত হলে শুকরিয়া আদায় করুন। নেয়ামত না পেলে ধৈর্য ধারণ করুন। আল্লাহ্ যদি আপনাকে নেয়ামত দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি সেই নেয়ামতই দিয়েছেন যা অন্যের জন্য নয়; বরং কেবল আপনার জন্য। আর তিনি কোনো নেয়ামত না দিয়ে থাকলে তাই দেননি যা আসলেই আপনার নয়; বরং তা অন্যের জন্য।

মানুষের সম্পদের দিকে তাকাবেন না। কেননা আপনি জানেন না যে, তাকে আসলে সম্পদ দেওয়া হয়েছে নাকি বড় কিছু থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।যুগে যুগে কাফেরদের হাতে ধন-সম্পদ ছিল। মুমিনদের চেয়ে তাদের ধন-সম্পদ বেশি ছিল। ধনাঢ্যতা প্রকৃতপক্ষে নিন্দনীয় নয়। হালাল মাল যদি মুমিন বান্দার হাতে থাকে তাহলে তা কতই-না উত্তম! কিন্তু আপনি এই ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকুন যে আল্লাহ্ আপনাকে অপছন্দ করেন বলে আপনার রিজিক সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ আপনাকে শাস্তি দিতে চান বলে আপনাকে অসুস্থ করেছেন।মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তাআলা যা দেন তা হেকমতের ভিত্তিতেই দেন, আর যা থেকে বঞ্চিত করেন তাও হেকমতের ভিত্তিতেই করেন।আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারব না যতক্ষণ না এই বিশ্বাস করতে পারব যে, আল্লাহ্ তাআলার না-দেওয়াটাও এক ধরনের দান।

চতুর্থ পাঠ

প্রকৃত চিকিৎসক তো আকাশে। বৃদ্ধা বন্ধ্যা নারীকে (ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী) আল্লাহ তাআলা মুহূর্তের মধ্যেই নবী (ইসহাক আলাইহিস সালাম)-প্রসবের যোগ্যতা দিয়ে দেন। বহু বছর তিনি (আইয়ুব আলাইহিস সালাম) রোগাক্রান্ত ছিলেন। রব তাকে বললেন—

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

> *'তুমি পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো। এটি তো গোসল করার এবং পানি পান করার ঠান্ডা ঝরনা।* [১]

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্বের চেয়েও সুস্থ হয়ে ওঠেন।

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার রবকে ডাক দিয়েছেন—

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا

> *'হে আমার রব! আমাকে একা রাখবেন না।'* [২]

তখন তাকে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর সুসংবাদ দেয়া হয়।

কুষ্ঠ রোগী, দুনিয়ার সকল ডাক্তার মিলেও যাকে সুস্থ করতে পারেনি, আল্লাহ তাআলা শুধু বলেছেন, তুমি সুস্থ হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হয়ে গেছে। এভাবে টাক ব্যক্তির চুল তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তবু চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের কাছে যেতে হবে। কেননা আমরা এমন জাতি যাদেরকে চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রোগ দূর করার জন্য ডাক্তারদের কাছে যাওয়াটা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। কেননা তা তো তাকদির অনুযায়ী হবে। যদি আল্লাহ চান তাহলে মানুষের হাতে মানুষকে সুস্থ করে তুলবেন। আর যদি তিনি না চান তাহলে দুনিয়ার সকল ডাক্তার মিলেও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তারপরও আমাদেরকে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হবে।

[১] সুরা সোয়াদ, আয়াত-ক্রম: ৪২
[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম: ৮৯

তাই চলুন, আমরা প্রকৃত ডাক্তারকে স্মরণ করি। বিশ্ব জগতের সকল কিছুর জন্য তিনি যথেষ্ট। ঔষধ সেবন করতে হবে, কেননা এটা সুস্থতা লাভের মাধ্যম।

তবে এসবের পূর্বে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা পড়ুন—

أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

> *'হে আমাদের রব, আপনি রোগব্যাধি দূর করে দিন। আপনি তাকে সুস্থ করুন। আপনিই তো কেবল সুস্থ করতে পারেন। আপনি এমন সুস্থ করুন যারপর কোনো রোগ ব্যাধি হবে না।'*[১]

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২১৯১

মদ

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

‘তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করো, কেননা তা নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতি। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক চরিত্রহীনা রমণী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক দাসীকে তার কাছে প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সঙ্গে গেল। সে যখনই কোনো দরজা অতিক্রম করত, দাসী পেছন থেকে সেটি বন্ধ করে দিত। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা মদ। সেই নারী আবেদকে বলল, “আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি, বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন, অথবা এই মদ পান করবেন, অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন।” সেই আবেদ বলল, “আমাকে এই মদের একটি মাত্র

পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা মদ পান করাল। তখন সে বলল, "আরও দাও।" মোটকথা ঐ আবেদ আর থামল না, এমনকি সে তার সঙ্গে ব্যভিচার করল এবং ঐ ছেলেকেও হত্যা করল। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ করো। কেননা আল্লাহর শপথ! মদ ও ঈমান কখনো সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।'[১]

প্রথম পাঠ

জীবন যদি সব সময় আমাদেরকে ভালো-মন্দের মধ্যে ইচ্ছাধিকার প্রদান করত তাহলে আমাদের ওপর অনেক অনুগ্রহ করত। তবে এই ধরনের ইচ্ছাধিকার হলো সৌখিনতা। সবসময় এর সুযোগ মেলে না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে জীবন আমাদেরকে দুটি বিষয়ের মধ্যে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে; যার সবচেয়ে সুমিষ্ট জিনিসও তিক্ত হয়ে থাকে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে কল্যাণকে বুঝতে পারে সে জ্ঞানী নয়, বরং যে ব্যক্তি দুটি অকল্যাণের মধ্যে কোনটি তুলনামূলক কল্যাণকর তা বুঝতে পারে সেই জ্ঞানী।'

কম ক্ষতিকর বিষয়টি নির্বাচন করা শরিয়তের একটি মূলনীতি। কিন্তু প্রবৃত্তির মাধ্যমে কম ক্ষতিকর বিষয়টি নির্বাচন করা যায় না; বরং পরিণাম এবং ফলাফল দেখে তা নির্ধারণ করতে হয়। যদিও দুটি মন্দের কোনোটিই না করার সুযোগ রয়েছে। কেননা যাকে অন্যের তুলনায় ছোট মনে করা হচ্ছে সেটাও কখনো প্রকৃতপক্ষে বড় অনিষ্টের এবং প্রজ্বলিত জাহান্নামের দ্বার হতে পারে।

উল্লিখিত ঘটনার প্রতি লক্ষ করুন, এই আবেদ লোকটি মনে করেছিল মদপান করাটা হত্যা ও ব্যভিচার থেকে কম ক্ষতিকর। কিন্তু সে মদ পান করার পর হত্যাও করেছে আবার ব্যভিচারও করেছে। সে শুরুতে যা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছে পরে তাতেই লিপ্ত হয়েছে।

[১] সুনানে নাসায়ি, হাদিস-ক্রম : ৫৬৮২। সনদ মওকূফ সহিহ।

দ্বিতীয় পাঠ

যারা আপনার সামনে বিভিন্ন সুযোগ রাখছে তারা এর মাধ্যমে আপনার চিন্তা-চেতনাকে আবদ্ধ করে ফেলছে।

দুটি বিষয়ের মধ্যে আপনার বিবেককে বন্দী করে ফেলছে। তারা আপনার মধ্যে একটা ধারণা তৈরি করে দিচ্ছে যে তারা যে বিকল্পগুলো পেশ করেছে সেটাই একমাত্র সুযোগ।

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে। একটি সাধারণ উদাহরণ লক্ষ করুন।

মনে করুন, আপনি কোনো বন্ধুর কাছে গেলেন আর বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি চা খাবে না কফি? সে এর মাধ্যমে আপনার সামনে দুটি বিষয়ে ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছে। তৃতীয় কোনো অপশন রাখেনি। কিন্তু সবসময় পেশকৃত দুটি বিকল্প লক্ষ্য পূরণ করতে পারে না। কখনো উভয়টিই ভুল হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সে আপনাকে বুঝাতে চায় যে, এ দুটির যে কোনো একটি অপরটি তুলনায় কল্যাণকর বা কম ক্ষতিকর। তারা আপনাকে ভুল পথে হাঁটাতে চায়।

কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তৃতীয় একটি পথ থাকে, যা আপনি সে মুহূর্তে দেখতে পারেন না। যা আপনার চিন্তা থেকে উবে যায়। কেননা আপনার সামনে পেশকৃত সুযোগের মধ্যে তা ছিল না। আপনি বুদ্ধিমান হোন। এ-জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হলে পেশকৃত বিষয় দুটি ব্যতীত তৃতীয় আরেকটি বিষয় গ্রহণ করুন। যা আপনাকে মুক্তির পথ দেখাবে।

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহ তাআলা উদ্ভিদের মধ্যে জীবন রেখেছেন। কিন্তু তাদের কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি ও চলৎশক্তি নেই। আর তিনি জীবজন্তুর মধ্যে জীবনীশক্তি এবং রুহ দিয়েছেন। কিন্তু তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি দেননি। আর তিনি মানুষের মধ্যে জীবনীশক্তি, রুহ, জ্ঞান-বুদ্ধি—সবকিছু দিয়েছেন। জ্ঞান-বুদ্ধিবিহীন মানুষ জীবজন্তুতুল্য। কেননা সে জীবজন্তুর মতোই নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করে থাকে।

আকলকে এই কারণে আকল বলা হয় যে, সে আকলবানকে বিভিন্ন কাজ থেকে বাধা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষের জন্য যেটা অনুপোযোগী সে তা করা থেকে বাধা প্রদান করে থাকে। এই কারণে পাগলের উপর থেকে সকল বিধি-বিধান উঠিয়ে

নেওয়া হয়েছে।

আকল তথা জ্ঞান-বুদ্ধি বিধি-বিধান আবশ্যক হওয়ার মূল। যার জ্ঞান-বুদ্ধি নেই তার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। এটা সেই ক্ষেত্রে যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কারও জ্ঞান-বুদ্ধি হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়।

যে ব্যক্তি নিজেই আপন বিবেক-বুদ্ধি বিদূরিত করে ফেলে সে জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকা অবস্থায় যা করবে এর জন্য তাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। কেউ মদ পান করে মাতাল হয়ে কাউকে হত্যা করলে তাকে কেসাস স্বরূপ হত্যা করা হবে।

আমি বুঝি না, মানুষ কেন নিজে নিজেই জীবজন্তু হয়ে যায়?

আল্লাহ তাআলা তো নিজেই তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে মানুষ হিসেবে সম্মানিত করেছেন!

কুরায়েশি ঈগল আবদুর রহমান আদ-দাখিল যখন আন্দালুসে প্রবেশ করেন তখন তার কাছে এক পেয়ালা মদ আনা হয়, তিনি তাদের বলেন, ‘যে জিনিস আমার জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ঘটাবে আমার সে জিনিসের প্রয়োজন, যা আমার জ্ঞান কমিয়ে দেবে তার কোনো প্রয়োজন নেই।’এটা সঠিক কথা যে, মদপান করা কবিরা গুনাহ, কিন্তু এই কারণে কেউ ধর্ম থেকে বের হয়ে যায় না। তবে হাদিসে মানুষের অন্তরকে ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঈমান এবং মদপান এ ঘরের ছাদের নিচে কখনো একত্রিত হতে পারে না। যদি কখনো অবস্থান করে তাহলে অচিরেই একটি অপরটিকে বের করে দেবে।

চতুর্থ পাঠ

এই দুনিয়াটা ফেতনা ও পরীক্ষায় পূর্ণ। কেননা এটি পরীক্ষাগার।

মানুষ সবসময় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যা কখনো তার স্বভাবের অনুকূল হয় আবার কখনো প্রতিকূল।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুটি বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

মারাত্মক ঘৃণার মাধ্যমে পরীক্ষা, পরম ভালোবাসার মাধ্যমে পরীক্ষা।

মারাত্মক ঘৃণা তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল। আর পরম ভালোবাসা ফেলে দিয়েছিল কারাগারে।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে লোকেরা এসব দুর্ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিলেন? যখন তিনি অপছন্দকারীদের মাধ্যমে পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছেন তখন ধৈর্য ধারণ করেছেন, যখন ভালোবাসার মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়েছেন তখনও ধৈর্যকেই অবলম্বন বানিয়েছেন।

কট্টর বিদ্বেষ তাকে তার ভাইদের স্তরে নামিয়ে দিতে পারেনি। তেমনিভাবে প্রচণ্ড ভালোবাসা তাকে বাদশাহর স্ত্রীর আনুগত্যে বাধ্য করতে পারেনি।

আমার মতে বিদ্বেষ ও শত্রুতাপূর্ণ পরীক্ষা ভালোবাসাময় পরীক্ষার চেয়ে সহজ। কেননা শত্রুর মাধ্যমে পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে আমাদেরকে অপছন্দনীয় বিষয়ে ইচ্ছাধিকার প্রদান করবে। কিন্তু যদি আমরা ভালোবাসার পাত্র দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হই তাহলে অধিকাংশ সময়ই সে আমাদের সামনে হারাম বিষয় পেশ করবে, প্রবৃত্তির তাড়নায় তখন আমরা তাতে ধাবিত হয়ে যাব।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম একজন সুঠাম ও শক্তিশালী যুবক ছিলেন। অন্যান্য পুরুষের যেমন প্রবৃত্তি-চাহিদা ছিল তেমনই তারও ছিল। আর আল্লাহ তাআলা মানুষকে বাসনা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।

বাদশাহর স্ত্রীর আবেদনে ধৈর্যধারণ করাটা তার কাছে ভাইদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণের চেয়ে কষ্টসাধ্য ছিল।

কাঠের পা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا

> *'বনি ইসরাইলে খাটো আকৃতির এক নারী দুজন দীর্ঘাঙ্গী নারীর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল। সে (উঁচু হওয়ার জন্য) এবং লোকদের চোখে ধরা না পড়ার জন্যে কাঠের দুটি পা তৈরি করে নেয় এবং সোনা দিয়ে একটি বড় আংটি তৈরি করে এর ভেতরে মেশক ভরে দেয়। আর তা হলো সুগন্ধিসমূহের মধ্যে সেরা সুগন্ধি। পরে সে ঐ দুই মেয়েলোকের মধ্য থেকে চলতে লাগল এবং লোকেরা তাকে চিনতে পারল না। সে-সময় তার হাত দিয়ে এভাবে ঝাড়া দিল। (এ কথা বলে বর্ণনাকারী শু'বাহ্ রহিমাহুল্লাহ তার হাত ঝাড়া দিলেন এবং ওই নারীর হাত ঝাড়ার ধরন নকল করলেন।)'*[১]

প্রথম পাঠ

এক বেদুইন বিয়ের নিকটবর্তী তার মেয়েকে উপদেশ দিয়ে বলল, 'স্বামী যেন সদা তোমার মধ্যে সুন্দর বিষয় দেখতে পায় আর যেন তোমার থেকে উত্তম ঘ্রাণ পায়।

জেনে রাখো, সর্বোত্তম সুগন্ধি হলো পানি (আতর)।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ওসিয়ত; যাতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা নিংড়ে পড়েছে।

সৌন্দর্য অবলম্বন করা উচিত। আর আতরই সর্বোত্তম সৌন্দর্য। নারী এর মাধ্যমে একজন পুরুষের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, চোখ-নাক এবং হৃদয়ে মোহনীয় হয়ে

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২২৫২

ওঠে। যদিও হাদিসে সুগন্ধি ব্যবহার করাকে নিন্দনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। তবে এটি সুগন্ধি খারাপ হওয়ার কারণে নয় বরং সুগন্ধি ব্যবহারের স্থান-কালের কারণে। নারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সে একমাত্র স্বামী এবং মাহরাম ব্যতীত কারও সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

> *'যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে, তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে ব্যভিচারিণী।'*[১]

তাকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য এমনটা বলা হয়েছে, তার ওপর ব্যভিচারের দণ্ড প্রয়োগ করার জন্য নয়।

ইসলামে বিশাল একটি দরজা রয়েছে, যার নাম হল 'ছাদ্দুয যারায়ে' (অর্থাৎ বিপদ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া)।

ইসলাম আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় না যে, আগে আগুন লাগুক পরে নেভানো হবে। বরং আগুন লাগার পূর্বে শুরুতেই ইসলাম তা বন্ধ করার চেষ্টা করে থাকে। যে জিনিস মানুষকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় সেটাও খারাপ কাজ।

দ্বিতীয় পাঠ

বাহ্যিক অবস্থা দেখে নারীরা দুই কারণে প্রভাবিত হয়ে যায়।

এক. তারমধ্যে প্রবৃত্তির বাসনা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

দুই. পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ তুলনামূলক বেশি।

এটি নারীর কোনো নিন্দনীয় বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তাআলাই তাকে এ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক সৃষ্টিকে কোনো এক জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার আচার-ব্যবহার-চরিত্র তা দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। প্রথম পুরুষ আদম আলাইহিস সালামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ-কারণে পুরুষরা কম

[১] আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৪১৭৩

সংবেদনশীল। আর চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও উৎপাদনে তারা অধিক আগ্রহী। পক্ষান্তরে হাওয়া আলাইহাস সালাম (নারী)-কে আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কারণে নারীজাতি পুরুষের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

সমষ্টিগত বিষয় খণ্ডিত বিষয়ের প্রতি যেভাবে আকর্ষিত হয় পুরুষও নারীর প্রতি সেভাবে আকর্ষিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে খণ্ডিত বিষয় সমষ্টিগত বিষয়ের প্রতি যেভাবে আকর্ষিত হয়ে থাকে নারীও পুরুষের প্রতি সেভাবে আকর্ষিত হয়ে থাকে।

এই কারণে নারীরা পুরুষের তত্ত্বাবধানে জীবনযাপন করতে কোনো কষ্টবোধ করে না। পুরুষ তার দেখাশোনা করে থাকে। তার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে থাকে। সে এক্ষেত্রে কোনো ত্রুটিবোধ করে না। কেননা তাকে কাজকর্ম এবং পরিশ্রম করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

পক্ষান্তরে নারী পুরুষের দেখাশোনা করা, তার খরচ চালানো সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষের কাছে সমস্যাকর। স্বামী স্বভাবগত জটিল রোগাক্রান্ত হলে পরেই কেবল এই বিষয়টা মেনে নিতে পারে যে, স্ত্রীও সংসারের খরচ বহন করুক। তবে কোনো পুরুষ সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়াটা বেশ মুশকিল বিষয়।

কারণ, উপরে বর্ণিত সবই আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট স্বভাব। যা দিয়ে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই কথার অর্থ এটা নয় যে, পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষণবোধ করে না, কিংবা নারী তাদের চোখ ও অন্তরের কাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়; বরং এ কথার উদ্দেশ্য হলো কোনো পুরুষের জীবন নারীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এটা খুব সম্ভব যে, পুরুষ কোনো নারীর একমাত্র জীবন ও দুনিয়া হবে।

তৃতীয় পাঠ

নারীর জন্য তার মনোবাসনাকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য না দেওয়া আবশ্যক।

যদিও মনোবাসনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, ধর্ম তো মানুষের মনোবাসনাকে নিঃশেষ করে দিতে আসেনি বরং তা সংশোধন ও পরিমার্জন করার জন্য এসেছে। নারীকে পুরুষের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, তার এ মনোবাসনা সকল পুরুষের জন্যই নিবেদিত হবে।

ইসলাম যখন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতা দান করেছে এর দ্বারা

নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে এই কাজের সক্ষমতা দান করেছেন। এটি এমন এক বিষয় পুরুষেরা বহুচেষ্টা করলেও নারীদের কাছে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না। তেমনিভাবে নারীরা বহু চেষ্টা করলেও তা পুরুষদেরকে বোঝাতে পারবে না। কেননা তাদেরকে এক স্বামী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

নারী যদি এক পুরুষের তত্ত্বাবধানে জীবনযাপন করে যায় তাহলে সে সওয়াবের উপযুক্ত হবে। যদি সে নিজের সৃষ্টিজাত প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে বহু পুরুষের প্রবৃত্তি-বাসনা পূরণ করতে যায় তাহলে সে গুনাহগার হবে। প্রকৃত নারী হলো যে তার স্বামীকে নিয়েই জীবনযাপন করে।

চতুর্থ পাঠ

পুরুষেরা শুধু নারীর সৌন্দর্য দেখতে চায় এবং তার সুঘ্রাণ শুঁকতে চায়।

তাই স্ত্রী স্বামীর জন্য এটা করলে সে সাওয়াব লাভ করবে। ফলে এতে স্বামী পরিতৃপ্ত হবে এবং তার চরিত্র পবিত্র থাকবে। পাশাপাশি স্বামী যা পছন্দ করে সেও সেটা পছন্দ করবে।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তো বলেছেন, সে যেমন আমার জন্য সৌন্দর্য অবলম্বন করে আমিও তার জন্য সৌন্দর্য গ্রহণ করি।

স্বামী যখন স্ত্রীর মনোবাসনা, তার ইচ্ছা ও প্রয়োজনপূরণে সাড়া দেয় তখন সে সওয়াব লাভ করে থাকে। পুরুষের দায়িত্বপালনে অবহেলা নারীকে অন্য পুরুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপের অনুমতি দেয় না। যেমনভাবে স্ত্রীর দায়িত্বপালনে অবহেলা পুরুষকে স্ত্রী ভিন্ন কোনো হারাম ক্ষেত্রে ভ্রুক্ষেপের অনুমোদন দেয় না।

আমাদেরকে গুনাহের পথ রুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

পুরুষেরা কেন নিজেদের বেশভূষা এবং সৌন্দর্যের প্রতি অধিক লক্ষ রাখবে? কারণ, আপনার স্ত্রী এমন পুরুষকে দেখলে বলবে, 'কেন আপনি তার মতো নন?' নারীরা কেন নিজেদের নারীত্বকে অধিক রূপে ফুটিয়ে তুলবে? কারণ আপনার স্বামী এমন নারীকে দেখলে আফসোস করবে, কেন তার স্ত্রী ওই নারীর মতো নয়! বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আনন্দ ভোগ করে থাকে। যার সামনে সকল সমস্যাই তুচ্ছ। বিয়ের মাধ্যমে পরিতৃপ্তকরণ অর্জিত না হলে তার কারণে

বহু সমস্যা ও সংকট তৈরি হবে। প্রকৃতপক্ষে যা মনোমালিন্যের কারণেই ঘটে থাকে।

আমি একটি বড় মূলনীতি বলে দিই, দেখবেন, ঘরের বড় বড় সমস্যাগুলো শোবার খাট থেকেই উদ্ভূত হয়।

পঞ্চম পাঠ

আগেকার যুগে সাধারণত কাঠ দ্বারা জুতার তলদেশ বিশেষভাবে উঁচু করা হতো। (বর্তমানে যাকে হাই হিল বলে।)

আগেকার যুগের আতরের আংটি বর্তমান যুগের সুগন্ধির মতোই হতো (স্প্রেয়ারের মতো)। যা মানুষের অন্তরকে উত্তেজিত করে তোলে। যুগে যুগে মানুষ আগের মতোই রয়ে গেছে। সময়ে সময়ে শুধু তাদের উপায়-উপকরণে পরিবর্তন ঘটেছে। আগের উপকরণগুলো এ যুগের সঙ্গে অধিক কার্যকরী ও উপকারী হয়ে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন—

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

> *'অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকেদের নীতি-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা (উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম) বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, এরা কি ইহুদি-নাসারা?" তিনি বললেন, "আর কারা?"'*[১]

বনি ইসরাইলের সর্বপ্রথম ফেতনা সংঘটিত হয়েছিল নারীকে কেন্দ্র করে। তাই পুরুষেরা যেন নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। কেননা তারা কমনীয় সত্তা। পুরুষের ওপর তাদের জন্য বহু অধিকার রয়েছে।

সৌন্দর্য-উপকরণ—সুগন্ধি-সুরমা—এগুলো হারাম নয়। এগুলো তো শুধু কিছু

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭৩২০

উপকরণ, ব্যবহারের ভিত্তিতে যার হালাল-হারামের দিকটি নির্ণিত হয়। প্রত্যেক সুগন্ধি আপন স্থানে পুণ্যের কাজ। প্রত্যেক সুরমা-কাঠি আপন স্থানে গুনাহ নয়। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে (এর ব্যবহারে) সওয়াব রয়েছে।

আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার কিছু লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ধনীরা আমলে এগিয়ে যাচ্ছে বলে অনুযোগ করেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকাহর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

> *‘এমনকি তোমাদের শরীরের অংশে সাদাকাহ রয়েছে। অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাও একটি সাদাকাহ। সাহাবিগণ বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কেউ তার কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে বৈধ পথে আর এতেও কি তার সাওয়াব হবে?” তিনি বললেন, “তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মেটাত বা ব্যভিচার করত তাহলে কি তার গুনাহ হতো না? অনুরূপভাবে যখন সে হালাল বা বৈধ পথে কামাচার করবে তাতে তার সাওয়াব হবে।”’*[১]

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১০০৬

সারা এবং ফিরআউন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَّا ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: ٨٩]. وَقَوْلُهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: ٦٣]. وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ، إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُخْتِي، فَأَتَى سَارَةَ قَالَ: يَا سَارَةُ: لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلاَ تُكَذِّبِينِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ، فَدَعَتِ اللَّهَ فَأُطْلِقَ، ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ، فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ، فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيَا، قَالَتْ: رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الكَافِرِ، أَوِ الفَاجِرِ، فِي نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ

> *‘ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি। তন্মধ্যে দুবার ছিল আল্লাহর ব্যাপারে। তার উক্তি ‘إِنِّي سَقِيمٌ’ ‘আমি অসুস্থ’।[১] এবং তার অন্য এক উক্তি ‘بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا’ ‘বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি।’[২] বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইবরাহিম আলাইহিস সালাম) এবং সারা কোনো এক অত্যাচারী শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছলেন। তখন শাসককে জানানো হলো, এ*

[১] সুরা সাফফাত, আয়াত-ক্রম : ৮৯
[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ৬৩

এলাকায় জনৈক ব্যক্তি এসেছে। তার সঙ্গে একজন পরমা সুন্দরী নারী আছে। শাসক তার কাছে লোক পাঠাল। লোকটি আগন্তুক (ইবরাহিম)-কে নারী সম্পর্কে জানতে চেয়ে বলল, "নারীটি কে?" তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার বোন।" অতঃপর তিনি সারার কাছে এলেন এবং বললেন, "হে সারা! তুমি আর আমি ব্যতীত পৃথিবীর ওপর আর কোনো মুমিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না।" অতঃপর সারাকে আনার জন্য শাসক লোক পাঠাল। তিনি যখন তার কামরায় প্রবেশ করলেন এবং সে তার দিকে হাত বাড়াল তখনই (আল্লাহর আযাবে) পাকড়াও হলো। অত্যাচারী এই শাসক তখন সারাকে বলল, "আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করো, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।" সারা তখন আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। ফলে সে মুক্তি লাভ করল। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাকে ধরতে চাইল। এবার সে পূর্বের মতো বা তার চেয়ে কঠিনভাবে পাকড়াও হলো। এবারও সে বলল, "আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করো। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।" আবারও তিনি দুআ করলেন, ফলে সে মুক্তি লাভ করল। অতঃপর শাসক তার এক প্রহরীকে ডাকল। সে (এলে) তাকে বলল, "তুমি তো আমার কাছে কোনো মানুষ আনোনি। বরং এনেছ এক শয়তান।" অতঃপর সে সারার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করল। (হাজেরকে নিয়ে) সারা ফিরে এলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কাছে। ইবরাহিম তখন নামাজে দাঁড়ানো। (নামাজ থেকেই) হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, "কী ঘটেছে?" সারা বললেন, "আল্লাহ কাফির বা ফাসিকের চক্রান্ত তারই বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সে হাজেরাকে খিদমতের জন্য দান করেছে।"'[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৩৫৮

প্রথম পাঠ

উল্লিখিত হাদিসের প্রেক্ষিতে নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি চলে আসে।

এ ব্যাপারে আলেমদের দুটি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য রয়েছে।

প্রথম বক্তব্য হলো, নবীগণ ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে নিষ্পাপ। তাদের থেকে কোনো ভুলত্রুটি সংঘটিত হয় না।

দ্বিতীয় বক্তব্য, নবীগণ ধর্মীয় ব্যাপারে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়েতের বাণী পৌঁছার ব্যাপারে নিষ্পাপ। তবে পার্থিব ক্ষেত্রে তাদের ভুল হতে পারে। ভুল আর গুনাহ এক নয়। সমস্ত গুনাহই এক প্রকার ভুল। কিন্তু সমস্ত ভুল গুনাহ নয়। নবী-রাসুলগণের মানবিক ভুল গুনাহ নয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে যদিও দ্বিতীয় মতটি প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী তবুও মনে করি না যে, পার্থিব ক্ষেত্রে নবীদের থেকে মিথ্যা সংঘটিত হতে পারে।

কেননা যদি বলা হয় যে, তাদের পক্ষ থেকে মিথ্যা সংঘটিত হতে পারে তাহলে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীগণ মিথ্যা বলতে পারেন—এই সন্দেহের দ্বার খুলে যাবে। অথচ নবীগণ এ থেকে মুক্ত ও সম্মানিত।

আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যে দুটি মিথ্যা বলেছিলেন সেগুলো তো তার কওমের বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণ দাঁড় করাবার জন্য বলেছিলেন, এরচেয়ে বেশি কিছু নয়।

আর অত্যাচারী বাদশাহর সঙ্গে যে মিথ্যা বলেছিলেন, আমি মনে করি এটি তাওরিয়ার (দুটি অর্থ প্রদানকারী কোনো শব্দের নিকটবর্তী অর্থ গ্রহণ না করে দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করার) অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমান মুসলমানের ভাই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সারা বংশীয়ভাবে নয়; বরং ধর্মীয়ভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর বোন ছিলেন।

আর দ্বিমুখী শব্দের মাধ্যমে বাহ্যত মিথ্যা বলার সুযোগ রয়েছে। যেমন আমাদের সাইয়েদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে যখন হিজরত করছিলেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনারা কোন গোত্রের?' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, 'আমরা মা (পানি) থেকে।' বেদুইন বলল, 'আরবে তো বহু গোত্র রয়েছে!' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, মানুষকে যে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে তিনি সেই পানি থেকে।

দ্বিতীয় পাঠ

মিথ্যা সম্পর্কে যেহেতু আলোচনা এল তাই প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা এখানে যেসব স্থানে মিথ্যা বলা বৈধ তা উল্লেখ করছি।

ইসলাম তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার বৈধতা প্রদান করে।

এক. শত্রুর সঙ্গে মিথ্যা বলা।[১]

এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বিষয় যে, আমাদের শত্রু কাফেররা কোনো মুসলমানকে বন্দী করে নিয়ে যাবে আর তারা জিজ্ঞেস করলে তাদের সঙ্গে সত্য কথা বলতে হবে!

মুসলমানদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য এই ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার বৈধতা প্রদান করা হয়েছে।

দুই. মীমাংসা করার জন্য মিথ্যা বলা।

এই ক্ষেত্রে মীমাংসাকারী ব্যক্তি বিবদমান দুই ব্যক্তির ব্যাপারে এমন উত্তম কথা বলতে পারে যা আসলে তাদের কেউই অপরের ব্যাপারে বলেনি। পার্থিব বিষয়ে সংশোধন এবং মানুষের ঝগড়া-বিবাদ দূর করার লক্ষ্যে এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তিন. স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী কিংবা স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মিথ্যা বলা।

অন্তর জয় করা, সদাচরণ এবং সৌজন্যতার জন্য এ সুযোগ রাখা হয়েছে।

কিন্তু ক্ষতি, ধোঁকা বা প্রতারণার জন্য এসব স্থানে মিথ্যা বলা যাবে না। যেমন স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করা। তার সুনাম করা। অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত। কিংবা তার প্রশংসা করা, তার সঙ্গে প্রেমালাপ করা। তাকে বলা যে, সে-ই দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারী। অথচ আসলে তেমনটা নয়।

পুরুষদের ব্যাপারে যা বলা হলো নারীদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

---

[১] শত্রু বলতে এখানে দারুল হারবের কাফেরদের কথা বলা হচ্ছে। যুদ্ধাবস্থায় তাদের সঙ্গে মিথ্যা বলা বৈধ। হাদীসে এসেছে, যুদ্ধ হলো ধোঁকা। (সুনানে তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ১৯৩৯) — অনুবাদক।

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, সে কি তাকে সত্যিই ভালোবাসে। সত্য কথার বলার জন্য সে আল্লাহর দোহাইও দিল। স্ত্রী তাকে বলল, 'তুমি যখন আমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে সত্য বলতে বললে, তাহলে শোনো, আমি তোমাকে ভালবাসি না।' লোকটি তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে অভিযোগ দায়ের করল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই নারীকে ডেকে পাঠান এবং তাকে সতর্ক করে দেন। ওই নারী বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি এটা চান যে আমি তার সঙ্গে মিথ্যা বলি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তার সঙ্গে তুমি মিথ্যা বলবে। সকল ঘর তো ভালোবাসার উপরই গড়ে উঠেছে। জেনে রাখো, মানবতা এবং সম্মানের ভিত্তিতে লোকেদের সঙ্গে আচরণ করতে হয়।'

তৃতীয় পাঠ

এক রাতে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যায়। পরদিন সকালে আমি ব্যায়াম করতে বের হই। বের হয়ে দেখি বহু গাছপালা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু পাখির বাসাগুলো পূর্বের অবস্থায় সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে। এটা থেকে আমি এক চমকপ্রদ শিক্ষা লাভ করি যে, মানুষকে কখনো নিচু হতে হয়। জ্ঞানীরা অবস্থা যাচাই করেন। তারা শুধু শুধু বৃথা হৈ-হল্লা করেন না। তাই আমাদেরকে কখনও কখনও খুব ভালোভাবে প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে। কেননা হিসাবে কোনো ধরনের ভুল হলে তা আমাদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। কখনো কখনো বিবাদ-বিসংবাদে সফলতার একটি মাত্র রাস্তাই বাকি থাকে। সেটি হলো তাতে কোনোভাবেই জড়িত না হওয়া।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ।

তিনি জানতেন, তিনি যদি মিশরের বাদশাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান তাহলে সে তাকে মেরে ফেলবে। আর তিনি শহিদ হয়ে যাবেন। তিনি কোনো ভীতু মানুষ ছিলেন না। শাহাদাতের অনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, বাদশাহর বাড়াবাড়ির প্রতিবাদের তুলনায় অন্য এক বড় বিষয়ের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে। তাই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর কাছে বিষয়টি ন্যস্ত করে দেন। কেননা চেষ্টা-প্রচেষ্টা অনুযায়ীই কাজের ফল হয়ে থাকে।

অত্যাচারী বাদশাহ তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদে সম্মানিত অবস্থায় ফিরে আসেন। তার সঙ্গে

আরেকজন নারীও আসেন যিনি পরবর্তী সময়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

চতুর্থ পাঠ

বংশগতভাবে অভিজাত নারীরা স্বামীকে কখনো খোঁটা দেয় না।

সারা আলাইহাস সালাম তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রমণী ছিলেন।

তাফসির বিশারদগণ বলেছেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার দাদি সারা থেকেই সৌন্দর্য লাভ করেছেন। তার এত সৌন্দর্য সত্ত্বেও তিনি ভদ্র এবং স্বামী-ভক্ত ছিলেন। হক কাজে স্বামীকে সহায়তা করতেন। আল্লাহ্-প্রদত্ত সৌন্দর্যের কারণে স্বামীর ওপর অহংকার করতেন না।

তেমনিভাবে আমাদের মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বংশগতভাবে অভিজাত ছিলেন। তার অঢেল সম্পত্তি ছিল, আর স্বামী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র, খাদিজা নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ স্বামীর হাতে তুলে দেন।

এই পার্থিব ও বস্তুগত পার্থক্য তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়নি। ফলে তিনি স্বামীর কাছে যেমন মর্যাদাবান হয়েছেন তেমনি মৃত্যুর পরেও মর্যাদাবান থেকেছেন। তিনি মাটির নিচে কবরে শায়িত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে কোনো বিরূপ কথা সহ্য করতে পারতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বেশি বেশি স্মরণ করতেন। এ কারণে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ঈর্ষা হতো।

একদিন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলে বসেন, 'আপনি এখনো তাকে স্মরণ করেন অথচ তিনি ছিলেন পুরনো দিনের এক বৃদ্ধা নারী। আল্লাহ্ আপনাকে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ আমাকে খাদিজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেননি। সে এমন এক নারী ছিল আমাকে যার ভালোবাসা প্রদান করা হয়েছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে সে তখন আমাকে দান করেছে। মানুষ যখন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে তখন আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তারা যখন

আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে সে তখন আমার প্রতি ঈমান এনেছে।’ [১]

পঞ্চম পাঠ

মুসলমান অত্যন্ত মর্যাদাবান, তার মান-সম্মান রক্ষা করা শরিয়তের দাবি।

তবে মুসলমান ভীতু নয়। সে সবসময় মৃত্যুকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু মানুষ নিজে নিজে কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু’র বিজয়াভিযানের মাধ্যমে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। আর এটা সকলেই জানে যে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন কুশলী মানুষ ছিলেন। তিনি বন্ধুত্ব ও মিত্রতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শত্রুর জন্য পলায়নের রাস্তা রেখে আসতেন না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ব্যাপারে বলেছেন, ‘শপথ! এটাই তো বিজয়।’

তিনি সম্ভব হলে তার এবং শত্রুপক্ষের রক্ত-ঝরানো ব্যতীতই লক্ষ্য অর্জন করতে পারাটা পছন্দ করতেন। সেনা-কমান্ডারদের জন্য এই বাস্তবতা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

তারা যেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর গৃহীত কৌশল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তেমনিভাবে তারা যেন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র কুশীলব-চিন্তা এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র প্রশংসার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৮২১

আদম ও মুসা আলাইহিমাস সালাম-এর আলাপচারিতা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَامًا، قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ «

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

> *‘আদম ও মুসা (আলাইহিমাস সালাম) তাদের রবের কাছে বিতর্ক করলেন। অতঃপর আদম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম এর ওপর জয়ী হলেন। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, “আপনি তো সেই আদম যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তিনি তাঁর রুহকে ফুঁকে দিয়েছেন, তিনি তাঁর ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদাহ করিয়েছেন এবং তাঁর জান্নাতে আপনার আবাসন বানিয়ে দিয়েছেন। তারপর আপনি আপনার ভুলের কারণে মানবজাতিকে দুনিয়াতে নামিয়ে দিয়েছেন।” আদম আলাইহিস সালাম বললেন, “আপনি তো সেই মুসা, যাকে আল্লাহ তাআলা রিসালাত দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য বাছাই করেছেন এবং দান করেছেন (বিশেষ সহিফা-লেখা)*

কয়েকটি কাষ্ঠখণ্ড, তাতে সব বিষয়ের বর্ণনা লিখিত রয়েছে এবং নির্জনে আলাপচারিতার জন্যে নৈকট্য দান করেছেন। কিন্তু আমার জন্মের কত বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন তা-কি আপনি দেখেছেন?" মুসা বললেন, "৪০ বছর পূর্বে।" আদম বললেন, "আপনি কি তাতে পাননি— 'وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ' 'আদম (ভুল করে) তার রবের আদেশ অমান্য করেছেন এবং পথহারা হয়েছেন।'?"[১] আদম বলেন, "এরপরও আপনি আমাকে আমার এমন কর্মের জন্য কেন ভর্ৎসনা করছেন যা আমাকে সৃষ্টি করার ৪০ বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য লিখে রেখেছেন?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরপর আদম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম এর ওপর বিজয় লাভ করেন।"[২]

প্রথম পাঠ

অভিজাত লোকেরা মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ করে থাকে।

মর্যাদাবান ব্যক্তিরাই কেবল মর্যাদাবান ব্যক্তির সম্মান-মর্যাদাকে সংরক্ষণ করতে পারে।

তাই আপনি অভিজাত হোন। একটি ঘটনার মাধ্যমে অভিজাত ব্যক্তির সুনাম-সুখ্যাতির ইতিহাস মুছে ফেলবেন না। বদান্যতার অধিকারী ব্যক্তি একবার দান না করলেই তার পূর্বের বদান্যতা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। সহনশীল ব্যক্তি একবার রাগান্বিত হয়ে গেলেই তার পূর্বের সহনশীলতাকে অস্বীকার করা যাবে না। অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী মানুষ একবার ক্লান্ত হয়ে গেলেই তার পূর্বের পরিশ্রমকে অস্বীকার করা যাবে না।

দুই অভিজাত ব্যক্তি—আদম এবং মুসা আলাইহিমাস সালাম-এর আলাপচারিতা লক্ষ করুন, তারা বিশ্ব জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জান্নাতের ব্যাপারে বিতর্ক করছেন। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম আদম আলাইহিস সালাম-কে তিরস্কার করতে গিয়ে আদমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভুলে যাননি। তেমনিভাবে আদম

[১] সুরা ত্ব-হা, আয়াত-ক্রম : ১২১
[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৬৫২; সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৬১৪

আলাইহিস সালাম আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদার কথা ভুলে যাননি। তাই তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের মান-মর্যাদা রক্ষা করুন।

দ্বিতীয় পাঠ

আমরা গায়েবে বিশ্বাসী উম্মত।

দেখে বিশ্বাস স্থাপন করা জিনিসের তুলনায় না-দেখে বিশ্বাস স্থাপন সংক্রান্ত জিনিসের পরিমাণ বেশি। আমরা জান্নাত-জাহান্নাম, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত, ফেরেশতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর ঈমান রাখি। আর এসবই গায়েবি বিষয়।

কুরআনে উল্লিখিত মুত্তাকিদের সর্বপ্রথম গুণ হলো তারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনেন।

আল্লাহ্ তাআলা সুরা বাকারার শুরুতেই বলেছেন—

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

> *‘এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য, যারা গায়েবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।* [১]

আয়াতে গায়েবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি নামাজ জাকাত এবং সাদাকার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানবিহীন ইবাদত পণ্ডশ্রম বৈ কিছু নয়। এর কোনো সওয়াব মিলবে না।

আদম ও মুসা আলাহিমাস সালাম-এর উল্লিখিত আলাপচারিতা গায়েবি জগতে হয়েছিল। পরম সত্যবাদী বিশ্বস্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ প্রদান করেছেন। অন্য সকল গায়েবি বিষয়ের প্রতি যেমন আমরা কেন কখন

[১] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২৩

কীভাবে প্রভৃতি প্রশ্ন ব্যতীত ঈমান এনে থাকি তেমনি এর প্রতিও ঈমান আনি।

তৃতীয় পাঠ

আপনার সিদ্ধান্তও ভুল হতে পারে। তাই আপনি নিজেকে নির্ভুল নিষ্পাপ মনে করে পৃথিবীতে চলাফেরা করবেন না। মানুষের ব্যাপারে আপনার অবস্থান তো নিছক অনুমান।

যদি আপনি তাদের অবস্থান বুঝতেন, বিরোধীদের পক্ষ থেকে নয় বরং তাদের পক্ষ থেকেই যদি আসল বিষয় শুনতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে, আপনি এক ভুলের প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন।মুসা আলাইহিস সালাম-এর কথাই ধরুন না! তিনি ভেবেছিলেন আদম আলাইহিস সালাম ভুল করেছেন। এই ভাবনা থেকেই তিনি আদমের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু আলাপচারিতা শেষ না হতেই আদম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম-কে তর্কে পরাস্ত করে দেন। তাই নিজে নিজেই কোনো অবস্থান তৈরি করবেন না। তা থেকে নিজেই কোনো মতামত বের করবেন না। এবং এটাকেই দ্বীন ভেবে বসে থাকবেন না।

চতুর্থ পাঠ

চিন্তার মাধ্যমে অন্য চিন্তাকে আঘাত করা যায়। দলিলের মাধ্যমে অন্য দলিলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা যায়। তরবারি রক্ত ঝরাতে পারলেও কখনো সঠিক সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করে দিতে পারে না। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কখনো হককে বাতিল বানানো যায় না। যদিও সাময়িকের জন্য তার ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

তাই ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো চিন্তিত হবেন না। যেখানে লাঠি ব্যবহার করা সম্ভব সেখানে তরবারি ব্যবহার করাটা আহাম্মকী। যেখানে মুখ ব্যবহার করা সম্ভব সেখানে লাঠি ব্যবহার করাটা নির্বুদ্ধিতা। যেখানে দৃষ্টি ক্ষেপণ যথেষ্ট সেখানে মুখ ব্যবহার করাটা দ্রুত-প্রবণতা।

আপনি শক্তিশালী হোন, নির্বোধ হবেন না। সবসময় স্মরণ রাখুন, অবস্থার তুলনায় ব্যক্তির মূল্য অনেক। যে ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রেই বিজয় লাভের আশা করে তার সঙ্গে কেউই থাকে না।

পঞ্চম পাঠ

কুরআনুল কারিম হেফাজত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সংরক্ষণ না করাটা তার অক্ষমতা নয় বরং তিনি পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছেন। আপনি যদি তাওরাত খুলে খুঁজেন যে—'وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ' 'আদম (ভুল করে) তার রবের আদেশ অমান্য করেছেন এবং পথহারা হয়েছেন'।[১]

তাহলে আপনি তাওরাতে কখনোই এ বাক্য পাবেন না।

যদিও হাদিসে বলা হয়েছে, এক নবী অপর নবীকে এটা তাওরাতে বিদ্যমান থাকার কথা বলছেন, কিন্তু বনি ইসরাইলের পাদ্রীরা তাওরাত বিকৃত করে ফেলেছে। যেভাবে খ্রিষ্টান যাজকরা ইঞ্জিল বিকৃত করেছে।

আল্লাহ তাআলার চিরসত্য কিতাব—কুরআন তিলাওয়াত করতে পারাটা আমাদের জন্য নেয়ামত। আমরা এমন এক কিতাব পাঠ করছি যেটা আল্লাহর কালাম। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

এটি একটি জীবন সঞ্চারকারী কিতাব। যাদের অন্তর জীবিত তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। মৃতদের সামনে পাঠ করে টাকা উপার্জনের জন্য নয়। অন্ধ ও মৃত ব্যক্তিরা এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হয় কিনা আমি এই বিষয়ে বিতর্কে যেতে চাই না। এটি অত্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা, এর স্থান এটি নয়।

কিন্তু জীবিত থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হয়নি সে মৃত্যুর পরও এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে বলে মনে হয় না।

ষষ্ঠ পাঠ

আল্লাহ তাআলা সকল জিনিস লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন।

যা লিখে রেখেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাআলা

[১] সুরা ত্ব-হা, আয়াত-ক্রম : ১২১

নিজের অসীম জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ডের বিবরণ লিখে রাখার কারণে তারা জিজ্ঞাসার ঊর্ধ্বে উঠে যায় না। অন্যথায় সওয়াব ও শাস্তির বিষয়টি তিরোহিত হয়ে যাবে। আর তখন আমরা নিজেদের অজান্তেই আল্লাহ্ তাআলাকে দোষারোপ করা শুরু করে দেব।

প্রশ্ন উঠবে যে, আল্লাহ মানুষের ব্যাপারে যা লিখে রেখেছেন মানুষ তা করলে কেন সে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে?

উত্তর হচ্ছে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান অসীম। তার কখনো কোনো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে না।

বিষয়টি বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দিই।

মনে করুন, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে একটি সন্তান দান করেছেন। দীর্ঘ কয়েক বছর আপনি চোখের সামনেই তাকে লালনপালন করেছেন। আপনি তার স্বভাব-চরিত্র আচার-উচ্চারণ-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

এইসবের মাধ্যমে আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আপনার সন্তানটি একসময় চুরি করবে।

এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে।

ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার অর্থ কি এটা যে, আপনি তাকে চুরি করতে বাধ্য করেছেন?

নাকি আপনি বিভিন্ন বিষয় অনুমান করে একটি বিষয় বলেছেন আর তা সঠিক হয়ে গেছে।

লাওহে মাহফুজে লিখে রাখার বিষয়টি এমনই। তবে এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। যা আমাদের জন্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তা হলো আমাদের জ্ঞান সসীম। আর আল্লাহর জ্ঞান অসীম। আমাদের জ্ঞান অনুমান-নির্ভর আর আল্লাহর জ্ঞান সুনিশ্চিত।

কোনো কিছু করা বা না-করার ক্ষেত্রে আমরা যতই স্বাধীন হই না কেন আমাদের জন্য কখনো তাকদিরের মাধ্যমে নিজেদের কাজকর্মের দলিল-প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরই কেবল আমরা আল্লাহ তাআলার

তাকদির সম্পর্কে জানতে পারি। কেউ কাউকে হত্যা করা বা চুরি করাটা আল্লাহ্ তাআলার লিখিত তাকদির অনুযায়ী হয়ে থাকে। তবে এ কাজে সে বাধ্য নয়। অন্যথায় দ্বীন-ধর্ম বলতে কিছুই বাকি থাকবে না। নবী-রাসুল পাঠানোরও তখন কোনো উদ্দেশ্য রইবে না।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বেই জানেন যে, কারা জান্নাতি হবে আর কারা জাহান্নামি। তবুও আল্লাহ তাআলা নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের তাকদিরের পরিক্রমায় জীবনযাপন করতে পারে।

শত মানুষের হন্তারক যে ব্যক্তি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ»

> *'তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে ৯৯টা খুন করেছে। তারপর সমকালের শ্রেষ্ঠ আলেম সম্পর্কে জানতে চাইল (তাওবা করার জন্য)। লোকজন তাকে একজন ধর্মগুরুর সন্ধান দিল। সে ওই ধর্মগুরুর কাছে গিয়ে সে যে ৯৯টা খুন করেছে তা উল্লেখ করে জানতে চাইল—এমতাবস্থায় তার জন্য তাওবার সুযোগ আছে কি না। ধর্মগুরু গুরু বললেন, "না।" তখন সে ধর্মগুরুকেও হত্যা করে ফেলল। তাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে খুনের সংখ্যা সে একশ' পূর্ণ করে নিল। অতঃপর সমকালের শ্রেষ্ঠ আলেম সম্পর্কে সে আবারও জানতে চাইল। লোকজন*

তাকে একজন আলেমের সন্ধান দিল। ফলে ওই আলেমের কাছে গিয়ে সে যে ১০০টা খুন করেছে তা উল্লেখ করে জানতে চাইল—এমতাবস্থায় তার জন্য তাওবার সুযোগ আছে কি না। আলেম বললেন, "হ্যাঁ। এমন কে আছে যে ব্যক্তি তার মধ্যে ও তার তাওবার মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে! তুমি অমুক এলাকায় যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন আছে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত হও। নিজের ভূমিতে আর কখনোই প্রত্যাবর্তন কোরো না। কেননা এ দেশটি ভয়ংকর খারাপ।" তারপর সে চলতে লাগল। যখন সে মাঝপথে পৌঁছুল তখন তার সামনে মৃত্যু এসে হাজির। এবার রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে বিতর্ক দেখা গেল। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, "সে আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাওবার উদ্দেশে বেরিয়েছে।" আর আযাবের ফেরেশতারা বললেন, "সে তো কখনোই কোনো সৎ কাজ করেনি।" এমতাবস্থায় মানুষের আকৃতিতে এক ফেরেশতা এলেন। তারা তাকে তাদের মধ্যস্থতাকারী বানালেন। তিনি বিতর্করত উভয় ফেরেশতা বললেন, "তোমরা উভয় স্থান পরিমাপ করো (নিজ ভূখণ্ড ও যাত্রাকৃত ভূখণ্ড)। এ দুই ভূখণ্ডের মধ্যে যা নিকটবর্তী হবে সে অনুযায়ী তার ফায়সালা হবে।" তারপর উভয়ে পরিমাপ করে দেখলেন যে, সে ঐ ভূখণ্ডেরই বেশি নিকটবর্তী যেখানে পৌঁছার জন্যে সংকল্প করেছে। অতঃপর রহমতের ফেরেশতা তার রুহ কবজ করে নিলেন।' [১]

প্রথম পাঠ

ধর্মীয় কোনো বিষয়ে আপনার সন্দেহ হলে আলেমের দরজায় করাঘাত করুন, আবেদের দরজায় নয়।

আবেদ নিজের জন্য ইবাদত করে থাকে আর মানুষের জন্য মূর্খতা বিলিয়ে থাকে। আর আলেম অনেক সময় বাহ্যিক ইবাদত কম করে নিজের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু মানুষের জন্য সে নিজ ইলম বিলিয়ে থাকে।

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৭৬৬

আমাদের কেউ অসুস্থ হলে ডাক্তারের দরজায় করাঘাত করে। কারও গাড়ি নষ্ট হলে সে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার তালাশ করে। কোনো টেবিল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে অভিজ্ঞ কাঠমিস্ত্রির পাত্তা জানতে চায়।

দ্বীন তো এ সমস্ত কিছুর তুলনায় অনেক বেশি দামি, তাই দ্বীনের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই দ্বীন বিষয়ে বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করব।

মসজিদে আসা-যাওয়া করনেওয়ালা প্রত্যেক ব্যক্তিই আলেম ও ফকিহ নয়। ইবাদত প্রশংসনীয় বিষয় বটে, কিন্তু তা এক বিষয় আর ইলম আরেক বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের সকলেই ফাতোয়া প্রদানকারী ছিলেন না। তাদের একেক জন একেক বিষয়ে বিজ্ঞ ছিলেন।

উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথাই ধরুন না! সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারী ছিলেন। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন। আবু বকর সিদ্দিক এবং তার পরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কুরআনুল কারিম একত্রিত করতে চাইলেন তখন তারা যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নয়। আর যখন তারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মুসলমানদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বিশ্বজগত তো বহু টুকরো বিষয়ের সমষ্টি। আর এ প্রত্যেক বিষয়েই একেকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন।

যাবারকান ইবনে আদি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে নালিশ নিয়ে এসেছিলেন—হুতিয়া এই তাকে এই বলে নিন্দে করেছিল—তুমি সম্মান ছেড়ে দাও, তা পাবার জন্য সফর করো নাতুমি বসে থাকো, কেননা তুমি আহার্য গ্রহণকারী এবং পোশাক পরিধানকারী

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে বললেন, 'আমি তো এতে নিন্দের কিছু দেখি না।' যাবারকান বললেন, 'খাবার-পোশাকই কি আমার সম্মানের জন্য যথেষ্ট?' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে চাইলেন। তিনি তখন কুরআনুল কারিমের সবচেয়ে বড় কারী উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডাকেননি, কুরআনের ব্যাখ্যাকার ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেও না,

হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেও না, সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেও না, বরং তিনি হাসসান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে আনেন।

কেননা বিষয়টি কবিতা-সংক্রান্ত। কবিতা-সংক্রান্ত বিষয়ে কবিরাই ফতোয়া প্রদান করবেন।

হাসসান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বললেন, 'এ কবিতার মাধ্যমে তার শুধু নিন্দেই জ্ঞাপন করা হয়নি; বরং তার ওপর পেশাব করে দেওয়া হয়েছে।' অর্থাৎ তার মারাত্মক নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন হুতিয়াকে বন্দী করেন।

দ্বিতীয় পাঠ

যে ব্যক্তি বলল—আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন—সে বস্তুত ফতোয়াই প্রদান করল। তাই কোনো মাসআলায় আল্লাহ তাআলার হুকুম কী, তা না জানলে 'আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন' বলতে সংকোচ বোধ করবেন না।

'আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন' বলতে লজ্জাবোধ করে মানুষের গুনাহ নিজ কাঁধে বয়ে আনবেন না।

শা'বি রহমতুল্লাহি আলাইহি'র কথাই ধরুন না! তিনি একাধারে একজন আলেম, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও কাজি।

তাকে এক মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।'

লোকেরা তাকে বলল, 'আপনি ইরাকের বড় ফকিহ, "আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন"—এ কথা বলতে কি আপনার লজ্জা লাগে না?'তিনি উত্তরে বললেন, 'ফেরেশতারা তো এটা বলতে লজ্জাবোধ করেননি যে—

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

> *'আপনি পবিত্রতম সত্তা! আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের*

> *কোনো ইলম নেই। নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানী, হেকমতবান।*[১]

মালেক ইবনে আনাস রহমতুল্লাহি আলাইহি'র কথাই ধরুন না! তিনি ছিলেন দারুল হিজরাহ মদিনার ইমাম। যাঁর ব্যাপারে বলা হতো—মালেক মদিনায় থাকাবস্থায় কারও ফতোয়া প্রদানের সাহস নেই। একবার ইরাক থেকে এক ব্যক্তি তার কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে এল। তিনি কিছুর উত্তর দেন আর বাকিগুলো সম্পর্কে চুপ করে থাকেন। লোকটি তখন বলল, 'হে মালিক, আমি ইরাকবাসীকে গিয়ে কী বলব?' তিনি বললেন, 'তাদেরকে গিয়ে বোলো, মালিক এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না।'

তৃতীয় পাঠ

গুনাহ যতই বেশি হোক না কেন আপনি এই ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকবেন যে, আপনার গুনাহ আল্লাহ তাআলার রহমতের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে।

শয়তান তো আপনার থেকে এটাই চায়! সে আপনার চোখে গুনাহকে বড় করে দেখাতে চায়। আল্লাহ তাআলার রহমতকে ছোট করে দেখাতে চায়। অথচ আল্লাহর রহমত আপনার গুনাহর চেয়ে বহুগুণ বিস্তৃত এবং বড়।

আপনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকুন।

উল্লিখিত লোকটি ৯৯জন মানুষকে খুন করে তাওবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর সে আগের অবস্থানে চলে গেছে। আরেক জনকে হত্যা করে শত সংখ্যা পূরণ করেছে।

আল্লাহ তাআলা যখন তার অন্তরে কল্যাণ দেখতে পেয়েছেন তখন তার জন্য তাওবার উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে আল্লাহর ব্যাপারে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সে নিজের জিনিসপত্র ও পাথেয় নিয়ে সফরে বের হয়ে গেছে। রাস্তায় তার মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে।

সহিহ বুখারিতে এসেছে—ফেরেশতারা দূরত্ব পরিমাপ করে দেখলেন লোকটি রাস্তার ঠিক মধ্যখানে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তখন মাটিকে নির্দেশ দেন—'তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও!' এভাবে সে নেককারদের ভূখণ্ডের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

[১] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ৩২

এই তাওবাকারী প্রকৃতপক্ষেই এক খুনি ছিল। সামান্য থেকে সামান্য কারণে সে লোকজনকে হত্যা করত। ধর্মগুরুর ফতোয়া তার পছন্দ হয়নি, তো তাকে হত্যা করে ফেলেছে। শিরকের পর হত্যার চেয়ে বড় কোনো গুনাহ নেই, তবুও আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেছেন। মনে রাখবেন, হারাম কাজের সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা আল্লাহর রহমতের চেয়ে বেশি নয়। আপনার ঘুষ আল্লাহর রহমতের চেয়ে বেশি নয়। আপনার মদ্যপান আল্লাহর রহমতে চেয়ে অধিক নয়।[১]

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ করুন। যাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে জীবনযাপন করেছেন, তারা কেমন ছিলেন?

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথাই ধরুন না! তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য বের হয়েছিলেন!

ইকরামার কথা মনে করুন! মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করেছিলেন!

খালিদ ইবনে ওয়ালিদের কথা! উহুদের দিন তিনি মুসলমানদের বিজয়কে এক প্রকার পরাজয়ে পর্যবসিত করেছিলেন!

এবার আল্লাহর রহমতের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পৃথিবীকে ইনসাফ এবং রহমত দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন। ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ারমুকের যুদ্ধে ডান বাহুর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শহিদ হয়েছেন। 'আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারি' উপাধিতে ভূষিত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মাধ্যমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রোম ও পারসিকদের শায়েস্তা করেছেন।

মানুষের স্বভাব খনিজ পদার্থের মতো। জাহেলি যুগে যারা উত্তম ছিলেন ইসলাম আসার পরও দ্বীনের বুঝ গ্রহণের মাধ্যমে তারা উত্তমই থেকেছেন।

বর্তমান যুগেও আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে শুনতে পাই। দেখতে পাই যে, তারা একসময় ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলেন। কিন্তু তাওবা করে এখন ইসলামের

---

[১] বলা বাহুল্য এগুলো জঘন্যতম অপরাধ। কুরআন-হাদিসে এসবের ব্যাপারে মারাত্মক আযাবের হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। হাদিসে উল্লিখিত ঘটনাটি যেহেতু আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া সংক্রান্ত এ জন্য লেখক এসব গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের আল্লাহর রহমতের আশার আলো দেখাচ্ছেন। এ জঘন্যতম গুনাহগুলোর সরলীকরণ করা আদৌ এখানে উদ্দেশ্য নয়।— অনুবাদক

সবচেয়ে বড় রক্ষকে পরিণত হয়েছেন।

যদি আপনি পাপাচারের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে থাকেন তাহলে জেনে রাখুন, আনুগত্যের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করার দরজা সবসময়ের জন্য খোলা রয়েছে।

চতুর্থ পাঠ

আপনি মানুষ এবং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেন না।

বহু মানুষ এমন রয়েছে যাদেরকে হাত ধরে আল্লাহ তাআলার পথে নিয়ে আসতে হয়।

তাহলে কেন আপনি এসব মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছেন? পাপাচারীদের কাছে আল্লাহর আযাবের পূর্বে তার রহমতের কথা আলোচনা করুন। তার প্রতিশোধগ্রহণের গুণের পূর্বে তার ইনসাফ এবং ক্ষমাশীল গুণের আলোচনা করুন। জান্নাতে সকলেরই সংকুলান হবে! আপনি নিজের স্থানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেন না। পাপাচারীদের সঙ্গে সদয় আচরণ করুন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাতিল ধর্মের ওপর এক পাদ্রীকে রাত্রি-জাগরণ করতে দেখে ক্রন্দন শুরু করেন।

জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আমিরুল মুমিনিন! কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে?'

তিনি বলেন, 'ক্লিষ্ট ক্লান্ত এক ব্যক্তি, যে পরিশ্রম করা সত্ত্বেও জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে!'অন্য ধর্মের মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করাটা উমরের কাছে আনন্দদায়ক ছিল না। তাহলে কি ইসলাম ধর্মের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করাটা তার কাছে আনন্দদায়ক হতে পারে?

এক ইহুদি মৃত্যু শয্যায় কাতরাচ্ছিল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে মুহূর্তে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তিনি বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।' [১]

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হলো সে, যে আল্লাহর বান্দাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ১৩৫৬

গুনাহ মানুষজনকে পরিবেষ্টন করে আছে, শয়তান তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে এটাই কি যথেষ্ট নয়, তবুও আমরা কেন তাদের ওপর চেপে বসতে যাব!রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একটি মাত্র আয়াত তিলাওয়াত করতে করতেই সারাটি রাত কাটিয়ে দেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

> *'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।'*[১]

এরপর আল্লাহ তাকে এই সংবাদ দিয়েছেন—'অবশ্যই আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করব।'[২]

এই রহমতকে সবসময় আমাদের নজরে রাখা আবশ্যক। আমরা তো গুনাহকে অপছন্দ করি, গুনাহগারকে নয়।

হাদিসে এসেছে, এক নবীকে তার সম্প্রদায় প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। এরপর তিনি চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন। তারা তো জানে না।'[৩]

পঞ্চম পাঠ

মৃত্যু হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে যায়।

আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটি রাস্তায়ই মারা গেল। সে ভাবতেও পারেনি যে, চলতে চলতে তার মৃত্যু চলে আসবে। কিন্তু এই মৃত্যু কত সুমিষ্ট আর এই রাস্তা কত চমৎকার! আল্লাহর রাস্তায় তার মৃত্যু হলো...

আপনি জীবনটাকে আল্লাহর পথের সফর বানিয়ে নিন। তাহলে যখনই মৃত্যু আসুক এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনার আশপাশে তাকিয়ে দেখুন! কত শস্য ও ফসলাদি রয়েছে, মালিকেরা তা কাটতে পারেনি। কত বাড়ি নির্মিত হয়েছে, বাড়িওয়ালা তাতে থাকতে পারেনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কত সিট রয়েছে

[১] সুরা মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ১১৮
[২] সুনানে নাসায়ি, হাদিস-ক্রম : ১০১;, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস-ক্রম : ১৩৫০
[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪৭৭

ছাত্ররা সেখান থেকে বের হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। কত শিশুকে দাফন করা হলো! কত বালকের জানাজা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হলো! পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দরী কত যুবতী রয়েছে, তাদেরকে বাসরঘরে নয়, বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কবরে।

আপনি এটা বলবেন না যে, আগামীকাল আমি তাওবা করব। আগামীকালটি আপনার কাছে নাও আসতে পারে। এ পর্যন্ত যারা মারা গেছে তারা প্রত্যেকেই ধারণা করত যে, এই সময়টিতে তারা মারা যাবে না।

ষষ্ঠ পাঠ

নিয়তই আমল কবুলের ভিত্তিমূল।

আমরা আমল না করলেও শুধু নিয়তই আমাদের মর্যাদা উঁচু করে দিতে পারে।

মুসা আলাইহিস সালাম-এর সমকালে বনি ইসরাইলে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। মুসা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, এক দরিদ্র ব্যক্তি বলছে—'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি জানেন, যদি আমার এই পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ হতো তাহলে আমি তা আপনার বান্দাদেরকে দান করে দিতাম।' আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম-কে বলেন, 'তুমি আমার বান্দাকে বলো আমি তার সাদাকাহ কবুল করেছি।'

পক্ষান্তরে আমল করা সত্ত্বেও নিয়ত আমাদেরকে নিচে নামিয়ে দিতে পারে।

মুনাফিকদের সরদার ইবনে সালুলের কথাই ধরুন না! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে ফজরের নামাজ পড়ছে। অথচ সে জাহান্নামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে।

আপনার নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন, আপনার আমল ঠিক হয়ে যাবে।

আপনি সেই ব্যক্তির মতো হবেন না যে সমুদ্রে গম চাষাবাদ করে। তার এ চাষাবাদ নিছক পণ্ডশ্রম বৈ কিছু নয়। এতে সে কোনো সওয়াব (ফসল) পায় না।

গুহায় আটকে-পড়া তিন ব্যক্তি

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بِهَا، لَعَلَّ اللهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ، حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ، فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً، فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي

حَقِّي، قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا، فَخُذْهَا فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِئُ بِي فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ مَا بَقِيَ»

'একবার (পুর্ববর্তী যুগের) তিন লোক পদব্রজে চলছিল। চলন্ত অবস্থায় ঝড়-বৃষ্টি নেমে গেল। তখন তারা একটি পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিল। ইতিমধ্যে পাহাড় থেকে একটি পাথরখণ্ড খসে পড়ে তাদের গর্তে মুখ ঢেকে দিল। ফলে গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সে মুহূর্তে তারা পরস্পরকে বলতে লাগল, "নিজ নিজ সৎ আমলের প্রতি খেয়াল করো যা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছ এবং সে সৎকর্মকে ওসিলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকো। এমন হতে পারে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ মহাবিপদ থেকে (পাথরটি সরিয়ে) নিষ্কৃতি দান করবেন।"

'তখন তাদের একজন বলল, "হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। আমার এক স্ত্রী ও ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি ছিল। আমি তাদের (জীবিকার) জন্য মেষ-বকরি মাঠে চরাতাম। (সন্ধ্যায়) ঘরে ফিরে এসে তাদের জন্য আমি সেগুলোর দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের পূর্বে প্রথমেই পিতা-মাতাকে পান করাতাম। একদিন একটি গাছের সন্ধানে অনেক দূরে যেতে হলো, ফলে আমার ঘরে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। (ফিরে এসে) আমি তাদের (পিতা-মাতা) দুজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাই। আমি আগের মতই দুধ দোহন করি এবং তা নিয়ে পিতা-মাতার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। ভাবি, তাদের ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না। এদিকে তাদেরকে পান না করিয়ে সন্তানদেরকে পান করানোটাও পছন্দ করছিলাম না। কিন্তু সন্তানেরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার দুপায়ের কাছে কাতরাচ্ছিল। তাদের ও আমার এ অবস্থা চলতে থাকল। এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল। যদি আপনি মনে করেন যে, আমি এ কাজ আপনার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে করেছি, তাহলে আমাদের জন্য (গর্তের মুখ) কিছুটা

ফাঁকা করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই।" আল্লাহ তাআলা তার এই দুআয় একটু ফাঁকা করে দিলেন। ফলে তারা আকাশ দেখতে পেল।

'দ্বিতীয়জন বলল, "হে আল্লাহ! আমার আমার কাহিনি হলো, এক চাচাতো বোন ছিল আমার। কোনো পুরুষ কোনো নারীকে যেভাবে ভালোবাসে, আমি তাকে তারচেয়েও বেশি ভালবাসতাম। একদিন (যৌন তিয়াস মেটানোর জন্য) তাকে একান্তে কাছে পেতে চাইলাম, কিন্তু সে প্রথমে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। পরে ১০০ দিনারের রাজি হলো। অতঃপর আমি কষ্ট করে ১০০ দিনার জমা করলাম। তারপর সেগুলো নিয়ে তার কাছে আসলাম। যখন আমি তার দুপায়ের মধ্যখানে বসলাম, এমন সময় সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় করো। বিয়ে-বহির্ভূতভাবে সতিত্ব নষ্ট করো না। এ কথা শুনে আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম। আপনি যদি মনে করেন, কেবল আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই আমি এ কাজ করেছি তবে আমাদের জন্য একটু ফাঁকা করে দিন।" আল্লাহ তাআলা তখন তাদের জন্য আরেকটু ফাঁকা করে দিলেন।

'তৃতীয়জন বলল, "হে আল্লাহ! আমি এক 'ফারাক' (প্রায় সাত কিলোগ্রাম সমপরিমাণ) শস্যের বিনিময়ে একজন মজদুর নিযুক্ত করেছিলাম। সে তার কাজ শেষ করে বলল, আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দিন। আমি এক ফারাক (শস্য) তার সামনে পেশ করলাম। কিন্তু সে তা না নিয়ে চলে গেল। আমি সে শস্য জমিনে চাষ করতে থাকলাম। শেষ অবধি তা দিয়ে গরু-বকরি ও রাখাল সংগ্রহ করলাম। অনেকদিন পর সে আমার কাছে এল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় করো। আর আমার পাওনা আদায় করতে আমার ওপর অবিচার করো না। আমি বললাম, তুমি এ (সমস্ত) গরু ও রাখাল নিয়ে যাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় করো, আমার সঙ্গে উপহাস করো না। আমি বললাম, সত্যিই আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করছি না। এ গরু ও রাখাল নিয়ে যাও। অতঃপর সে তা নিয়ে চলে গেল। আপনি যদি জানেন, এ কাজটি কেবল আপনার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তেই করেছি

তাহলে অবশিষ্টাংশও ফাঁকা করে দিন।" আল্লাহ তাআলা তখন গুহার মুখের বাকি অংশটুকু ফাঁকা করে দিলেন।'[১]

প্রথম পাঠ

ঘটনাটির স্থান কাল ব্যক্তি—কিছুই পরিচিত নয়।

এর কারণ হলো ঘটনার বিবরণ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং চিন্তা-চেতনা আমল-আখলাক সংশোধনই এর মূল উদ্দেশ্য।

কুরআন ও হাদিসের সকল ঘটনার ক্ষেত্রেই বিষয়টি প্রযোজ্য। কুরআন আমাদেরকে আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্রের আলোচনা করতে গিয়ে তাদের নাম বলেনি। আমরা পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস থেকে তা জানতে পেরেছি। তারা হাবিল কাবিল হোন বা আহমদ খালেদ হোন এতে কিছুই আসে-যায় না। এই দুজনের ব্যক্তিত্ব আমাদের কীসের জানান দেয়? একজন হলো হিংসুক, লোভী, আল্লাহ তাআলার বিধান পরিত্যাগকারী এবং ভাইয়ের হন্তারক। অপরজন মুমিন, মুত্তাকি ও অত্যন্ত পরহেজগার। ভাই তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও তিনি ভাইকে হত্যার জন্য হাত প্রসারিত করেননি।

কুরআন যখন আমাদের কাছে ফিরআউনের বংশের মুমিন ব্যক্তির কথা আলোচনা করেছে তখনও তার নাম বলেনি। কেননা উল্লিখিত অবস্থাটিই শিক্ষণীয়। আবার যখন কুরআন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর পবিত্রতার ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা সম্পর্কে আলোচনা করেছে তখন তাকে শুধু 'জুলাইখার পরিবার থেকে একজন সাক্ষ্য দিল' বলে উল্লেখ করেছে। আর হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি থেকে আমরা তার পরিচয় জানতে পেরেছি। কেননা তার বিস্তারিত পরিচয় প্রদান সাধারণ এক বিষয় আর তার অবস্থা হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবীদের সাহায্যের জন্য যে ব্যক্তি শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসেছিলেন, সুরা ইয়াসিনে তাকে 'একজন লোক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ব্যক্তির চেয়ে অবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন যখন আমাদের কাছে নমরুদের কথা আলোচনা করেছে তখন তার নাম উল্লেখ করেনি। কেননা অবাধ্যতার অবস্থা জানাটাই গুরুত্বপূর্ণ। অবাধ্য ব্যক্তির পরিচয় নয়। তেমনিভাবে কুরআন যখন আমাদের কাছে ইসমাইল যাবিহুল্লাহ'র কথা আলোচনা করেছে তখন তার নাম উল্লেখ করেনি। কেননা

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৩৩৩, সহিহ মুসলিম ২৭৪৩

এখানে পুণ্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআন-হাদিসে ঘটনার ক্ষেত্রে কেবল ব্যক্তির অবস্থান তুলে ধরার জন্যই তার নাম বলা হয়ে থাকে। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমকালের রুগ্ন সমাজ এবং সে-সমাজে একজন মুমিনের দৃঢ়তা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার জন্যই নাম উল্লেখ করা হয়েছে; ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ব্যক্তিগত জীবনী কিংবা পূর্বকার জাতির ইতিহাস টানার জন্য নয়; যদিও ঘটনার ফাঁকে এ বিষয়টিও জানা হয়ে যায়। কুরআন আমাদের কাছে নুহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন সম্পর্কে আলোচনা করেছে। কুরআন এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়েছে, মানুষ কীভাবে জীবজন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে! মাত্র একটি ডাকেই জীবজন্তুরা জাহাজে উঠে গেল। কিন্তু টানা সাড়ে নয়শত বছর ডাকাডাকি সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ জাহাজে উঠল!

কুরআন এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই সংবাদ দিতে চেয়েছে, আল্লাহর পথের দাঈরা কখনো ক্লান্ত হন না। কেননা তারা ফলাফলের দিকে তাকান না। সবসময় আল্লাহর পথে চলাটাই হলো মুখ্য বিষয়।

কুরআন আমাদের কাছে ফিরআউনের সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটিত অবস্থাদি নিয়ে আলোচনা করেছে। এর মাধ্যমে আমাদেরকে সংবাদ দিতে চেয়েছে যে, অত্যাচারী ও অবাধ্যদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ তাআলার ফায়সালা কার্যকরী। ফিরআউন মুসা আলাইহিস সালাম-এর খুঁজে হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করেছে, কিন্তু যখন মুসা এসেছেন তখন তাকে নিজ প্রাসাদে লালন-পালন করেছে!

আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমাদেরকে সংবাদ দিতে চেয়েছেন যে, উপায়-উপকরণ মানুষের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কোনো লাঠি তো কখনো সমুদ্র বিদীর্ণ করতে পারে না। কিন্তু যখন আল্লাহ চান তখন ঠিকই লাঠির আঘাতে সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে যায়।

এই কারণে প্রত্যেক ঘটনায় প্রত্যেক অবস্থায় আপনাকে কাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে; কর্তাকে নিয়ে নয়। আপনি জীবন নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝতে পারবেন, হক-বাতিলের মধ্যে যুগে যুগে একই যুদ্ধ চলমান ছিল এবং আছে। শুধু যোদ্ধার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রত্যেক যুগের অবাধ্য ব্যক্তিটি সেই

ফিরআউন আর নমরুদের মতোই। প্রত্যেক যুগের দাঈ সেই ইবরাহিম আর মুসার মতোই।

বাতিলের সকল বাহিনী তো সেই আবরাহা আর বদর-দিবসের কুরাইশ বাহিনীই। পক্ষান্তরে দ্বীনের জন্য কুরবান প্রতিটি বাহিনী তো ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের বাহিনী।

দ্বিতীয় পাঠ

আপনাকে আল্লাহর নামে স্মরণ করানো হলে ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠুন। সম্মানে আঘাত লেগেছে বলে অধিক পরিমাণে গুনাহে প্রবৃত্ত হবেন না। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তা নিয়ে অহংকার করাটা কখনো কখনো গুনাহের চেয়েও বড় গুনাহ হয়ে থাকে।

লক্ষ করে দেখুন, আদম ও ইবলিস—উভয়েই তাদের রবের অবাধ্যতা করেছেন। ইবলিস সাময়িক সময়ের জন্য আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে; আদম আলাইহিস সালাম-কে সিজদাহর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছে।

আদম আলাইহিস সালাম সামান্য সময় রবের অবাধ্যতা করেছেন; নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছেন।

বাহ্যিকভাবে উভয়ের অবাধ্যতা একইরকম হলেও পরিণাম কিন্তু সমান হয়নি। ইবলিসকে যখন তিরস্কার করা হয়েছে তখন সে অহংকার করেছে। আদম আলাইহিস সালাম-কে যখন তিরস্কার করা হয়েছে তখন তিনি ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছেন।

অহংকারী আর ক্ষমা প্রার্থনাকারীর মধ্যে কত বিশাল ব্যবধান!আল্লাহর নাম স্মরণ করানো হলে কখনো অবাধ্যতা করবেন না। কেননা উদাসীনভাবে গুনাহ করার তুলনায় হটকারিতার মাধ্যমে গুনাহ করাটা অনেক বেশি জঘন্য।

যখন আপনি কোনো কথা বলে নিকটভাজন কাউকে রাগিয়ে দেন আর সে-ক্ষেত্রে কেউ যদি আপনাকে আপনার অপরাধ ধরিয়ে দেয়, তাহলে ভুলে মন্দ কথা বলা এবং ভুলে অহংকার করা—এ দুটি ভুল একত্রিত করবেন না।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে কেউ যদি আপনাকে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ এবং

অহংকারের গুনাহকে একত্রিত করবেন না।

আল্লাহর হক সংক্রান্ত কোনো গুনাহ করে ফেললে—যেমন নামাজ-রোজা ছেড়ে দেওয়ার পর আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে—অহংকার করবেন না।

আল্লাহ তাআলা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার ব্যাপারে বলেছেন, 'সে পশ্চাদপসরণ করল এবং অহংকার করল।'

গুনাহ করার পর অনুশোচনাবোধ তৈরি হওয়াটা আল্লাহর কাছে সেই আনুগত্য থেকে উত্তম হতে পারে যা আপনার মধ্যে অহমিকা তৈরি করে। এটা গুনাহ করার পরের কথা। গুনাহ করার পূর্বে কোনো ধরনের ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা এতে আল্লাহর ওপর দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা হয়।

যদি গচ্ছিত ধনসম্পদ আত্মসাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এরপর যদি আপনাকে আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনি ভীত হয়ে পড়ুন।

কেননা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরও যা করা হয়ে থাকে তা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম গুনাহ। কেননা এতে চ্যালেঞ্জের মতো বিষয় চলে আসে।

স্মরণ রাখুন হকের সামনে বড়রাও ছোট।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথাই ধরুন না! তিনি বিশাল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে শাসন করতেন। একবার মোহরের ক্ষেত্রে মানুষের বাড়াবাড়ি দেখে মিম্বরে আরোহণ করেন। মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে চান।

তখন শিফা বিনতে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা দাঁড়িয়ে বলেন, আপনার এটা করার অধিকার নেই।

আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন—

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

> *'তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ কোরো না।'*[১]

[১] সুরা নিসা, ৪: ২০

আল্লাহ তাআলার এ ঘোষণা সত্ত্বেও আপনি কোন অধিকার-বলে মোহর নির্ধারিত করে দেবেন?

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এই নারী সঠিক বলেছেন আর উমর ভুল করেছে।' তিনি খলিফা হওয়া সত্ত্বেও জনসম্মুখে হক মেনে নিতে সংকোচবোধ করেননি। তাহলে আমাদের কী হলো—কেউ আমাদের উপদেশ দিলে আমরা সে ক্ষেত্রে হক পরিত্যাগ করে ফেলি!

আমাদের আলোচ্য ঘটনার বীরপুরুষ তার চাচাতো বোনকে অত্যন্ত ভালোবাসত। একজন পুরুষ একজন নারীকে যে পরিমাণ ভালোবাসতে পারে সে তেমনি বাসত। তাকে পাবার জন্য নিজের ধন-সম্পদ আর সময় ব্যয় করেছে। সামনে যাওয়ার পর তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহকে ভয় করো, অন্যায়ভাবে সতিত্ব নষ্ট করো না।' লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়েছে। অথচ মেয়েটি তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়তমা নারী ছিল।

তৃতীয় পাঠ

মানুষের হক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন।

আল্লাহ নিজের হক ক্ষমা করে থাকেন কিন্তু মানুষের হকের ক্ষেত্রে তিনি কোনো ছাড় দেন না। শহিদের রক্তের ফোঁটা জমিনে পড়ামাত্রই তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, কিন্তু ঋণ ক্ষমা করা হয় না। কেননা ঋণ হলো মানুষের হক।

হারাম দ্বারা যে গোশত তৈরি হয় জাহান্নাম তার উপযুক্ত স্থান।

হাদিসে এসেছে, 'আমি তো একজন মানুষ। তোমরা আমার কাছে বিচার নিয়ে আসো। হতে পারে তোমাদের কেউ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অপরের তুলনায় পটু। তখন আমি যা শুনি সে অনুযায়ী ফায়সালা করে দিই। আমি যদি কারও জন্য তার ভাইয়ের কোনো হকের ফায়সালা করে দিই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে। আমি এর মাধ্যমে তার জন্য জাহান্নামের অংশের ফায়সালা করে দিই।' [১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফায়সালা করলেও যখন অন্যের হক হালাল

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস-ক্রম : ১৮৯০

হয়ে যায় না,

তখন মানুষের প্রতিষ্ঠিত আদালতের কথা চিন্তা করুন! আদালত এ ধরনের ফায়সালা করলে বিষয়টা কেমন হতে পারে? দুনিয়ার সকল আদালত ফায়সালা করলেও সেটা আপনার জন্য বৈধ নয় বরং হারাম।

স্মরণ করুন, আখেরাতে এমন বিচার হবে, যেখানে সকলের হৃত হক ও অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে কোনো দিনার, দিরহাম (টাকা-পয়সা) থাকবে না। হিসাব মেটানো হবে পুণ্য-কাজ এবং আমল দ্বারা। অথচ আমরা তখন এসবের প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকব।

আইন-কানুন তৈরি করে দুর্বলদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। কেউ সরল-সোজা হলেই তার সম্পদ চুরি করা হালাল হয়ে যায় না। যার থেকে চুরি করা হলো সে সরল-সোজা নাকি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং চুরি সর্বাবস্থায়ই হারাম।

বর্তমান যুগে মানুষজন লোক-দেখানোর ফ্যাশনে নিপতিত হয়ে গেছে। কেউ হোটেল-বয়কে হাজার টাকা বখশিশ দিতে পারে কিন্তু আপন কর্মচারীকে বেতন দিতে পারে না; উল্টো তা কেটে নেয়। অথচ ওই বেতন ভালো মানের কোনো রেস্টুরেন্টের এককাপ চায়ের দামের সমপরিমাণও নয়!

প্রকৃত বদান্যতা হলো আপনার ওপর মানুষের যে অধিকার রয়েছে তা আদায় করে দেওয়া। পরিচারক/পরিচারিকা থেকে চুরি করে কাউকে হাদিয়া-বখশিশ দেওয়াটা বদান্যতা নয়।

অন্যের অধিকার প্রদান করাটাই হলো প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য। বন্ধুদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চলাফেরা করা এবং চমৎকার সুগন্ধি মাখা সৌন্দর্য নয়। হায় আফসোস! লোকেরা এখন সৌন্দর্য বলতে শুধু পোশাক-আশাককেই বুঝে থাকে। তাদের রুহ ও অন্তরের দিকে তাকালে দেখা যাবে তা পচা এবং দুর্গন্ধময়।

আমাদের আলোচ্য ঘটনায় লক্ষ করুন, শ্রমিক তার মজুরি না নিয়েই চলে গেছে। মালিক তা দিয়ে চাষাবাদ করেছে; তার প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এরপর শ্রমিক যখন ফিরে এসেছে তখন তাকে সব দিয়ে দিয়েছে। অথচ আমরা সাধারণ মানুষ এবং হতদরিদ্রদের বেতনই দিতে চাই না।

এই সামান্য বেতন চুরি করে আমাদের কোনো লাভও হবে না আর তা দিয়ে

দিলেও আমরা ফকির হয়ে যাব না।

আপনি ধন-সম্পদের গোলাম হয়ে যাবেন না। গোলামরা শক্তি খাটানো ব্যতীত অধিকার প্রদান করে না। স্বাধীন মানুষের মতো হোন। তাদের কাছে কেউ না চাইলেও তারা স্বেচ্ছায় অন্যের অধিকার প্রদান করে থাকে।

চতুর্থ পাঠ

দুআ মুমিনের অস্ত্র। একে তুচ্ছ ভাববেন না।

হাদিসে এসেছে, একমাত্র দুআই তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারে।[১]

আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়ার সর্বশেষ দরজাই হলো দুআ। রিজিক, সুস্থতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী এবং সার্বিক সাহায্য কবে থেকে মানুষের হাতে চলে এল! সবই তো আল্লাহর হাতে। মানুষ তো কেবল উপকরণ মাত্র। আমাদের কী হলো যে আমরা উপকরণ নিয়েই পড়ে থাকি আর উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাকে পরিত্যাগ করে ফেলি!উপকরণ গ্রহণ করাটা শরিয়তসম্মত, বরং আবশ্যকীয় এক বিষয়। কিন্তু উপকরণকে নিশ্চিত ভাববেন না। ওষধ সুস্থতার মাধ্যম কিন্তু সুস্থতা প্রদানকারী হলেন আল্লাহ। কাজকর্ম করাটা রিজিকের মাধ্যম কিন্তু রিজিকদাতা হলেন আল্লাহ। বিয়ে সন্তান লাভের মাধ্যম কিন্তু সন্তানদাতা হলেন আল্লাহ।

কত মানুষ চিকিৎসা গ্রহণ করেছে কিন্তু সুস্থ হয়নি! কত মানুষ কাজকর্ম করে থাকে কিন্তু প্রাচুর্য লাভ করতে পারেনি! কত মানুষ বিয়ে করল কিন্তু তাদের সন্তান হয়নি!

আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেন যে, তার কাছে যেন চাওয়া হয়। আর মানুষ পছন্দ করে, যেন তাকে দেওয়া হয়। অতএব আপনার যা পছন্দ তা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করুন। আর আল্লাহর যা পছন্দ আপনি তাকে সেটা প্রদান করুন।

আল্লাহ আপনাকে উপকরণ-নির্ভর পেলে তিনি আপনাকে উপকরণের হাতেই ছেড়ে দেবেন।

পক্ষান্তরে আপনাকে তার ওপর নির্ভরশীল দেখলে তিনি আপনার জন্য উপকরণের ব্যবস্থা করে দেবেন। মানুষকে আপনার অধীনস্থ করে দেবেন।

[১] আল জামিউস সাগীর, হাদিস-ক্রম : ৪২৪৫

আদম আলাইহিস সালাম এবং তার স্ত্রীর কথাই ধরুন না! ভুল করে অনুতপ্ত হয়ে তারা আল্লাহকে ডাকছেন—

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> *'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।'*[১]

তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

নুহ আলাইহিস সালাম যখন তার কওমের কারণে সংকীর্ণতা অনুভব করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

> *'হে আমার রব, আপনি পৃথিবীতে কোনো কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দেবেন না।'*[২]

তার এই দুআয় প্লাবন নেমে আসে।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন নিজ পরিবারকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করলেন, তখন দুআ করেছেন—

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

> *'আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন।'*[৩]

তার এই দুআর ফলে যুগে যুগে মক্কা সকল মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে রয়েছে।

লুত আলাইহিস সালাম! যখন তার ভূখণ্ড তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে আসে তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন—

رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

[১] সুরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ২৩
[২] সুরা নূহ, আয়াত-ক্রম : ২৬
[৩] সুরা ইবরাহিম, আয়াত-ক্রম : ৩৭

> *'হে আমার রব, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।'*[১]

জিবরাইল আলাইহিস সালাম তখন সে এলাকাটিকে ডানায় করে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যান। এমনকি তা আকাশের এত কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল যে, ফেরেশতারা পর্যন্ত কুকুরের ঘেউঘেউ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন। এরপর তিনি এটাকে সম্পূর্ণ উল্টো করে ফেলে দেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম! তার সামনে যখন সকল দরজা বন্ধ হয়ে গেল তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন—

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

> *'যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার ওপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।'*[২]

এরপর তিনি মিশরের বাদশাহ হয়ে গেছেন!

মুসা আলাইহিস সালাম-এর কাঁধে এক দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সে কারণে বোঝা অনুভব করতে থাকেন। তাই তিনি দুআ করেন—

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي

> *'হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন; যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। আমার ভাই হারুনকে।'*[৩]

সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা সংবাদ পাঠালেন—

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ

---

[১] সুরা আনকাবূত, ২৯: ৩০
[২] সুরা ইউসুফ, ১২: ৩৩
[৩] সুরা ত্বহা, ২০: ২৫-৩০

> *'হে মুসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো।'*[১]

সুলাইমান আলাইহিস সালাম! তিনি যখন জানতে পারলেন একজন ন্যায়-পরায়ণ শাসক অনেক উত্তম, আল্লাহর কাছে দুআ করলেন—

وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

> *'আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।'*[২]

এই দুআর পর আল্লাহ তাআলা তাকে জিন জাতির ওপরও রাজত্ব দান করেন।

ইউনুস আলাইহিস সালাম! সমুদ্র, রাত্রি, মাছের পেট—এই তিন অন্ধকারের ভেতর থেকে আল্লাহ তাআলাকে ডাক দিলেন—

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> *'আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সমস্ত পবিত্রতা আপনার, আমিই অন্যায়কারী।'*[৩]

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর পিতা হওয়ার আগ্রহ তৈরি হলো। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন—

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

> *'হে আমার রব! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।'*[৪]

তিনি মেহরাবে নামাজ পড়ছিলেন, ফেরেশতারা তাকে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর সুসংবাদ প্রদান করলেন।

দুনিয়া হলো এক যুদ্ধক্ষেত্র আর দুআ হলো মুমিনের অস্ত্র। বুদ্ধিমান যোদ্ধা কখনো অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে নামে না।

---

[১] সুরা ত্বহা, ২০: ৩৬
[২] সুরা ছ-দ, ৩৮: ৩৫
[৩] সুরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ৮৭
[৪] সুরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৩৮

পঞ্চম পাঠ

বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত হলো—মানুষ কল্যাণকর কাজ না করলেও শুধু তা করার ইচ্ছা পোষণ করলেই আমলনামায় পূর্ণ একটি সওয়াব লিখে দেওয়া হয়। কাজটি করলে ১০টি সওয়াব লেখা হয়।

তেমনিভাবে যখন সে কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছা করে কিন্তু তা আর না করে তখন তার আমলনামায় একটি পূর্ণ সওয়াব লেখা হয়।

আলোচ্য ঘটনায় ওই লোকটি ব্যভিচারের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু যখন তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে সে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। এই কারণে সে এ মর্যাদা লাভ করেছে এবং এ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুহার মুখ থেকে বিশাল পাথর সরিয়ে দিয়েছে।

গুনাহ করার সময় যদি স্মরণ হয়ে যায় যে, এটা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা তাহলে বিশ্বাস করুন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন বলেই তিনি আপনাকে গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা যাদের প্রতি ক্রোধান্বিত থাকেন তাদেরকে তিনি উদাসীনতার মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলে দেন। প্রবৃত্তি তাদেরকে যে দিকে নিয়ে যায় তারা শুধু তাই দেখতে পায়। তাই গুনাহ করে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসাকে বিদূরিত করবেন না।

আপনি হারাম কাজের দিকে পা ফেলতে গিয়ে যখন আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠবেন তখন আপনার আমলনামায় হালাল ক্ষেত্রে পা ফেলার সওয়াব লেখা হবে। হারাম কাজে দিনার-দিরহাম ব্যয় করতে গিয়ে আল্লাহর ভয়ে যখন তা থেকে বিরত হয়ে যাবেন আপনার আমলনামায় তখন একটি দিরহাম সাদাকাহ করার সওয়াব লেখা হবে। আল্লাহর ভয়ে বাতিল কথা বলা থেকে বিরত হয়ে গেলে আপনার আমলনামায় একটি হক কথা বলার সওয়াব লেখা হবে।[১]

আহ,আল্লাহর রহমত কত অসীম! জাহান্নামের পথে না চলার সিদ্ধান্তই জান্নাতে পৌঁছার পথে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

[১] সুনানে তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ১৬২৫

ষষ্ঠ পাঠ

সবসময় নেককার লোকদের সংস্পর্শে অবলম্বন করুন।

আসহাবে কাহাফের কুকুরটার কথাই চিন্তা করুন! আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে তাকে উল্লেখ করে তার আলোচনা চিরস্থায়ী করে দিয়েছেন। কারণ সে শুধু কিছু নেককার লোকের সান্নিধ্য অবলম্বন করেছিল। মনে রাখবেন, সাথিসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কুকুর যেন আমাদের তুলনায় বিচক্ষণ না হয়ে যায়!

উল্লিখিত ঘটনায় গুহায় আটকে-পড়া তিন ব্যক্তির প্রতি একটু লক্ষ করুন। যদি তাদের কোনো একজনের কাছে আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার মতো আমল না থাকত,

তাহলে তারা সকলেই গুহায় আটকে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই কিছু নেক আমল ছিল। ফলে সকলেই মুক্তি পেয়ে যায়।

প্রবাদ আছে, সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ।

যে সঙ্গী হাত ধরে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর যে সঙ্গী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় দুজনের মধ্যে কত বিশাল ব্যবধান!

সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর ফায়সালা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى

> *'দুজন নারী ছিল। তাদের সঙ্গে দুটি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গী নারীটি বলল, "তোমার ছেলেটিকেই বাঘে নিয়ে গেছে।" অন্যজন বলল, "না, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়েছে।' অবশেষে তারা উভয়েই দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। দাউদ বয়স্কা নারী পক্ষে রায় দিলেন। বিচারশেষে তারা উভয়ে বেরিয়ে দাউদের পুত্র সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং (যাবার সময়) তারা দুজনেই তাকে ব্যাপারটি জানাল। তিনি লোকদেরকে বললেন, "তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা নিয়ে আসো। আমি ছেলেটিকে দুটুকরো করে তাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিই।" এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা নারীটি বলে উঠল, "তা করবেন না, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, ছেলেটি তারই।" সুলাইমান তখন ছেলেটি সম্পর্কে অল্প বয়স্কা নারীটির পক্ষে রায় দিলেন।'* [১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪২; সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১৭২০

প্রথম পাঠ

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসুলগণের একজনকে অন্যজনের ওপর একেক বিষয়ে প্রাধান্য দান করেছেন।

সাধারণ নবীগণের তুলনায় 'উলুল আযম' তথা কঠিন বিপদাপদে ধৈর্যধারণকারী নবী-রাসুলগণ অধিক মর্যাদাবান। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে কোনো কোনো নবীকে এমন কিছু বিষয় প্রদান করেছেন যা অন্য কোনো নবীকে প্রদান করেননি।

এর মাধ্যমে অবশ্য নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয় না। যেমন মুসা আলাইহিস সালাম-এর তুলনায় তার ভাই হারুন আলাইহিস সালাম বাগ্মী ছিলেন। এ ব্যাপারে মুসা আলাইহিস সালাম নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। কুরআনুল কারিমে সুস্পষ্টভাবেই বিষয়টি বিবৃত হয়েছে।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম-কে এমন রাজত্ব প্রদান করা হয়েছিল যা ইতিপূর্বে কাউকে প্রদান করা হয়নি। আর তার পরেও কাউকে প্রদান করা হবে না। আবার ঈসা আলাইহিস সালাম দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে মর্যাদাবান ছিলেন। তবে তারা উভয়েই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালাম-এর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য তা নরম করেননি। কিন্তু তিনি সকল সৃষ্টির তুলনায় সর্বোত্তম।

নবীদের ব্যাপারে যা বলা হলো তা তাদের পরের স্তরের মানুষদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। যেমন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সামরিক যোগ্যতা দেওয়া হয়েছিল; যা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে (সেভাবে) দেওয়া হয়নি। অথচ কোনো সাহাবিই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সমতুল্য নন। উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারী ছিলেন। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চেয়ে হালাল-হারামে অধিক জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চেয়ে অধিক মর্যাদাবান ছিলেন।

শুধু একটি বিষয়ের মাধ্যমে নয় বরং সামগ্রিক বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয়। উপরোল্লিখিত ঘটনাটি অধ্যায়নের সময় এই বিষয়টি আমাদের মাথায় থাকা উচিত।

দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সিদ্ধান্তকে নিরেট ভুল মনে করা যাবে না। সন্দেহ নেই, তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করেছেন এবং তার সামনে যেসব দলিল-প্রমাণ ছিল এর মাধ্যমেই তিনি ফায়সালা করেছেন।

বয়স্কা নারীটি অল্পবয়স্কা নারীর চেয়ে কথাবার্তায় পটু ছিল। যেহেতু কারও পক্ষেই সুস্পষ্ট দলিল ছিল না এই কারণে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

বিচার-আচারের ক্ষেত্রে সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

আলোচ্য ঘটনাটিই একমাত্র ঘটনা নয়, এ ছাড়া আরও অনেক ঘটনা রয়েছে।

তার পিতা দাউদ আলাইহিস সালাম শস্যক্ষেত্রের ব্যাপারে ফায়সালা করেছিলেন। কুরআন এ ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বিচারকার্যে বিচক্ষণতার কথা উল্লেখ করেছে এভাবে—

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

> *'এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলাইমানকে, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল।'*[১]

ঘটনাটি হলো—রাতের বেলা এক ব্যক্তির ছাগল অপর ব্যক্তির ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল। ছাগল বেশ কিছু ফসল খেয়েছে, বেশ কিছু নষ্ট করেছে। দাউদ আলাইহিস সালাম-এর কাছে এ বিচার আসে। তিনি ফায়সালা করেন, ক্ষেতের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছাগলটি ক্ষেতের মালিককে প্রদান করা হবে। দাউদ আলাইহিস সালাম-এর মজলিস থেকে বের হওয়ার পর সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তিনি উভয়ের বক্তব্য শোনার পর বলেন, 'এটি ফায়সালা

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ৭৮

হতে পারে না। ক্ষেতের মালিক কেবল ছাগলের দুধ দ্বারা উপকৃত হবে। আর যা ক্ষতি হয়েছে ছাগলের মালিক ক্ষেতে কাজ করে সে-ক্ষতি পূরণ করবে।

এভাবে ক্ষেত যখন পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে ক্ষেতের মালিক তখন জমি নিয়ে নেবে আর ছাগলের মালিক তার ছাগল ফিরিয়ে আনবে।'

এ ফায়সালার কারণে সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

> *'অতঃপর আমি সুলাইমানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।'*[১]

এ ক্ষেত্রেও দাউদ আলাইহিস সালাম-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভুলে যাওয়া হয়নি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

> *'এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম।'*[২]

সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বিচক্ষণতার আরেকটি উদাহরণ হলো—এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! এক প্রতিবেশী আমার রাজহাঁস চুরি করে নিয়ে গেছে।' তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম ঘোষণা করেন, الصلوة جامعة। (সকলে নামাজ পড়তে আসো)। এরপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করেন। বলেন, 'তোমাদের কী হলো—তোমাদের একজন প্রতিবেশীর রাজহাঁস চুরি করে মসজিদে প্রবেশ করেছে! তার মাথায় এখনো হাঁসের পশম লেগে আছে।' চোরটি তখন মাথায় হাত বুলাতে লাগল। তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, 'একে ধরো, সেই হাঁস চুরি করেছে।'

শরিয়াহ-আইন সম্পর্কে বিচারকের জ্ঞান থাকতে হবে। কিছু মাসআলা এমন রয়েছে যেখানে ইজতিহাদ এবং চিন্তাভাবনার তুলনায় জ্ঞানের প্রয়োজন অনেক বেশি। কেননা শরিয়ত এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। যেমন পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের বিষয়টি।

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম :৭৯
[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ৭৯

তবে বিচারক কখনোই বিচক্ষণতা ও কৌশল থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারেন না।

আমরা সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বিচারকার্য সম্পর্কে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করলাম। এ ক্ষেত্রগুলোতে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বিধান দেওয়া ছিল না। তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে সমাধান বের করেছেন।

যেহেতু বিচারকার্য এবং বিচক্ষণতা সংক্রান্ত আলোচনা চলে এল তাই প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিচক্ষণতার অধিকারী আরও দুই বিচারকের আলোচনা করা সঙ্গত হবে। তাদের কথা ভুলে গেলে চলবে না।

তারা হলেন ইয়াস ইবনে মুআবিয়া ও কাযী শুরাইহ রহমতুল্লাহি আলাইহিমা।

উভয়েই অত্যন্ত বিচক্ষণ বিচারক ছিলেন। বেশ কিছু বিস্ময়কর বিধান তারা লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইয়াস ইবনে মুআবিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি'র কাজি ছিলেন। তার বুদ্ধিমত্তার ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনুল জাওযি রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন— এক ব্যক্তি গাছের কাছে কিছু সম্পদ লুকিয়ে রাখে। ঐ সময় বন্ধুও তার সঙ্গে ছিল। ব্যক্তিটি পরে এ সম্পদ খুঁজে না পেয়ে বন্ধুকে অভিযুক্ত করে। সে কাজি ইয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি'র কাছে বিচার দায়ের করে। বন্ধু বলল, 'আমি তো এ ধন-সম্পদ সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

ইয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি সে গাছটির কাছে যাও, আশা করি সম্পদ রাখার জায়গাটি তোমার স্মরণ হয়ে যাবে।' আর লোকটির বন্ধুকে বললেন, 'সে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি আমার কাছে বসে থাকো।' এরপর ইয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি অন্যান্য মানুষের বিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। হঠাৎ তিনি বসিয়ে রাখা বিবাদীকে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়? সে কি এতক্ষণে গাছের কাছে পৌঁছতে পেরেছে?' সে বলল, 'না, স্থানটি আরও দূরে।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন! তুমি-না একটু আগেই সেই ধন-সম্পদ এবং গাছ সম্পর্কে কোনো কিছুই না-জানার কথা বলেছিলে!' এরপর তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বিচার নিষ্পত্তি করেন।

তার অপর এক বুদ্ধিমত্তার ঘটনা হলো— একবার তিনি এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তিনজন নারী সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করে। তিনি সঙ্গীদের

বললেন, 'এ নারীটি গর্ভবতী, ঐ নারীটি দুগ্ধদানকারী আর এই নারীটি বন্ধ্যা।' যাচাই করে তার বক্তব্যকে সঠিক পেয়ে সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কীভাবে তা জানতে পারলেন?' তিনি বললেন, 'প্রথম নারীটি হাত পেটে রেখেছিল। দ্বিতীয়জন বুকে হাত রেখেছিল। তৃতীয়জনের হাত ছিল লজ্জাস্থানে। আর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলে মানুষ সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হেফাজতের চেষ্টা করে।'

মদের বৈধতা প্রমাণের জন্য এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, 'আঙুর খেলে কি আপনি আমাকে বেত্রাঘাত করবেন?' তিনি বললেন, 'না।' লোকটি বলল, 'আমি যদি পানি পান করি তাহলে কি বেত্রাঘাত করবেন?' তিনি বললেন, 'না।' এরপর লোকটি বলল, 'তাহলে আমি আঙুরের মধ্যে পানি ঢাললে সেটা যখন মদ হয়ে যায় তখন আমাকে কেন বেত্রাঘাত করবেন?' ইয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, 'আমি যদি তোমাকে বালু নিক্ষেপ করি তাহলে কি তুমি ব্যথা পাবে?' লোকটি বলল, 'না।' এরপর তিনি বললেন, 'যদি আমি তোমাকে পানি নিক্ষেপ করি তাহলে কি ব্যথা পাবে?' লোকটি বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'এখন আমি যদি মাটি ও পানি দ্বারা তৈরি এই পাত্রের মাধ্যমে তোমাকে আঘাত করি তাহলে কি তুমি ব্যথা পাবে?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, কারণ এ পাত্রটি এখন আর পূর্বের সেই পানি আর বালু নয়।' তিনি বললেন, 'তেমনিভাবে মদও পূর্বের আঙুর আর পানি নয়।'

একবার তাকে বলা হলো—'আমরা আপনার তিনটি দোষ দেখতে পাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'সেগুলো কী?' তারা বলল, 'আপনি কুৎসিত। আপনি নিজের কথায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে যান। আর আপনি অতি দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করেন।' তিনি বললেন, 'চেহারা-আকৃতি কুৎসিত হওয়াটা আমার আওতার ভেতরে নয়। আমি নিজের কথায় নিজে মুগ্ধ হই, ঠিক আছে, আচ্ছা, তোমরা কি মুগ্ধ হও না?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।" তিনি বললেন, 'তাহলে তো আমি আরও আগেই মুগ্ধ হতে পারি।' এরপর তিনি বললেন, 'তোমাদের হাতে কয়টি আঙুল রয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গেই তারা বলল, 'পাঁচটি।' তিনি বললেন, 'এখন উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে তোমরা কেন দ্রুততা অবলম্বন করলে?' তারা বলল, 'যে বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে সে বিষয়ে বিলম্ব করতে নেই।' তিনি বললেন, 'আমিও তোমাদের মতোই।'

তিনি সবসময় হকের অনুসরণ করে চলতেন।

তিনি বলেন, বিচারকার্যের ক্ষেত্রে কেউই আমাকে পরাজিত করতে পারেনি শুধু

একজন ছাড়া। আমি একবার বসরার মজলিসে বসা ছিলাম। এক লোক এক মুকাদ্দামা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অমুক বাগান, তার পরিমাণ এমন, সেটি অমুক ব্যক্তির মালিকানাধীন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাগানের গাছ সংখ্যা কত?' লোকটি একটু চুপ থেকে বলল, 'আমাদের কাজি সাহেব কত বছর ধরে এই মজলিসে বিচারকার্য সম্পাদন করেন?' আমি একটি সংখ্যা উল্লেখ করে বললাম, এত বছর যাবত। লোকটি বলল, 'এই ছাদের কতটি খুঁটি রয়েছে। আমি উত্তর দিতে পারলাম না। তাকে বললাম, 'তুমি সত্য বলেছ।' অতঃপর আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করি।

কাজি শুরাইহও আপন যুগের সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সমকালীন ছিলেন। শা'বি রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, কাজি শুরাইহের কাছে এক নারী তার স্বামীর ব্যাপারে নালিশ নিয়ে হাজির হয়। নারীটি তখন কাঁদছিল। আমি শুরাইহকে বললাম, 'হে আবু উমাইয়া (শুরাইহের উপনাম), আমি তো কান্নারত এই মহিলাকে মাজলুম মনে করছি।' তিনি বললেন, 'শাবি! ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা পিতার কাছে কান্না করতে করতেই হাজির হয়েছিল।'

একবার কাজি শুরাইহ বিচারের এজলাসে বসে ছিলেন। এমন সময় আদি ইবনে আরতাত নামক এক ব্যক্তি তার কাছে আসে। শুরাইহ বললেন, 'আপনি কোথায় ছিলেন?' তিনি বললেন, 'আপনার এবং দেয়ালের মধ্যে।' লোকটি বলল, 'আমার কথা শুনুন।' তিনি বললেন, 'এ কারণেই তো আমি এখানে বসে আছি।' সে বলল, 'আমি শামের অধিবাসী।' তিনি বললেন, 'তাহলে তো তুমি আমার নিকটতম ও পছন্দনীয় মানুষ।' লোকটি বলল, 'আমি আমার সম্প্রদায়ের এক নারীকে বিয়ে করেছি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে সন্তান-সন্ততিতে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বরকত দান করুন।'

লোকটি বলল, 'আমি সেখান (শাম) থেকে বের না হওয়ার শর্তে তাকে বিয়ে করেছি।' তিনি বললেন, 'শর্ত পালন করা উচিত।' লোকটি বলল, 'আমি এখন বের হতে চাই।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তায় থাকো।' লোকটি বলল, 'এখন আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন।' তিনি বললেন, 'ফায়সালা তো করে দিয়েছি।' অর্থাৎ এই শর্ত ভঙ্গ হলে যেহেতু সে তালাকের ওয়াদা করেনি, তাই বের হলেও বিয়ে ভাঙবে না।

কাজি শুরাইহ্ এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক বেদুইনের কাছ থেকে ঘোড়া খরিদ করে মূল্য পরিশোধ করে দেন।

তারপর ঘোড়ায় আরোহণ করে কিছু সময় তাতে চলেন। এরপর ঘোড়াটিতে ত্রুটি দেখতে পান। ফিরে এসে বিক্রেতাকে বলেন, 'তোমার ঘোড়া নিয়ে নাও। এটি ত্রুটিপূর্ণ।' লোকটি বলল, 'আমি আপনার কাছে ত্রুটিমুক্ত হিসেবে বিক্রি করেছি। এখন তা ফেরত নিতে পারবে না।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'কাউকে বিচারক বানাও।' লোকটি বলল, 'শুরাইহ্ ইবনে হারেস আল-কিন্দি আমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ঠিক আছে, আমি রাজি।' শুরাইহ্ বেদুইন ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছ থেকে বিষয়টি শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি কি তার কাছ থেকে ত্রুটিমুক্ত ঘোড়া নিয়েছিলেন?' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হ্যাঁ।' শুরাইহ্ বললেন, 'যা ক্রয় করেছেন তা আপনার কাছেই রাখুন কিংবা যেভাবে নিয়েছিলেন সেভাবে ফেরত দিন।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হয়ে শুরাইহের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটাই তো বিচার, চমৎকার ফায়সালা, ন্যায়ানুগ বিচার। তুমি কুফা নগরীতে চলো। আমি তোমাকে কুফার বিচারক নিয়োগ করলাম।'

তৃতীয় পাঠ

একেকজনের বিচার একেকরকম হয়ে থাকে। কারণ, প্রত্যেকের বুদ্ধিমত্তায় ভিন্নতা রয়েছে।

এই কারণে একাধিক ফিকহি মাজহাব তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক ইমাম কুরআন-হাদিসে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটান এবং সেখান থেকে নতুন নতুন মাসআলা উদ্ঘাটন করেন। এ ক্ষেত্রে তাদের ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। কেননা নবীগণই কেবল ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে। এমনকি নবীগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে ফায়সালা করলে তাদেরও মানবিক ভুল হতে পারে। ওহির মাধ্যমে ফায়সালা করলে নিঃসন্দেহে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন। এটি অনেক দীর্ঘ আলোচনার বিষয়।

এ বিষয়ক কিছু কথা পূর্বে গত হয়েছে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে দুইজন সম্মানিত নবী দুটি মাসআলায় নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়েছেন।

সন্তানের ফয়সালা দাউদ আলাইহিস সালাম করেছেন বয়স্কা নারীর জন্য, আর সুলাইমান আলাইহিস সালাম করেছেন অল্পবয়স্কা নারীর জন্য।

দাউদ আলাইহিস সালাম শস্যক্ষেত্রের ব্যাপারে এক ফায়সালা দিয়েছেন, সুলাইমান আলাইহিস সালাম দিয়েছেন ভিন্ন ফায়সালা।

তারা তো নবী!

এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য, তাদের ইজতিহাদ এবং মাজহাব নিয়ে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ নেই। তাদের মতানৈক্য তো রহমত। আল্লাহ তাআলা সকলকে একই আমল করাতে চাইলে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ফায়সালা দিয়ে দিতেন। যেমন মিরাসের ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীর দ্বিগুণ পাবে, এখানে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই।

চোরের হাত কেটে দেওয়া হবে, এ বিধানে ইজতিহাদের সুযোগ নেই। তবে বিধানের প্রকৃতির ক্ষেত্রে ইজতিহাদ হতে পারে।

বহু বিষয় রয়েছে আল্লাহ তাআলা ভুলে নয় বরং রহমত স্বরূপ ইচ্ছা করেই নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

তাই সকল ফিকহি মাজহাবের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

ইমামদের পরস্পর শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ করুন। আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি! তিনি ইমাম শাফেয়ির ছাত্র ছিলেন। তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

কিন্তু এর পাশাপাশি মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে মতানৈক্য করতেন।

তেমনিভাবে ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি'র সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন। কিন্তু তাকে ঠিকই সম্মান জানাতেন।

তাই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা থেকে বিরত থাকা উচিত!

বংশীয় গৌরব

উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَامِ ». قَالَ: «فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ، أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِي أَوِ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ

> *'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমকালে দুই ব্যক্তি বংশ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে একজন বলল, "আমি অমুকের পুত্র অমুক। তুমি কে?"*
>
> *এই প্রেক্ষিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগে দুই ব্যক্তি বংশ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। একজন বলল, "আমি অমুকের পুত্র অমুক।" এভাবে সে ৯ পুরুষের নাম উল্লেখ করল। এরপর বলল, "তুমি কে? তোমার তো কোনো পরিচয়ই নেই!" অপরজন বলল, "আমি অমুকের পুত্র অমুক, যে ইসলামের পুত্র।" আল্লাহ তাআলা তখন মুসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন, "আপনি বংশ নিয়ে বিতর্ক করা এ দুই ব্যক্তিকে বলুন,*
>
> *যে ব্যক্তি নিজের ৯ পুরুষ পর্যন্ত নাম উল্লেখ করেছে তার ৯ পুরুষই জাহান্নামি আর সে হলো জাহান্নামে-যাওয়া দশম পুরুষ।*

আর যে ব্যক্তি নিজের ঊর্ধ্বতন দুই পুরুষের নাম উল্লেখ করেছে সেই দুই পুরুষ জান্নাতি আর সে হলো জান্নাতে-যাওয়া তৃতীয় পুরুষ।"'[১]

প্রথম পাঠ

মানুষের পরিচয় নির্ণিত হয় অন্তর ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে, অর্থ-বিত্ত কিংবা পোষাক-আশাকের মাধ্যমে নয়।

তারা কীভাবে জমিনে চলাচল করছে সেটাই লক্ষণীয় বিষয়, কে কার ঔরস থেকে এল সেটা দেখার বিষয় নয়। বংশের মাধ্যমে যদি কেউ উপকৃত হতো তাহলে হাশেমি বংশের আবু লাহাব উপকৃত হতো। আর বংশের মাধ্যমে কারও ক্ষতি সাধন হলে বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। কেননা তিনি গোলাম ছিলেন। কুরআনুল কারিমে লুকমান হাকিমের কথা এসেছে। তিনিও একজন গোলাম ছিলেন।

বংশ যতই উঁচু হোক, কেউ যেন নিজেকে সে পরিচয়ে প্রকাশ না করে। বংশ যতই নীচু হোক, কেউ যেন এ কারণে কাউকে হেয় না করে। প্রত্যেকে একাকী মৃত্যুবরণ করবে। তাকে একাকী দাফন করা হবে। তার হিসাব হবে একাকী।

নবীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও নুহ আলাইহিস সালাম-এর ছেলের কোনো উপকার হয়নি। মুশরিকের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কোনো ক্ষতি হয়নি। হাদিসে এসেছে, 'হে মুহাম্মদের বেটি ফাতেমা, নিজে আমল করো। কেননা আল্লাহর কাছে আমি তোমার কোনো কাজে আসব না। হে মুহাম্মদের চাচা আব্বাস! আপনি আমল করুন। আল্লাহর কাছে আমি আপনার কোনো কাজে আসব না।'[২]

দ্বিতীয় পাঠ

পিতৃপুরুষ নিয়ে গর্ব করার অধিকার মানুষের আছে। গর্ব ও অহংকারের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। আপনার বংশ কুলীন হলে এমন কাজ করবেন না যাতে আপনার বংশ কলঙ্কিত হয়ে যায়। আবার, বংশ নীচু হলে তার সঙ্গে নীচু মানসিকতার কাজকে মিলিয়ে দেবেন না।

[১] মুসনাদে আহমদ, হাদিস-ক্রম : ২১১৭৮। সনদ সহিহ।
[২] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১/৫৪

বংশ সম্ভ্রান্ত হলে তাতে কখনো নিকৃষ্ট কাজের অনুপ্রবেশ ঘটাবেন না। বংশকে নীচু করার পাশাপাশি নিজেও কাজে কর্মে নীচু হয়ে যাবেন না।

সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিমাস সালাম। নবীর ঔরসে নবী।

তিনি তার রবের কাছে প্রার্থনা করেন—

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

> *'হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে সামর্থ দান করুন যাতে আমি আপনার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে প্রদান করেছেন।'*[১]

পিপীলিকার কথা শুনে তিনি মুচকি হাসেন। হুদহুদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবী শাসন করেছেন। কিন্তু বংশ তাকে অহংকারী বানিয়ে দেয়নি। রাজত্ব তাকে ইবনেষ্ট করে দিতে পারেনি। শুধু মনের প্রশান্তি ও আনন্দ নয় বরং তাদের ঘটনায় অফুরন্ত শিক্ষা রয়েছে।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর কথাই ধরুন না! যাঁর বংশ মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। তার পিতা ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তার পিতা ছিলেন ইসহাক আলাইহিস সালাম। তার পিতা ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। নিজে নবী ছিলেন। পিতা নবী ছিলেন। দাদা নবী ছিলেন। পরদাদাও নবী ছিলেন।

তিনি মিসকিনদের খাবার খাওয়াতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি খাদ্যভাণ্ডার দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও রোজা রাখেন কেন?' তিনি বলেন, 'যেন আমি ক্ষুধার্তদের ভুলে না যাই!'

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ।

সন্তানের কারণে তিনি পিতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না, আবার পিতার কারণে সন্তানকেও জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না।

আলোচ্য হাদিসের বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগাম সংবাদ।

[১] সুরা নামল, ২৭: ১৯

তিনি জানেন, এই অহংকারী বংশ তাকেও জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

এই সকল আয়াত ও ঘটনা অধ্যায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের উত্তম ধারণা রাখা উচিত। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। তার ন্যায়-নিষ্ঠতার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সন্দেহে নিপতিত হওয়ার অবকাশ নেই।আল্লাহ তাআলা পরম দয়ালু। তিনি যদি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তবু তার ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই। মানুষের প্রতিই যখন আমাদেরকে সুধারণা পোষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তখন আল্লাহর বিষয়টি কেমন হতে পারে!মানুষের কাজকর্ম দিয়ে আল্লাহকে তুলনা করা যাবে না। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার কাজকর্ম দিয়ে মানুষকে তুলনা করা যাবে না। তিনি তো এমন রব যিনি আঙুল-পরিমাণও জুলুম করেন না। তিনি তো মানুষ নন, যারা রাগের বশে ভালো মানুষের সঙ্গেও নিকৃষ্ট মানুষের মতো আচরণ করে। বরং অনুগ্রহ বশতঃ তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।

একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তিনি ব্যভিচারিণীকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। যে কখনো কোনো ভালো কাজ করত না কিন্তু লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষকে ছাড় দিত তিনি তাকেও ছাড় দিয়ে দেন। তিনি তো পিতা নেককার হওয়ায় সন্তানকেও সম্মানিত করে থাকেন। নবী মুসা এবং খিজির আলাইহিমাস সালাম-কে দুই বালকের দেওয়াল উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কেবল এই কারণেই তো পাঠিয়েছিলেন যে, তাদের পিতা ছিলেন সৎ। কিন্তু তিনি বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে ভালো ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন না।

চতুর্থ পাঠ

জান্নাত নম্র-ভদ্র ও সহজ-সরল মানুষের ঠিকানা, আর জাহান্নাম অহংকারী ও অবাধ্যদের ঠিকানা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয় এত অধিক ছিল যে, তিনি তার সম্মানার্থে সাহাবিগণকে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন। একবার তার জন্য সাহাবাগণ দাঁড়িয়ে গেলে তিনি রাগান্বিত হয়ে যান। রাগের সময় তার চেহারায় রাগের চিহ্ন ফুটে উঠত। কিন্তু এমতাবস্থায় তিনি কাউকে বকাঝকা বা তিরস্কার করতেন না।

তো, নবীজি ওই সময় রাগান্বিত হওয়ায় হাসসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু

পরিস্থিতিটা একটু স্বাভাবিক করতে চাইলেন। তিনি পঙক্তি আকারে বললেন—

'প্রিয় ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানোটা আমার জন্য ফরজ। ফরজ পরিত্যাগ করা তো আমাদের জন্য শোভা পায় না। যার জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে তাকে দেখে আশ্চর্য হই এমন সৌন্দর্য দেখা সত্ত্বেও সে কীভাবে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারে!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে দেন। তিনি রাগান্বিত হতেন অনেক দেরি করে আর খুশি হয়ে যেতেন খুব দ্রুত। বেদুইনরা তার কাছে এলে ভীত হয়ে যেত। তিনি ভীতি দূর করার জন্য বলতেন, 'শান্ত হও! আমি তো মক্কার এক সাধারণ নারীর সন্তান, যে শুকনো রুটি ও গোশত খেতো।'

একবার তিনি বসে আছেন আর সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনিও তার সঙ্গে হাঁটছেন। জানেন না, আসলে কোথায় হেঁটে চলেছেন! এরপর মেয়েটি তাকে মনিবের কাছে সুপারিশ করতে বলল। কেননা তারা তাকে কোনো এক প্রয়োজনে পাঠিয়েছিল। আসতে বিলম্ব হয়ে গেছে। তিনি মেয়েটির জন্য সুপারিশ করলেন!

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ছোট্ট এক ভাই ছিলেন। নাম আবদুল্লাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে খেলাধুলা করতেন। তিনি তাকে আবু উমায়ের উপাধি দিয়েছিলেন।

আবু উমায়রের একটি ছোট্ট পাখি ছিল। নাম ছিল নুগাইর। উমায়ের নুগাইরের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুদিন পর তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু উমায়ের, তোমার নুগায়ের কোথায় গেল?'

আবু উমায়ের তখন কাঁদতে লাগলেন। কারণ, নুগায়ের মারা গিয়েছিল। নবীজি তখন (সান্ত্বনা দিতে) তার গলা জড়িয়ে ধরলেন।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর আমার মাতা-পিতা যেন কুরবান হন। তিনি খুব সহজেই মানুষের সাথে মিশে যেতেন। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতেন। ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রতি নমনীয় ও সহানুভূতিশীল।

তার সাহাবিদের অবস্থাও এমনই ছিল।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬২০৩

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বিনয় আর নম্রতার দীক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়া সত্ত্বেও এক বৃদ্ধের ঘর পরিষ্কার করতেন। তিনি রাস্তায় হাঁটতেন আর ছোট্ট শিশু তার কাপড় ধরে টেনে বলত, 'আব্বু... আব্বু...'

হকের ক্ষেত্রে উমর অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু প্রজাদের ক্ষেত্রে তার অন্তর ছিল একজন স্নেহপ্রবণ মায়ের মতো।

এক বেদুইন নারী। আল্লাহ ব্যতীত তার আর কোনো সহায় ছিল না। তার সন্তান প্রসবের জন্য উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ স্ত্রীকে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজ পিঠে করে আটার বস্তা বহন করে নিয়ে গেছেন। আর নিজ হাতে এতিম শিশুদের রান্না করে খাইয়েছেন। পারস্যের দূত এসে তার রাজপ্রাসাদ খুঁজতে থাকে। সে কোনো প্রাসাদ বা রাজসিংহাসন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল। দেখতে পেল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক গাছের নিচে ঘুমিয়ে আছেন।

তার নাতি উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ অন্ধকারে মসজিদে যাচ্ছিলেন। তখন এক অসতর্ক ব্যক্তির পায়ের সঙ্গে তার পা লেগে যায়। লোকটি রাগান্বিত হয়ে বলে উঠল, 'আপনি কি অন্ধ?' উমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, 'না।' খলিফার সঙ্গে থাকা লোকজন রাগান্বিত হয়ে যান। উমর ইবনে আবদুল আজিজ বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। সে তো আমাদেরকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছে আর আমরা তার উত্তর দিয়েছি মাত্র।'

এক রাতে তার (কামরার) বাতিটি নিভে যায়। তিনি বাতিতে তেল ঢালার জন্য উঠলেন। লোকজন বলল, 'আমিরুল মুমিনিন! অন্যকে যদি কাজটি করার সুযোগ দিতেন!' তিনি বললেন, 'কাজটি আমি নিজে করলেও যেই উমর ইবনে আবদুল আজিজ ছিলাম সেই উমর ইবনে আবদুল আজিজই থাকব।'

তাদের ঘটনায় বহু শিক্ষা রয়েছে।

দুগ্ধপোষ্য সন্তান

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كَانَتْ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْ شَارَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِيْ مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِيْ مِثْلَ هَذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ وَهَذِهِ الْأَمَةُ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ

> *'বনি ইসরাইলের এক নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার পাশ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। নারীটি দুআ করল, "হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে তার মত বানাও।" শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফেরাল। আর বলল, "হে আল্লাহ! আমাকে তার মতো কোরো না।" অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন্য পান করতে লাগল।' আবু হুরায়রা বলেন, "আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙুল চুষছেন।" অতঃপর সেই নারীর পাশ দিয়ে এক দাসী গেল। নারী বলল, "হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মতো কোরো না।" শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন্য ছেড়ে দিল এবং বলল, "হে আল্লাহ! আমাকে তার মত কোরো।" তার মা বলল, "কেন?" শিশুটি বলল, "সেই আরোহীটি ছিল জালেমদের একজন। আর এ দাসীকে মানুষজন চুরি ও ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার*

পরও সে তাদের কিছুই করেনি।”’[১]

প্রথম পাঠ

কিছু বিষয় এমন রয়েছে, তা যখনই আনা হোক, উপকারী হয়ে থাকে। মনীষীগণ বলেছেন, একেবারে না আসার চেয়ে শেষে আসাটাও ভালো। অবিরাম কয়েকদিন ভারী বর্ষণের চেয়ে বিলম্বে বৃষ্টি আসাটা উপকারী।

ঘটনা নসিহতমূলক হোক বা অন্তরের প্রশান্তি দানকারী হোক, মানুষের কাছে তা প্রিয়। ঘটনা অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। মানুষ মনোযোগ সহযোগে শোনে। কুরআনে যেসব ঘটনা বিবৃত হয়েছে নিঃসন্দেহে সেগুলো সংঘটিত হয়েছে। যদিও তা সাধারণ রীতিবিরুদ্ধ হোক।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি পুড়ে যাননি। মুসা আলাইহিস সালাম লাঠির আঘাতে সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলেন। ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর পাখির সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং জিনদের শাসন করাটা বাস্তব বিষয়। নুহ আলাইহিস সালাম কিশতি বানিয়েছিলেন। পাহাড়ের মতো উঁচু ঢেউয়ে তাতে আরোহণ করেছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসমাইল আলাইহিস সালাম-কে দুম্বার মাধ্যমে জবাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। অতি আশ্চর্যজনক হবার কারণে কুরআন ও হাদিসে এসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি।

তেমনিভাবে আমরা এ সকল ঘটনা বর্ণনাকারী এবং যাঁদের থেকে বর্ণিত হয়েছে তাদের সত্যতার ব্যাপারেও বিশ্বাস রাখি।

আমরা বিস্ময়কর এই ঘটনাগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখি কারণ, সবকিছুর আগে আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তাই আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যেসব সংবাদ দেন সে বিষয়ে যথাযথ আদব রক্ষা করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

কুরআনুল কারিম এবং হাদিসের ঘটনাগুলো আলিফ-লায়লার মতো আনন্দ-উপভোগের জন্য নয়। আবু জায়েদ হেলালির ঘটনার মতো নয়; যাতে বীরত্ব

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪৩৬

ও হিংস্রতা উপস্থাপিত হয়েছে। এমনিভাবে এগুলো শাহনামা এবং মিশরীয় বাদশাহদের মৃত্যুকাহিনি সম্বলিত গ্রন্থের মতোও নয়।

এগুলো তো প্রথমে শিক্ষা অর্জনের জন্য... উপদেশ গ্রহণের জন্য...

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

> *'আপনি ঘটনা বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'*[১]

কুরআন ও হাদিসের ঘটনায় যেসব ব্যক্তির নাম এসেছে সেগুলো কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র। যুগে যুগে এ নামগুলো পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রত্যেক যুগেই মুসা-ফিরআউন, ইবরাহিম ও নমরুদ ছিল। প্রত্যেক যুগেই অবাধ্য এবং আসহাবুল উখদুদ ছিল। প্রত্যেক যুগে মুহাম্মদ ও আবু জেহেল ছিল। প্রত্যেক যুগেই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক বদরি মুসলমান এবং বহু সংখ্যক কুরাইশের উপস্থিতি ছিল। প্রত্যেক যুগেই জুরাইজের মতো আবেদ এবং তার সম্প্রদায়ের মতো পাপাচারী লোক ছিল। প্রত্যেক যুগেই সরল-সহজ মানুষ ছিলেন। যাদের ঈমান ছিল ফিরআউনের চুল-আঁচড়ানো বাঁদির মতো পাহাড়সম সুদৃঢ়। প্রত্যেক যুগেই ফিরআউনের মতো পাপিষ্ঠ স্বামী ছিল। প্রত্যেক যুগেই নুহ ও লুত আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রীর মতো দুরাচারী স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক যুগেই নুহ আলাইহিস সালাম-এর সন্তানের মতো অবাধ্য সন্তান ছিল। প্রত্যেক যুগেই আবু লাহাবের মতো জালেম চাচা ছিল।

উল্লিখিত এ সকল ঘটনা থেকে আমাদেরকে এই শিক্ষা নিতে হবে যে, আমরাই শুরু নই। আবার আমরাই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির শেষ ব্যক্তি নই।

দ্বিতীয় পাঠ

বস্তুর চাকচিক্য যেন আপনাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। কখনো কখনো বস্তুর বিপরীত দিকটা ভেসে ওঠে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার খেজুরগাছে উঠলেন। তার সরু উরু দুটি দেখে সাহাবায়ে কেরাম হেসে ফেললেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'ইবনে মাসউদের উরু দুটি মিজানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়েও অধিক ভারী হবে।'[২]

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ১৭৬

[২] মুসনাদে আহমদ, ৯২০

আমিরুল মুমিনিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র জামায় ১৭টি তালি ছিল। আমাদের কেউ তার এই অবস্থা দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিত। যদি আমাদের কেউ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখত যে তিনি মদিনার অলিগলিতে হাঁটছেন, আর ছেলেপেলেরা তার কাপড় টেনে বলছে 'আব্বু...আব্বু...' তাহলে তাকে নগণ্য কিছু মনে করত! যদি আমাদের কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে মসজিদ ঝাড়ুদার নারীর প্রতি একবার তাকাত তাহলে আর তার দিকে তাকানোর চেষ্টা করত না। যদি কেউ বারা ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখত, এলোমেলো চুল, ধুলিমলিন চেহারা, দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, তাকে কেউ পাত্তাই দেয় না, [১] তাহলে সেও তাকে কোনো গুরুত্ব দিত না।

বাহ্যিক রূপ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। মানুষকে তো পোশাক-আশাক দিয়ে নয়; বরং অন্তরের (আমল ও আখলাকের) মাধ্যমে যাচাই করতে হয়।

আমি পোশাক আশাক ও উত্তম বেশভূষা ও সৌন্দর্য অবলম্বনের বিরোধী নই। বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা আল্লাহ তাআলা বান্দার গায়ে তার নেয়ামতের চিহ্ন দেখাটা পছন্দ করেন। [২]

কিন্তু বাহ্যিক দিকটাই সবকিছু নয়। আমাদের উল্লিখিত ঘটনায় নেতাগোছের এক ঘোড়সাওয়ার ছিল। যার প্রসিদ্ধি ছিল মুখে মুখে। মহিলাটি আকাঙ্ক্ষা করেছিল, ছেলেটি যেন তার মতোই হয়। সে তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে ধোকায় পড়ে গিয়েছিল। আমাদের সকলের অবস্থাই এমন। আমরা কারও হাতে ধন সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য দেখতে পেলে ধোঁকা খেয়ে যাই।

আলোচ্য শিশুটি মায়ের দুআ প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে, কারণ আল্লাহ তাআলা তাকে বাকশক্তি দান করেন।

ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য আমাদেরকে অহংকারী বানিয়ে দিলে এর কী মূল্য আছে? ওই কালো বাঁদি, যাকে চুরি ও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। মা দুআ করেছিল, সন্তানটি যেন এ বাঁদির মতো না হয়। আল্লাহ তাআলা তখন শিশুটিকে বাকশক্তি দান করেছেন। সে বলেছে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তার মত বানান। কেননা জালেম হওয়ার চাইতে মাজলুম হওয়াটা কল্যাণকর। যদি আপনি আকাশে পরিচিত হতে পারেন তাহলে জমিনে অপরিচিত থাকাটা

[১] সুনানে তিরমিযি, ৩৮৫৪
[২] সুনানে তিরমিযি, ২৮১৯

কোনো সমস্যাই না।

তৃতীয় পাঠ

ঘরগুলো রহস্যময়। মানুষগুলো বন্ধ বাক্স।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে জন্মদিন পালনের চিত্রটা মাথায় আনুন। জন্মদিন পালনের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দ্বারা কিন্তু এটা বুঝে আসে না যে, সন্তানের মাতা-পিতা, তারা স্বামী স্ত্রী অত্যন্ত সুখী।

ইন্সট্রাগ্রামের সুস্বাদু খাবারের চিত্রটা স্মরণ করুন। এতে কিন্তু এটা বুঝে আসে না যে, মানুষ যা খুশি তাই বানাতে পারে। কখনো কখনো সুখ স্বল্পতার কারণেও মানুষ আমাদেরকে বলে থাকে যে, আমরা সুখী।

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেল। তারা বানরের খাঁচার পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তারা দেখতে পেলো, পুরুষ বানর নারী নারী বানরকে নিয়ে খেলাধুলা করছে। স্ত্রী তখন বলল, আহ তাদের ভালোবাসা কত মধুর! এরপর তারা সিংহের খাঁচার কাছে দিয়ে অতিক্রম করল। তারা দেখতে পেল, পুরুষ সিংহটি একাকী নিশ্চুপ বসে আছে আর নারী সিংহটি দূরে গিয়ে খেলাধুলা করছে। স্ত্রী তখন বলল, তাদের ভালোবাসা কত বিষাদ! তখন মহিলাটির স্বামী ছোট্ট লাঠি নিয়ে নারী সিংহের উপর মারলো। এতে পুরুষ সিংহটি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সিংহীকে রক্ষার জন্য সে দৌড়ে আসলো। এরপর তারা বানরের খাঁচার কাছে ফিরে আসলো। পুরুষ লোকটি নারী বানরের উপর একটি ছোট্ট লাঠি নিক্ষেপ করল। কিন্তু দেখা গেল পুরুষ বানরটি তখনো খেলাধুলায় মত্ত রয়েছে। যেন কোনো কিছু ঘটেয়নি।

আমরা যা দেখি তার চেয়ে বেশি ভাবা থেকে বিরত থাকতে হবে।

চতুর্থ পাঠ

কখনো কখনো মানুষ এমন জিনিস প্রার্থনা করে থাকে যাতে তাদের জন্য ক্ষতি রয়েছে।

তারা জানে না যে, আল্লাহ তাআলার না দেওয়াটাও এক ধরনের দান।

কিছু মানুষ এমন রয়েছে, দরিদ্রতাই যার উপযোগী। কিছু মানুষ এমন রয়েছে, প্রাচুর্য তাকেই মানায়। বহু অসুস্থ মানুষ রয়েছে যদি তারা সুস্থ হতো তাহলে অহংকারী হয়ে যেত। বহু ধনী রয়েছে যারা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে থাকে। যদি তারা দরিদ্র হতো তাহলে আল্লাহর শানে কুফরি করত। বহু সুস্থ আবেদ রয়েছে যদি তারা অসুস্থ হতো তাহলে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যেত।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথাটি সবসময় স্মরণ করুন। তিনি বলেন, যদি গায়েবের পর্দা উন্মোচিত হয়ে যেত তাহলে আমাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য তাই নির্বাচন করত যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্বাচন করে রেখেছেন।

এক দরিদ্র ব্যক্তি এক হাকিমের কাছে উপস্থিত হয়ে তার দুরবস্থার অভিযোগ করে। তিনি প্রতিদিন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তিনি মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জানেন না। কিন্তু যখন এ ব্যক্তির বারংবার অভিযোগের কারণে তিনি বিরক্ত হয়ে গেলেন তখন তাকে হাতে কলমে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। এই উপলক্ষে তিনি গ্রামের সকল মানুষকে জমায়েত করলেন। প্রত্যেককে তাদের সমস্যাগুলো লিখে দিতে বললেন। প্রত্যেকেই নিজেদের নাম উল্লেখ করা ব্যতীত সমস্যাগুলো লিখে পাঠাল।

হাকিম সাহেব এ কাগজগুলো একটি বাক্সে ভরে রাখলেন। পরদিন লোকটি এলে তাকে বললেন, এই তো তোমার সামনেই মানুষের জীবন উপস্থিত। এগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটা জীবন তুমি নিজের জন্য নির্বাচন করে নাও। লোকটি কাগজ ওঠানো শুরু করল। প্রথম কাগজটি নিল, তা তার ভালো লাগল না। ফেলে দিল। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এভাবে করে সবগুলো কাগজ তুলে পড়ে ফেলে দিল। এবার সে হাকিম সাহেবকে বলল, 'আমার জীবন নিয়েই আমি সন্তুষ্ট।'

তাকদিরের ওপর সন্তুষ্টির মধ্যেই আসল প্রাচুর্য রয়েছে।

আল্লাহর শপথ, অল্পে সন্তুষ্টিই দুনিয়ার আসল প্রাচুর্য।

স্বপ্ন

সামুরাহ ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ قَالَ قَالاَ لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ قَالَ قَالاَ لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ

حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَانِ قَالَ قَالاَ لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالاَ لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هَؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ قَالَ قَالاَ لِي ارْقَ فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالاَ لَهُمْ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ قَالَ وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ قَالاَ لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ قَالاَ لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالاَ أَمَّا الْآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ قَالاَ لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ

الْآفَاقِ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই সহাবিদেরকে বলতেন, ‘তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি?’

কেউ স্বপ্ন দেখলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তা বর্ণনা করতেন। এমনই এক সকালে তিনি আমাদেরকে বললেন, ‘গত রাতে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এসেছিল। তারা আমাকে উঠাল। আর বলল, “চলুন।” আমি তাদের সঙ্গে চললাম। আমরা কাত হয়ে শুয়ে থাকা এক লোকের কাছে পৌঁছুলাম। দেখলাম, অন্য এক লোক তার কাছে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। লোকটির মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথরটি অন্যত্র গিয়ে পড়ছে। এরপর সে আবার পাথরটি নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মতো আবার ভালো হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে তেমনি আচরণ করতে থাকে, যা সে পূর্বে প্রথমবার করেছিল।’ তিনি বলেন, ‘আমি তাদের বললাম, “সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?” তারা আমাকে বলল, “চলুন, সামনে চলুন।”

তিনি বলেন, এরপর আমরা চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছুলাম। তার কাছে এক লোক লোহার কাঁচি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার

চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ থেকে মাথার পেছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। এরপর ঐ লোকটি শায়িত লোকটির অপরদিকে যায় এবং প্রথম দিকের সঙ্গে যেমন আচরণ করেছে তেমনি আচরণই অপরদিকের সঙ্গেও করে। ঐ দিক থেকে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মতো ভালো হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের মতো আচরণ করে। আমি বললাম, "সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?" তারা আমাকে বলল, "চলুন, সামনে চলুন।"

'আমরা চললাম এবং চুলার মতো একটি গর্তের কাছে পৌঁছুলাম। তাতে উঁকি মারতেই দেখলাম, বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ। নিচ থেকে উঠে আসা আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে ওঠে। আমি সাথিদের বললাম, "এরা কারা?" তারা বলল, "চলুন, সামনে চলুন।"'

তিনি বলেন, 'আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌঁছুলাম। নদীটি ছিল রক্তের মতো লাল। দেখলাম, তাতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে আরেক লোক অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। নদীর লোকটি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর পাথর একত্র করে রাখা ব্যক্তির কাছে পৌঁছে। এখানে এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ লোক তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে। আবার তার কাছে ফিরে আসে। যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়।' তিনি বলেন, 'আমি জানতে চাইলাম, "এরা কারা?" সাথিরা বলল, "চলুন, সামনে চলুন।"

'আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্রী লোকের কাছে পৌঁছলাম, যাকে তোমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে কুশ্রী বলে মনে হয়। দেখতে পেলাম সে আগুন জ্বালাচ্ছে আর তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস

করলাম, "এ লোকটি কে?" তারা বলল, "চলুন, সামনে চলুন।"

আমরা চললাম এবং একটা সজীব-শ্যামল বাগানে হাজির হলাম। যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মধ্যে আকাশসম উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছেন। তার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। তার চারপাশে বহু বালক-বালিকা। এত বেশি বালক-বালিকা আমি আর কখনো দেখিনি। আমি সাথিদে বললাম, "উনি কে? এরা কারা?" তারা বলল, "চলুন, সামনে চলুন।"

'আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌঁছুলাম। এমন বড় এবং সুন্দর বাগান আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। তারা আমাকে বলল, "এর উপরে চড়ুন।" আমরা উপরে চড়লাম। হাজির হলাম স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা তৈরি একটি শহরে। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছে দরজা খুলতে বললাম। দরজা খুলে দেয়া হলো। আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সুন্দর মনে হয়। আর শরীরের অর্ধেক বেশ কুশ্রী ছিল যা তোমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে কুশ্রী মনে হয়। আমার সাথিদ্বয় তাদেরকে বলল, "যাও, ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়ো।" নদীটা ছিল প্রশস্ত ও প্রবাহমান, পানি ছিল দুধের মতো সাদা। তারা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। এরপর আমাদের কাছে ফিরে এল। দেখা গেল তাদের এ কুৎসিত ভাবটুকু দূর হয়ে গেছে। তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে।

'তারা আমাকে বলল, "এটা জান্নাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান।"' তিনি বলেন, 'আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ধবধবে সাদা মেঘের মতো একটি প্রাসাদ।

তারা আমাকে বলল, "এটা আপনার বাসগৃহ।"

'আমি তাদেরকে বললাম, "আল্লাহ তোমাদের বরকত দিন! আমাকে সুযোগ দাও, আমি এতে প্রবেশ করি।" তারা বলল, "অবশ্যই আপনি এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।"

'আমি তাদের বললাম, "পেছনে অনেক বিস্ময়কর বিষয় দেখলাম,

এগুলোর তাৎপর্য কী?" তারা বলল, "আচ্ছা, তাৎপর্য এখন আপনাকে বলি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তি যার কাছে আপনি পৌঁছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে কুরআন জেনে তা ছেড়ে দিয়েছে, আর সে ফরজ নামাজ ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকত।

"আর যাকে দেখেছেন, মুখের এক ভাগ মাথার পেছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিঁড়ে ফেলা হচ্ছিল সে সকালে ঘর থেকে বের হয়ে কোনো মিথ্যা বলত, যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

"চুলা সদৃশ গর্তের ভেতরে থাকা উলঙ্গ নারী-পুরুষরা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল।

"আর যাকে নদীতে সাঁতার কাটতে ও মুখে পাথর নিতে দেখেছেন, সে হলো সুদখোর। "কুশ্রী লোকটি, যে আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে দৌড়াচ্ছিল, তিনি হলেন জাহান্নামের দারোগা, মালিক ফেরেশতা।

"বাগানে অবস্থান করা দীর্ঘকায় লোকটি হলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। তার সঙ্গে-থাকা বালক-বালিকারা হলো সেসব শিশু, যারা ফিতরাত তথা স্বভাবজাত ধর্ম ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছে।"' কয়েকজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি?' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও।'

(সাহাবিদের এই জিজ্ঞাসার পর নবীজি স্বপ্নের দুই লোকের অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করতে গিয়ে বললেন,) "যাদের অর্ধাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধাংশ অতি কুশ্রী দেখেছেন তারা হলো ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"'[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭০৪৭

প্রথম পাঠ

নবীদের স্বপ্ন ওহি। এটি আমাদের বিশ্বাস ও আকিদা। হাদিসের মাধ্যমেই তা বুঝে আসে। এটাই উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। আর কেউ দ্বিমত পোষণ করলেও কুরআনের মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

কেননা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে বলেছেন—

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

> *'বেটা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবাই করছি।'*

তখন ইসমাইল আলাইহিস সালাম বলেন—

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

> *'বাবা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন।'*[১]

এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি আয়াত। এর মাধ্যমে সবধরনের সন্দেহ-অভিযোগ বিদূরিত হয়ে যায়।

সাধারণ মানুষের স্বপ্ন তিন প্রকার।

- উত্তম স্বপ্ন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুমিনকে সুসংবাদ দেওয়া হয় কিংবা মানুষকে ভবিষ্যতের কোনো বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়। যেমন মিশরের বাদশাহর স্বপ্ন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে যার ব্যাখ্যা করেছেন।

- দুঃস্বপ্ন। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়। সে এর মাধ্যমে মুমিনকে ভারাক্রান্ত করে দিতে চায়।

- মনের জল্পনা। মানুষ যা করে থাকে এবং মনে মনে যা বলে থাকে সেটাই সে ঘুমের মধ্যে দেখতে পায়।

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন তারা প্রথম প্রকারের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে পারে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো ফতোয়ার মতো। আর আমাদেরকে না জেনে

[১] সুরা সাফফাত, আয়াত-ক্রম : ১০২

কোনো ফতোয়া দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রশ্ন চলে আসে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি এমন কোনো জ্ঞান যা আল্লাহ্ তাআলা মানুষের অন্তরে ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে?

নাকি এটা ব্যাকরণ, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের মতোই সাধারণ কোনো শাস্ত্র, চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা অর্জিত হয়?

এই বিষয়ে দীর্ঘ অধ্যয়নের পর আমি যে সার-নির্যাস বের করেছি তা হলো—স্বপ্নের ব্যাখ্যা এতদুভয়ের মাঝামাঝি একটি বিষয়।

তবে অধিকাংশই আল্লাহ-প্রদত্ত। কিছু কিছু মানুষকে আল্লাহ তাআলা তা দান করে থাকেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তাআলা নিজেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

> *‘এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন।’*[১]

আর কিছু স্বপ্ন এমন রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন মূলনীতি এবং নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলো আমাদের বোঝা জরুরি। তা হলো, দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হবে। এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহিমাহুল্লাহর কাছে এসে বলল, ‘স্বপ্নে আমি আজান দিতে দেখেছি।’ তিনি বললেন, ‘অচিরেই তুমি বাইতুল্লাহ্ শরিফে হজ করতে যাবে।’ আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ‘স্বপ্নে আমি আজান দিতে দেখেছি।’ তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি চুরি করে কারাগারে বন্দী হবে।’

[১] **সুরা ইউসুফ**, আয়াত-ক্রম : ৬

ছাত্ররা তার এই ব্যাখ্যায় আশ্চর্যবোধ করলে তিনি তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন।

তিনি বলেন, প্রথম ব্যক্তির মধ্যে আমি কল্যাণের বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছি। তাই আল্লাহ তাআলার বাণীর মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করেছি—

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

> *'এবং মানুষের মধ্যে হজের জন্যে ঘোষণা প্রচার করো।'*[১]

আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে পাপাচারের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তাই আমি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করেছি—

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ

> *'অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল, হে কাফেলার লোকজন, অবশ্যই তোমরা চোর।'*[২]

এ ছাড়াও কিছু স্বপ্ন রয়েছে যা সকলেই দেখে না। যেমন মিশরের বাদশাহ দুর্ভিক্ষের স্বপ্ন দেখেছিল। এটি রাজা-বাদশাহ ও প্রশাসকগণের স্বপ্ন। সাধারণ মানুষ তা দেখে না।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এক স্বপ্ন দেখেন। তখন তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহিমাহুল্লাহর কাছে এক ব্যক্তিকে স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য পাঠান। তাকে বলেন, 'তুমি আমার কথা বলবে না। বলবে, এটা আমার নিজের স্বপ্ন।' সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহিমাহুল্লাহ তাকে বলেন, 'তোমার মতো ব্যক্তি এ ধরনের স্বপ্ন দেখতে পারে না। স্বপ্নটি কার—আমিই কি তোমাকে তা বলে দেবো না তুমি আমাকে বলবে?' লোকটি বলল, 'আপনিই বলুন।' সাঈদ বললেন, 'স্বপ্নটি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের।' স্বপ্নটি হলো, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখেন যে, তিনি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সঙ্গে লড়াই করছেন। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাকে ধরাশায়ী করে তার শরীরে চারটি পেরেক বসিয়ে দিয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব এর ব্যাখ্যা করেন এভাবে, আবদুল মালিক অচিরেই ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা

[১] সুরা হজ, আয়াত-ক্রম : ২৭

[২] সুরা ইউসুফ, আয়াত-ক্রম : ৭০

করবে। মারওয়ানের মৃত্যুর পর একে একে তার চার ছেলে খলিফা হবে। আর বাস্তবে এমনটাই ঘটেছে। আবদুল মালিকের গভর্নর হাজ্জাজের হাতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। আর আবদুল মালিকের চার ছেলে ইয়াযিদ, হিশাম, ওয়ালিদ ও সুলাইমান পরবর্তীতে খলিফা হয়েছিলেন।

ঋতু, আরবি ভাষা, প্রবাদ-বাক্য প্রভৃতির মাধ্যমেও স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। আমি আমার কিতাব 'হাদিসুস সবাহ'-এ উদাহরণসহ এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

সেগুলো এখানে পুনরায় উল্লেখ করতে চাই না। জ্ঞান-ভাণ্ডারে নতুন কিছু বিষয় যুক্ত হওয়ায় সেগুলো এখানে উল্লেখ করে দিলাম।

তৃতীয় পাঠ

আলিমগণের মতে হাদিসে বারযাখের কথা বলা হয়েছে। মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়টি হলো বারযাখ। কবরের আজাবের ব্যাপারে ১০টি নয় বরং শত শত দলিল রয়েছে। কবর হলো পরকালের সর্বপ্রথম ঘাঁটি। এটা হয়তো জাহান্নামের গর্ত হবে কিংবা জান্নাতের বাগান। যারা কুরআন-হাদিস বাদ দিয়ে যুক্তি খাটায় তারাই কেবল হঠকারিতা বশতঃ কবরের নেয়ামত এবং এর আজাব অস্বীকার করতে পারে।

কবরে তারা কেবল চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়গোড় দেখে বলে, কবরের সুখ-শান্তি এবং আজাব-শাস্তি কোথায়? বাস্তবতা হলো, শরীর এবং আত্মার মধ্যকার সংযোগের কথা তারা ভুলে গেছে। অবস্থার স্তরভেদে এ সংযোগে তারতম্য ঘটে থাকে। মৃত্যুর পর আমরা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে থাকি। প্রতিটি স্তরে শরীরের সঙ্গে রুহের সম্পর্কের ভিন্নতা ঘটে।

মৃত্যুর পূর্বেই মানুষ বহু স্তর অতিক্রম করে আর মৃত্যুর পর আরও কিছু স্তর রয়ে যায়।

নিম্নে এ স্তরগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দাঁড় করানো হলো।

প্রথম :

অস্তিত্বহীনতার স্তর। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির পূর্বে এই স্তরটি ছিল। তখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইলমেই মানুষের অস্তিত্ব ছিল।

দ্বিতীয় :

অনু স্তর। আল্লাহ তাআলা এই সময় সকল আদম সন্তানের রুহ একসঙ্গে সৃষ্টি করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে তার রুবুবিয়্যাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তারা সকলেই তখন আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছিল। কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ

> *'আর যখন তোমার পালনকর্তা বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন এবং নিজের ওপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। (এটা এ জন্য যাতে) কেয়ামতের দিন আবার বলতে শুরু না করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।'*[১]

এরপর রুহ ফুঁকে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি মানুষের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেন।

তৃতীয় :

পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভের স্তর। রুহ ফুঁকে দেওয়া থেকে নিয়ে জন্ম হওয়া পর্যন্ত এ স্তরটি বিস্তৃত।

চতুর্থ :

বারযাখের স্তর। এটি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পঞ্চম :

চিরস্থায়ী হওয়ার স্তর। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের হিসাব-নিকাশ শেষ করা থেকে নিয়ে তা শুরু হবে। যা আর কখনো শেষ হবে না।

এরপর কেউ জাহান্নামে যাবে, কেউ জান্নাতে।

সন্দেহ নেই, উল্লিখিত স্তরগুলোতে শরীরের সঙ্গে রুহের সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে

[১] সুরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ১৭২

বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

অস্তিত্বহীনতার স্তরে দেহের সঙ্গে রুহের কোনো সম্পর্ক থাকে না। কেননা এই সময় দেহ ও রুহ কিছুই থাকে না। অনু স্তরে রুহ থাকে কিন্তু দেহ থাকে না।

বাস্তব অস্তিত্বের স্তরে দেহ সরাসরিভাবে শাস্তি এবং নেয়ামত ভোগ করে থাকে। রুহ তার অনুগামী হয়।

কাউকে প্রহার করলে তার দেহে আঘাত লাগে কিন্তু দেহের সঙ্গে রুহের সম্পর্ক থাকায় রুহ তার যাতনা ভোগ করে।

পক্ষান্তরে কবর-জগতে নেয়ামত ও আজাব উভয়টি রুহের ওপর হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দেহ রুহের অনুগামী হয়।

আর চিরস্থায়িত্বের স্তরে (জান্নাত-জাহান্নাম) দেহ ও আত্মা উভয়ের ওপর সমান সমান করে নেয়ামত ও শাস্তি প্রদান করা হবে।

চতুর্থ পাঠ

আল্লাহ তাআলার এক এক ইনসাফ হলো—তিনি কাজের ধরন-প্রকৃতি থেকেই প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

বারযাখে শাস্তি ভোগকারী লোকগুলোর প্রতি লক্ষ করে দেখুন, যে যে ধরনের অপরাধ করেছে তাকে সে ধরনের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

কুরআন পাওয়া সত্ত্বেও যে তা পরিত্যাগ করে, নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তার মাথায় আঘাত করা হচ্ছে। কারণ, মাথা হলো সিজদা দেওয়ার মাধ্যম। তাকে যখন সিজদা করতে বলা হয়েছিল তখন যেহেতু সে সিজদা করতে অস্বীকার করেছে তাই তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। আমি মনে করি কুরআন পরিত্যাগ করা এবং ফরজ নামাজ ছেড়ে ঘুমিয়ে যাওয়া উভয়টির কারণেই এই শাস্তি হবে। আর কুরআন পরিত্যাগ করার অর্থ হলো কুরআন অনুযায়ী আমল না করা। তেলাওয়াত নয় বরং অন্তরের মাধ্যমে তা পরিত্যাগ করা।

তাই কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসুল, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ এবং ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান পালন করে কিন্তু কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করে না তাকে শাস্তি দেওয়া হবে! মানুষের অবস্থান এবং

তাদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কুরআনুল কারিম পরিত্যাগের বিষয়টি নির্ণিত হয়। যেমন শাসকের কুরআনুল কারিম পরিত্যাগ হলো বিচারকার্যে তা বাস্তবায়ন না করা। সাধারণ মানুষের কুরআনুল কারিম পরিত্যাগ হলো দৈনন্দিন জীবনে তার বিধি-বিধান পালন না করা। যেমন পুরুষরা মিরাসের (পরিত্যক্ত সম্পদ) বিধি-বিধান পালন না করা। মিরাসের হকদারদের ওপর জুলুম করা। নারীরা পর্দা পালন না করা।

নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকাটা যদিও হালকা কোনো বিষয় নয়, তবু হাদিসের আলোকে বলা যায় যে, এটি কুরআন পরিত্যাগের মতো নয়। হাদিসে এসেছে, ঘুমের কারণে কিংবা ভুলে যাওয়ায় যার নামাজ ছুটে যায় তাহলে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে তা আদায় করে নেয়। কেননা এটিই তার কাফফারা।[১]

এক সাহাবির স্ত্রী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তার স্বামী অভিযোগ করেন যে, তার স্বামী ফজর-নামাজের সময় ঘুমিয়ে থাকেন। সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, আমি এমন সম্প্রদায়ের লোক যাদের ঘুম অনেক বেশি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'তাহলে যখন তুমি জাগ্রত হবে তখনই নামাজ পড়ে নিয়ো।'[২]

আল্লাহ মাফ মাফ করুন, ঘুমের প্রতি উৎসাহিত করবার জন্য আমি তা বলিনি, বরং এই সংক্রান্ত সঠিক বিষয়টি যাতে গোপন না হয়ে যায়, তাই উল্লেখ করেছি।

মিথ্যা বলার মাধ্যম—চোয়াল বিদির্ণ করে দেওয়াই হলো মিথ্যাবাদীর শাস্তি। ব্যভিচারীরা উলঙ্গ হয়ে হাশর করবে। তাদেরকে চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হবে। ব্যভিচারের মাধ্যম লজ্জাস্থান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। সুদখোরকে রক্ত-নদীতে ফেলে তার মুখে পাথর দিয়ে দেওয়া হবে। কারণ সে মুখ দিয়ে সুদ খেয়েছে।

পঞ্চম পাঠ

আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপারে কোনোরকম সংশয়ে ভোগা যাবে না।

রহমতের পূর্বে এই কথা স্মরণ রাখুন যে, আল্লাহ তাআলা ইনসাফকারী। ইনসাফ গুণের কারণেই তিনি বান্দাদের পরস্পরের মধ্যে কেসাস (সমতা-বিধান) করে

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৬৮৪
[২] সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস-ক্রম : ১৪৮৮

থাকেন।

যদি মিথ্যুকের প্রতি আপনি দয়ার্দ্র হয়ে থাকেন তাহলে স্মরণ করুন, মিথ্যা দুনিয়াতে কীসব করেছে! মিথ্যার কারণে কত মানুষের সম্মানহানি হয়েছে! কত মানুষের অধিকার আত্মসাৎ হয়েছে! কত ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে! কত ঘরবাড়ি তছনছ হয়েছে! কত রক্ত ঝরানো হয়েছে! আপনি কি চান যে, কোনো হিসাব-নিকাশ আর শাস্তি ছাড়াই এই সকল ব্যক্তি পার পেয়ে যাক?যদি আপনি ব্যভিচারীর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে থাকেন তাহলে স্মরণ করুন, দুনিয়ার জীবনে ব্যভিচারীরা কী করেছে। কত সন্তান জারজ হয়েছে! কত সম্ভ্রম লুট হয়েছে! কত মর্যাদাহানি ঘটেছে! আপনি কি চান, এরা কোনো হিসাব-নিকাশ আর শাস্তি ছাড়াই পার পেয়ে যাক?সুদখোরের প্রতি আপনি নমনীয় হলে স্মরণ করুন, সুদ সমাজের কী নাকাল দশা করেছে! কত হতদরিদ্র মানুষ ঋণের দ্বিগুণ সুদ প্রদান করেছে! ঋণ নিয়ে সুদ আদায় করতে না পারায় কত মানুষের ভিটেমাটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে! সুদের বিষাক্ত ছোবলে কত বৈধ খাত বন্ধ হয়ে গেছে! মূলধন-স্বল্পতার কারণে কত যুবকের কাজের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে! আপনি কি চান, এ সকল ব্যক্তি কোনো শাস্তি ছাড়াই মুক্তি পেয়ে যাক?

এই হাদিসে শাস্তি ও ইনসাফের পর রহমতের আলোচনা এসেছে।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। যেসব শিশুরা শৈশবে মারা গেছে তাদেরকে তিনি দেখাশোনা করছেন। এমনকি মুশরিকদের সন্তানদেরকেও। আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতগুণে পিতার শিরকের কারণে সন্তানকে পাকড়াও করেননি। তেমনিভাবে যার কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী পৌঁছেনি তাকেও শাস্তি দেওয়া হবে না।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

> *'কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি প্রদান করি না।'*[১]

যারা ভালো এবং মন্দ কাজের মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলার রহমত পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত-ক্রম : ১৫

হাদিসের বিপরীত দিকের প্রতি লক্ষ করলে বুঝা যায়, যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাদের কোনো নেক কাজ নেই। তাদের দুনিয়ার জীবন পুরোটাই ছিল জুলুম আর পাপাচারে ভরপুর।

ষষ্ঠ পাঠ

আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলা শুধু মৃতদের ওপর পাঠ করবার জন্য কুরআন অবতীর্ণ করেননি, বরং জীবিতদের ফায়সালার জন্য অবতীর্ণ করেছেন।

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

> *'যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে।'*[১]

নিশ্চয় এই কুরআন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। কুরআন অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত ইসলাম কখনো পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

আমরা নামাজ পড়ব, রোজা রাখব, হজ করব, জাকাত দেব, কিন্তু এরপর পশ্চিম বা পূর্ব থেকে আমাদের সংবিধান ধার করে আনব, এটা কখনো ইসলাম হতে পারে না।

ভালো লাগুক বা না লাগুক আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী আমাদেরকে জীবনযাপন করতে হবে।

অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর প্রণীত মিরাসের নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে, চাই তা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। যখন তিনি ক্রয়-বিক্রয় হালাল রেখেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন তখন অবশ্যই আমাদের তা পালন করতে হবে। যখন তিনি বিয়ের ব্যবস্থা রেখেছেন তখন অবশ্যই আমাদের তা কার্যকর করতে হবে। যখন তিনি প্রতিবেশীর হক নির্ধারণ করেছেন তখন অবশ্যই আমাদের তা পালন করতে হবে। যেহেতু তিনি নিকটাত্মীয়দের অধিকার নির্ধারণ করেছেন, অবশ্যই আমাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখতে হবে।

কুরআনুল কারিম কবুল করে নেওয়ার অর্থ কখনই এটা নয় যে, তা শুধু তেলাওয়াতই করা হবে। কুরআন কবুল করবার অর্থ হলো তেলাওয়াতের

[১] সুরা ইয়াসিন, আয়াত-ক্রম : ৭০

পাশাপাশি এতে বিবৃত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। যারা বলে, আমরা অবশ্যই নামাজ পড়ব, রোজা রাখব, হজ করব, জাকাত দেব, তবে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুতাবিক, তাহলে এসব লোক এখনও ইসলামকে বুঝতে পারেনি।

যে ব্যক্তি ইসলাম-বহির্ভূত বিচারব্যবস্থা কার্যকর করতে চায়, সে যেন আল্লাহর উপর মন্দ শরিয়ত প্রণয়নের অপবাদ আরোপ করল। যে ব্যক্তি ইসলাম-বহির্ভূত অন্য কোনো অর্থব্যবস্থা চেয়ে থাকে সে যেন নিজের অজান্তেই বলে যে, নিয়মকানুন তৈরি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে মানুষই বেশি জ্ঞান রাখে। নাউজুবিল্লাহ।

সপ্তম পাঠ

মিথ্যা হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করলেও এটি অবশ্যই মানুষের ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করে।

জাহেলি যুগের আরবরা অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল লোক ছিল।আবু জেহেলের কথাই ধরুন না! আরবের লোকেরা তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘর ধ্বংস করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন সে বলেছিল, ‘তোমরা কি চাচ্ছ যে, আরবের লোকেরা বলুক, আমি মুহাম্মদের মেয়েদের আতঙ্কিত করে তুলেছি?’ সে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র মেয়ে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে চড় মেরে বলে, ‘তোমরা এটা গোপন রাখবে। আরবের লোকেরা যেন তা জানতে না পারে।’

আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু’র বিষয়টা দেখুন! তিনি মুশরিক থাকাবস্থায় রোমের বাদশাহ তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সততা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কোনো মিথ্যা বলেননি।

কোনো কাজ হারাম হওয়ায় তা পরিত্যাগ করা কিংবা হালাল হওয়ায় তা গ্রহণ করা, ব্যক্তির পূর্ণতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু এর পাশাপাশি যাচাই করলে দেখা যাবে যে, জায়েজ জিনিসের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি পায় আর না-জায়েজ

কাজের কারণে ব্যক্তিত্ব কলুষিত হয়।

একজন ব্যক্তির নিজের প্রতি খারাপ আচরণ করাটাই হলো জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ট্রাজেডি।

হাদিসে কত চমৎকার বলা হয়েছে—'সত্য বলতে থাকলে এবং সত্যের উপর অটল থাকলে একসময় সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সিদ্দিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়ে যায়।'[১]

অষ্টম পাঠ

মানুষের সম্মানহানি করবেন না।

যার শক্তি নেই আল্লাহ তাআলাই তার শক্তি। যার অস্ত্র নেই আল্লাহ তাআলাই তার অস্ত্র।

যে ব্যক্তি কারও মানহানি করবে অচিরেই এমন ব্যক্তি আসবে যে তারও মানহানি করবে।

দুনিয়া ঋণ গ্রহণ আর পরিশোধের চক্রে চলছে। অর্থাৎ যেমন কর্ম করবেন তেমন ফলই আপনি পাবেন।

তাই কারও মানহানি করার মাধ্যমে আপনি নিজের সম্মানের উপর আঘাত করবেন না।

স্মরণ করুন, ক্ষমা করার মাধ্যমেই ইউসুফ আলাইহিস সালাম উপরে উঠতে পেরেছেন। তিনি নিকৃষ্ট কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেই রাজত্ব তার হাতে এসে ধরা দিয়েছে।

নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বহু শিক্ষা রয়েছে।

নবম পাঠ

সবচেয়ে কুৎসিত ব্যক্তি জাহান্নামের দারোগা মালেক ফেরেশতার ব্যাপারে একটু বলি। আল্লাহ তাআলা তাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন বলে কুৎসিত

[১] সুনানে তিরমিজি, হাদিস-ক্রম : ১৯৭১

করে সৃষ্টি করেছেন তা নয়। তার এই সিদ্ধান্তের পেছনে বিশেষ হেকমত রয়েছে।

মালেক দারোগাকে এই আকৃতিতে সৃষ্টি করার হেকমত হলো এর মাধ্যমে জাহান্নামিদের শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া। কারণ মানুষ যেমনভাবে সুন্দর চেহারা এবং উত্তম গঠনাকৃতির মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে থাকে তেমনিভাবে কুৎসিত চেহারার দ্বারা কষ্টবোধ করে থাকে। পিলে চমকে যায়।

মালেক ফেরেশতা যেন নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে এই আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জাহান্নামের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করাটা তার দায়িত্বের উপযোগী নয়।

এর বিপরীত দিকে রেজওয়ান হলেন জান্নাতের দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তিনি সবচেয়ে সুন্দর। জান্নাতিদের নেয়ামত বৃদ্ধির জন্যই এমনটি করা হয়েছে।

কিন্তু দুনিয়াতে সুন্দর হওয়া এবং কালো হওয়া উভয়টাই আল্লাহ তাআলার দান। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বান্দাদের মধ্যে সৌন্দর্য এবং অসৌন্দর্য বন্টন করে দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য কেবল তিনিই জানেন।

তাই আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে শিষ্টাচার রক্ষা করে চলতে হবে। কারণ শিল্পে খুঁত আছে বললে প্রকৃতপক্ষে শিল্পীকেই দোষারোপ করা হয়। অথচ আমাদের প্রতিপালক অক্ষমতা এবং ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আমরা রিজিকের প্রতি তাকিয়ে দেখি যে, তাতে মানুষের স্তরভেদ রয়েছে। কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র। কারও সন্তান-সন্ততি রয়েছে আবার কারও সন্তান-সন্ততি নেই। কারও হায়াত অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে আবার কারও হায়াত অত্যন্ত স্বল্প হয়ে থাকে। কেউ খুশি, কেউ দুঃখী। কেউ আনন্দিত, কেউ চিন্তিত। তেমনিভাবে কেউ সুন্দর, কেউ তুলনামূলক অসুন্দর। তাই কেউ সুন্দর হলে সে যেন শুকরিয়া আদায় করে। আর কেউ কুৎসিত আকৃতির হলে সে যেন সবর করে। দুনিয়া তো কেবল পরীক্ষার জায়গা।

উট হারিয়ে ফেলা সেই ব্যক্তিটি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দার তাওবার কারণে ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক আনন্দিত হন, যে নিজের পাথেয় নিয়ে উটে আরোহণ করে সফরে বের হয়ে যায়। এক বিজন প্রান্তরে পৌঁছে তার ঘুম চলে আসে। সে তখন উট থেকে নেমে এক গাছের নিচে ঘুমিয়ে যায়। এরই মধ্যে তার উটটি চলে যায়। জাগ্রত হওয়ার পর সে একটি টিলায় চড়ে উট খুঁজতে থাকে। কিন্তু উটের কোনো দেখা পায় না। এরপর আরেক টিলায় যায়। সেখান থেকেও কিছু দেখতে পায় না। এরপর তৃতীয় এক টিলায় যায়। সেখানেও কিছু দেখতে পায় না। এর মধ্যেই পিপাসার্ত হয়ে গেলে সে বলে, আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাব। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ঘুমিয়ে থাকব। মৃত্যুর জন্য সে তার মাথা বাহুর উপর রেখে শুয়ে পড়ে। একসময় জাগ্রত হয়ে দেখতে পায়, তার বাহনটি তার পাশেই উপস্থিত রয়েছে। আর তাতে তার খাবার-পানীয় এবং পাথেয়ও রয়েছে। তখন সে আনন্দের অতিশয্যে বলে ওঠে, "হে আল্লাহ, আপনি আমার বান্দা আমি আপনার রব!" আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে বসে। এই ব্যক্তিটি তার বাহন এবং পাথেয় পেয়ে যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছে আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দার তাওবার কারণে তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।'[১]

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৭৪৪-২৭৪৭। গ্রন্থকার নির্দিষ্ট একটি বর্ণনা না এনে কয়েকটি বর্ণনা মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। যাতে পুরো ঘটনা উঠে এসেছে।

প্রথম পাঠ

যদি সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে তাতে আল্লাহর ক্ষমতার কোনোই ঘাটতি হবে না। আর যদি সমস্ত সৃষ্টি তার আনুগত্য করে তাতেও তার রাজত্বে কোনো প্রবৃদ্ধি ঘটবে না। বান্দার গুনাহ্ যেমন আল্লাহর কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে না, তেমনিভাবে আনুগত্যও তার কোনো উপকার বয়ে আনে না।

কিন্তু তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অনেক সময় তার দয়া ও অনুগ্রহের আশায় মানুষ গাফেল হয়ে পড়ে। তার বদান্যতায় বান্দা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।

দ্বীনের আলোয় পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের তাওবার জন্য তিনি রাতে আপন হস্ত প্রসারিত করে রাখেন। আর রাতের পাপীরা যাতে তাওবা করতে পারে এজন্য তিনি দিনের বেলা সে হাত প্রসারিত করে রাখেন। যদি কেউ পাহাড়সম অপরাধ নিয়ে আসে তবুও তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। যে ব্যক্তি তার দরজায় কড়া নাড়ে তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি তার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে তিনি (তার রহমত) তার দিকে দৌড়ে আসেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ক্ষমা করতেই তিনি ভালোবাসেন। তিনি দয়াময়। অপরাধ এড়িয়ে যেতেই তিনি পছন্দ করেন।

আপনার গুনাহ্ যত বড় হোক না কেন তার ক্ষমা তারচেয়েও বড়। আপনার অপরাধ যত বেশিই হোক না কেন তার বদান্যতা এরচেয়েও বেশি।

বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা থেকে বিরক্ত না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার বদান্যতা থেকে হাত গুটান না। গুনাহ্ বেশি হয়ে গেলে শয়তান আপনার সামনে অপরাধসমূহকে সুসজ্জিত করে তুলবে।

তখন স্মরণ করুন, আপনি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এসে তাকে ডাক দিলে তিনি কতটা খুশি হন!

'হে আমার রব, আমি গুনাহ্ করেছি, আপনি ছাড়া আমার আর কোনো রক্ষাকারী নেই। আপনার বান্দা তো অনেক; কিন্তু আপনি ছাড়া আমার আর কোনো রব নেই।' তিনি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

সামান্য সময়ের তাওবার মাধ্যমে তিনি বহু বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। তাই শয়তান যেন তার রহমত থেকে আপনাকে নিরাশ করে না রাখে।

আপনার অবস্থা যেমনই হোক, তার দরজায় করাঘাতের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করবেন না। তিনি তো আল্লাহ! তিনি পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশাহ নন! যাদের প্রতি আপনি এক যুগ ভালো আচরণ করলেও কোনো একবার মন্দ আচরণ করে ফেললে তারা আপনাকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু তিনি তো পরম ক্ষমাশীল। পৃথিবীর রাজা বাদশাহদের চরিত্র দিয়ে আসমানের বাদশাহকে পরিমাপ করবেন না।

বর্ণিত আছে, দুনিয়ার কোনো এক বাদশাহর কিছু হিংস্র কুকুর ছিল। যারা বাদশাহর কাজে গাফলতি করত তাদেরকে সেই কুকুরগুলোর মুখে নিক্ষেপ করা হতো। বাদশাহর এক উজির ছিল। বহু বছর সে তার কাজ করেছে। একবার এই উজির বাদশাহর কোনো এক কাজে ভুল করে ফেলল। বাদশাহ তখন তাকে কুকুরের মুখে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। উজির বাদশাহর কাছে এক সপ্তাহ সময় চাইল। বাদশাহ তা প্রদান করলেন।

উজির তখন কুকুর দেখাশোনাকারী কর্মচারীকে বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরে যাও। তোমার পক্ষ থেকে আমি এক সপ্তাহ কুকুরগুলো দেখাশোনা করব।' উজির কুকুরগুলোকে খানা খাওয়াতে থাকে, এগুলোর যত্ন নিতে থাকে। এভাবে কুকুরগুলো তাকে ভালোবাসতে শুরু করে।

এক সপ্তাহ পর বাদশাহ-উজিরকে কুকুরের মুখে ফেলে দেয়। কিন্তু কুকুর তাকে খেলো না। বাদশাহ তখন আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি কি কুকুরকে জাদু করেছ?' উজির বলল, 'কখনোই নয়; বরং আমি এক সপ্তাহ এগুলোর সেবা-যত্ন করেছি। তাই তারা আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করেছে। অথচ এক যুগ ধরে আপনার সেবা করলাম কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে এতটুকু ভালো আচরণ করলেন না!' এটাই পৃথিবীর বাদশাহর চরিত্র।

আসমানের বাদশাহর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেউ যুগ যুগ ধরে তার অবাধ্যতা করলেও তিনি মুহূর্তেই তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কেউ জীবনভর তার প্রতি দুঃসাহসিকতা দেখালেও চোখের পলকেই তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারেন।

তাই আপনি তার থেকে বিমুখ হবেন না, কারণ তিনি তো আপনার থেকে বিমুখ হন না।

দ্বিতীয় পাঠ

দুনিয়া হলো উপায়-উপকরণের জগত। উপকরণ গ্রহণ করাটা মোটেও তাওয়াক্কুল-পরিপন্থী নয়। বরং আমাদেরকে তো উপকরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এসব তাকদিরের ভিত্তিতে ঘটে থাকে।

যদি ঈমানি শক্তির কারণে কেউ উপকরণ গ্রহণ করার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী হতো, তাহলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী হতেন। কারণ কেউই তার চেয়ে অধিক ঈমানদার ছিল না।

হিজরতের সময় মদিনার পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি একজন পথপ্রদর্শক ভাড়া নিয়েছিলেন। তিনি এ কথা বলেননি যে, আমি তো নবী, তাই যে অবস্থায় থাকি না কেন অবশ্যই আমি মদিনায় পৌঁছতে পারব।

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বর্ম পরিধান করতেন। তিনি বলেননি যে, আমি তো নবী। যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে রক্ষা করবেন।

তিনি যুদ্ধে বের হওয়ার সময় এর সংবাদ গোপন রাখতেন। শত্রুর উপর যেন আকস্মিক হামলা করা যায় এজন্য তিনি ভিন্ন পথ গ্রহণ করতেন। তিনি বলেননি যে, আমি তো নবী, যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করবেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন, এক বেদুইন তার খোসপাঁচড়াযুক্ত উটের সুস্থতার জন্য আকাশের দিকে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুআ করছে। তখন তিনি বললেন, 'তুমি কিছু আলকাতরার মাধ্যমে তোমার দুআকে শক্তিশালী করো।' অর্থাৎ তুমি উপকরণ গ্রহণ করো। চিকিৎসা অবলম্বন করো। দুআ পরিত্যাগ করো না।

উমর রাদিয়াল্লাহু সিরিয়াতে প্রবেশ করার ইচ্ছে পোষণ করলেন। এমন সময় তার কাছে খবর গেল, সেখানে মহামারি দেখা দিয়েছে। খবর শুনে তিনি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলার তাকদির থেকে কি পালায়ন করতে চাচ্ছেন?' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, 'আল্লাহর এক তকদির থেকে অপর তাকদিরের দিকে পলায়ন করছি।'

যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো উপত্যকায় উপনীত হয় যার দুটি উঁচু জায়গা

রয়েছে, একটি অনুর্বর অপরটি উর্বর, সে যদি অনুর্বর ভূমিতে পশু চড়ায় তাহলে কি আল্লাহর তাকদিরে সে পশু চড়াল না? আর যদি সে উর্বর ভূমিতে পশু চড়ায় তাহলে কি সে আল্লাহর তাকদিরে পশু চড়াল না?

এরপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

> *'যখন তোমরা কোনো ভূখণ্ডে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কথা শুনবে তখন সেখানে যাবে না। আর যখন এমন ভূখণ্ডে মহামারি ছড়াবে যেখানে তোমরা অবস্থান করছ তাহলে তা থেকে পলায়ন করে বের হয়ে যাবে না।'*[১]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি উমরের অন্তরে হক ঢেলে দিয়েছেন।'[২]

আমাদের আলোচ্য হাদিসে উল্লিখিত ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে ভুল করেছে। বাহন ছেড়ে দিয়ে তার এভাবে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। যদি সে তা বেঁধে ঘুমাত তাহলে ঘুম থেকে উঠে তা পেত। তাই যথাসম্ভব উপায়-উপকরণ গ্রহণ করুন। কিন্তু উপায়-উপকরণকে বিশ্বাস করে বসে থাকবেন না।

তরবারি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় এনে দিতে পারে না, কিন্তু তরবারি ফেলে দেওয়াটা বোকামি। কাজকর্ম মানুষের রিজিক এনে দিতে পারে না, কিন্তু কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়াটা নির্বুদ্ধিতা। ঔষধ মানুষকে সুস্থ করে তুলতে পারে না, কিন্তু এটি সুস্থ হওয়ার মাধ্যম। আমাদেরকে তা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহায্যকারী, রিজিকদাতা, সুস্থকারী তো আল্লাহ।

কিন্তু এই পৃথিবীটা এক বস্তুজগত। তাই বস্তু ও উপায়-উপকরণ থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৯৭৩
[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২২১৯

তৃতীয় পাঠ

ভুল প্রত্যাখ্যাত...

তাই বলে শব্দে শব্দে অক্ষরে অক্ষরে মানুষের ভুল ধরে বসে থাকবেন না।

লাগামহীন উচ্ছ্বাস বিবেক-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলে। আবার তীব্র শোকও মানুষের বিবেক হরণ করে নেয়।

হাদিসে উল্লিখিত ব্যক্তিটি বলে ফেলেছে, 'হে আল্লাহ আপনি আমার বান্দা আমি আপনার রব!' এ বাক্যের প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ করলে তো এটা সুস্পষ্ট কুফরি। কিন্তু দয়াময়ের চিত্র দেখুন, তিনি সে ব্যক্তির হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলছেন, 'আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলেছে।' তাই ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি আলোচনা না করে কোনো কথার কারণে কাউকে কাফের আখ্যা দেবেন না। কেননা এটি কুফরি বাক্য হওয়ার ব্যাপারে তার জ্ঞান নাও থাকতে পারে। সে কখনো অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কিংবা আনন্দিত অবস্থায় থাকতে পারে।

আমি আনন্দ ও দুঃখাবস্থায় খারাপ কথা বলার সাফাই গাইছি না, বরং বলতে চাচ্ছি, আমরা তো মানুষ, কখনো কখনো আমাদের অন্তর এবং জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আকিদার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এরপরও এই ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকে তিনি বিবেচনায় নিয়েছেন। তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া দরকার?এ হাদিসে আমাদের জন্য আরেকটি শিক্ষা রয়েছে।

সেটা হলো অত্যন্ত আনন্দের সময় কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না। আনন্দের সময় আমরা এমন জিনিসের ওয়াদা করে ফেলি, যার সক্ষমতা আমরা রাখি না। আবার কষ্টের সময় আমরা এমন বিষয়ের হুমকি প্রদান করি, যার ক্ষমতা আমরা রাখি না।

আনন্দের উচ্ছ্বাস শেষ হতে দিন। রাগের পারদ নেমে আসতে দিন। এরপর নিজের বিষয়াদির প্রতি নজর ফেলুন।

সেসব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হবেন না, খারাপ কাজ যাদেরকে পরিচালিত করে থাকে।

চতুর্থ পাঠ

কুফুরি কথা উদ্ধৃত করা কুফরি নয়।

আমাদেরকে কোনো কথার বক্তা এবং তার বর্ণনাকারীর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। কোনো কথায় বিশ্বাসকারী এবং সে কথা উদ্ধৃতিকারীর মধ্যে গোলমাল বাঁধানো যাবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কুফরি বাক্য উদ্ধৃত করছেন, যার উপর তিনি কস্মিনকালেও বিশ্বাস রাখেন না। কুরআনুল কারিমেও পূর্ববর্তী জাতির কুফরি-কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি—

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

> *'আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান!'*[১]

তিনি কি বলেননি—

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ

> *'আর ইহুদিরা বলে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে।'*[২]

মুসলমানদের ব্যাপারে আমাদের উত্তম ধারণা রাখতে হবে। তাদের কথাগুলোর উত্তম ব্যাখ্যা করব আমরা।

এক বুজুর্গ বলেছেন, যদি আমি কোনো ভাইকে পাহাড়ে উঠে এটা বলতে শুনি যে—

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

> *'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।'*

তাহলে আমি বলব, সে একটি আয়াত তিলাওয়াত করছে। যদি আমি তার দাড়ি থেকে মদ টপকে পড়তে দেখি তাহলে আমি বলব সম্ভবত তার দাড়িতে মদ ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

---

[১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১৮১

[২] সুরা মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ৬৪

আসহাবুল উখদুদ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ، قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي

أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمِ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمِ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ، فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ

لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ

'তোমাদের পূর্ববর্তী যামানায় এক বাদশাহ ছিল। তার ছিল এক জাদুকর। বার্ধ্যক্যে পৌঁছে সে বাদশাহকে বলল, "আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, সুতরাং একজন বালককে আপনি আমার কাছে প্রেরণ করুন, যাকে আমি জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেব।" অতঃপর জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য বাদশাহ তার কাছে এক বালককে প্রেরণ করল। বালকের যাত্রাপথে ছিলেন এক ধর্মযাজক। বালক তার কাছে বসল এবং তার কথা শুনল। তার কথা যুবকের পছন্দ হলো। তারপর বালক জাদুকরের কাছে যাত্রাকালে সর্বদাই ধর্মযাজকের কাছে যেত এবং তার কাছে বসত। তারপর সে যখন জাদুকরের কাছে যেত তখন সে তাকে মারধর করত। ফলে জাদুকরের ব্যাপারে সে ধর্মযাজকের কাছে অভিযোগ করল। তখন ধর্মযাজক বললেন, "তোমার যদি জাদুকরের ব্যাপারে ভয় হয় তবে বলবে, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আসতে দেয়নি। আর যদি তুমি তোমার গৃহকর্তার ব্যাপারে আশংকাবোধ করো তবে বলবে, জাদুকর আমাকে বিলম্বে ছুটি দিয়েছে।" এমনিভাবে চলতে থাকাবস্থায় একদিন হঠাৎ সে একটি ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর সম্মুখীন হলো, যা লোকেদের পথ আটকিয়ে রেখেছিল। এ অবস্থা দেখে সে বলল, "আজই জানতে পারব, জাদুকর উত্তম না ধর্মযাজক।" অতঃপর একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, "হে আল্লাহ! যদি জাদুকরের চাইতে ধর্মযাজক আপনার কাছে পছন্দনীয় হয়, তবে এ পাথরে আঘাতে হিংস্র প্রাণীটি নিঃশেষ করে দিন, যেন লোকজন চলাচল করতে পারে।" অতঃপর সে হিংস্র প্রাণীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ল এবং সেটাকে মেরে ফেলল। ফলে লোকজন আবার যাতায়াত শুরু করল। এরপর সে ধর্মযাজকের কাছে এসে তাকে সম্পূর্ণ ঘটনা বলল। ধর্মযাজক বলল, "বেটা! আজ তুমি আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ। তোমার মর্যাদা এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি। তবে শীঘ্রই তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি পরীক্ষার মুখোমুখি হও তবে আমার কথা গোপন

রাখবে।” এদিকে বালক আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে লাগল এবং লোকদের সমুদয় রোগ-ব্যাধির নিরাময় করতে লাগল। বাদশাহর পরিষদবর্গের এক লোক অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকটি যুবকের ব্যাপারে শুনতে পেয়ে বহু হাদিয়া ও উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এল এবং বলল, “তুমি যদি আমাকে আরোগ্য দান করতে পারো তবে এসব মাল আমি তোমাকে দিয়ে দেব।” এ কথা শুনে বালক বলল, “আমি তো কাউকে আরোগ্য দান করতে পারি না। আরোগ্য তো দেন আল্লাহ তাআলা। তুমি যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনো তবে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন।” তারপর সে আল্লাহর ওপর ঈমান আনল। আল্লাহ তাআলা তাকে রোগমুক্ত করে দিলেন। এরপর সে বাদশাহর কাছে এসে অন্যান্য দিনের মতোই বসল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করল, “তোমার দৃষ্টিশক্তি কে ফিরিয়ে দিল?” সে বলল, “আমার রব।” এ কথা শুনে বাদশাহ তাকে আবার প্রশ্ন করল, “আমি ছাড়া তোমার অন্য কোনো রব আছে?” সে বলল, “আমার ও আপনার সকলের রবই আল্লাহ।” অতঃপর বাদশাহ তাকে পাকড়াও করে অবিরতভাবে শাস্তি দিতে লাগল, অবশেষে সে ঐ বালকের সন্ধান দিয়ে দিল। বালককে নিয়ে আসা হলো। বাদশাহ তাকে বলল, “প্রিয় বেটা! তোমার জাদু এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকেও নিরাময় করতে পার!” বালক বলল, “আমি কাউকে নিরাময় করতে পারি না। নিরাময় করেন আল্লাহ।” এ কথা শুনে বাদশাহ এবার বালককে শাস্তি দিতে লাগল। বালক শাস্তি বরদাশত করতে না পেরে অবশেষে ধর্মযাজকের (দরবেশের) কথা বলে দিল। এরপর ধর্মযাজককে ধরে আনা হলো এবং তাকে বলা হলো তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে এসো। তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে তার মাথার তালুতে করাত রেখে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো। এতে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অবশেষে ঐ বালকটিকে আনা হলো এবং তাকেও বলা হলো—তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে এসো। সেও অস্বীকার করল। অতঃপর বাদশাহ তাকে তার কিছু সহচরের হাতে অর্পণ করে বলল, “তোমরা তাকে অমুক

পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তাকেসহ পাহাড়ে আরোহণ করো। পর্বত শৃঙ্গে পৌঁছার পর সে যদি তার ধর্ম থেকে ফিরে আসে তাহলে তো ভালো। নতুবা তাকে সেখান থেকে ছুঁড়ে মারবে।" তারপর তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকেসহ পর্বতে আরোহণ করল। বালক তখন দুআ করে বলল, "হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষ করো।" তৎক্ষণাৎ তাদেরকেসহ পাহাড় কেঁপে উঠল। ফলে তারা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ল। আর সে হেঁটে হেঁটে বাদশাহর কাছে চলে এল। তাকে দেখে বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করল, "তোমার সাথিরা কোথায়?" সে বলল, "আল্লাহ আমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত করেছেন।" বাদশাহ আবারও তাকে তার কতিপয় সহচরের হাতে সমর্পণ করে বলল, "তোমরা তাকে নিয়ে নৌকায় তুলবে। তারপর মাঝ সমুদ্রে যাবার পর সে যদি তার দ্বীন (ধর্ম) থেকে ফিরে আসে তাহলে তো ভালো, নতুবা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ো।" তারা তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেল। এবারও সে দুআ করে বলল, "হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি আমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করো।" তৎক্ষণাৎ নৌকাটি তাদেরসহ উল্টে গেল। ফলে তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল। আর বালক হেঁটে হেঁটে বাদশাহর কাছে চলে এল। তাকে দেখে বাদশাহ প্রশ্ন করল, "তোমার সঙ্গীগণ কোথায়?" সে বলল, "আল্লাহ আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন।" অতঃপর সে বাদশাহকে বলল, "তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করবে।" বাদশাহ বলল, "সে আবার কী?" বালক বলল, "একটি ময়দানে তুমি লোকদেরকে জমায়েত করো। অতঃপর একটি কাষ্ঠের শূলীতে আমাকে উঠিয়ে আমার তিরদানি থেকে একটি তির নিয়ে সেটাকে ধনুকের মধ্যে রাখবে। এরপর 'বালকের প্রভুর নামে' বলে আমার দিকে তির নিক্ষেপ কোরো। এভাবে যদি করো তবেই তুমি আমাকে মারতে পারবে।" তার কথা অনুসারে বাদশাহ লোকদেরকে এক মাঠে জমায়েত করল এবং তাকে একটি কাষ্ঠের শূলীতে চড়াল। অতঃপর তার তিরদানি থেকে একটি তির নিয়ে সেটাকে ধনুকের মধ্যে রেখে 'বালকের প্রভুর নামে' বলে তার দিকে

তা নিক্ষেপ করল। তির তার কানের নিম্নাংশে গিয়ে বিঁধল। অতঃপর সে তিরবিদ্ধ স্থানে নিজের হাত রাখল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করল। এ দৃশ্য দেখে রাজ্যের লোকজন বলে উঠল, “আমরা এ বালকের রবের ওপর ঈমান আনলাম।” এ সংবাদ বাদশাহকে জানানো হলো এবং তাকে বলা হলো, “লক্ষ করেছেন কি? আপনি যে পরিস্থিতি উদ্ভবের আশঙ্কা করছিলেন, আল্লাহর শপথ! সে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিই আপনার মাথার উপর চেপে বসেছে। সকল মানুষই বালকের রবের উপর ঈমান এনেছে। এ দেখে বাদশাহ্ সকল রাস্তার মাথায় গর্ত খননের নির্দেশ দিল। গর্ত খনন করা হলো এবং ওগুলোতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হলো। অতঃপর বাদশাহ আদেশ করল, “যে লোক তার ধর্মমত বর্জন না করবে তাকে ওগুলোতে নিক্ষেপ করা হবে।” কিংবা সে বলল, “তাকে বলবে, যেন সে অগ্নিতে প্রবেশ করে।” লোকেরা তাই করল। পরিশেষে এক নারী একটি শিশু নিয়ে অগ্নিগহ্বরে পতিত হবার ব্যাপারে ইতস্তত করছিল। এ দেখে দুধের শিশু তাকে (মাকে) বলল, “ওহে আম্মাজান! সবর করুন, আপনি তো সত্য দ্বীনের (ধর্মের) উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।”’[১]

প্রথম পাঠ

দুনিয়া বড় আজব। কল্পনাতীত জায়গায়ও গোমরাহি তির হয়। কুফরির কারণে মহাপ্লাবন নবীপুত্রকে ডুবিয়ে দিয়েছে। কুফরির কারণে নবীর স্ত্রীর ওপর সম্প্রদায়ের অনুরূপ আজাব নেমে এসেছে। নবীর পিতা মূর্তি পুজায় লিপ্ত! তিনি স্বচক্ষে দেখছেন তার ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

আবার যেখান থেকে হেদায়েতের আশা করা যায়নি সেখান থেকেও হেদায়েতের আলো ফুটে উঠেছে। আযরের ঔরস থেকেই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বের হয়েছেন! ফিরআউনের প্রাসাদ থেকে মুসা আলাইহিস সালাম বের হয়েছেন!

যে ফিরআউন বলেছিল—

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ৩০০৫

> *'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।'*

তার ঘর থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিদূষী নারী আসিয়া বের হয়েছেন! মহান পবিত্র সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে তাকে শূলীতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

যে বালককে বাদশাহ জাদুকর বানাতে চেয়েছিল সে দায়ী হয়ে যায়। যে শিশুর মাধ্যমে বাদশাহ মানুষকে গোমরাহ করতে চেয়েছিল সে-ই মানুষের হেদায়েতের মাধ্যম হয়ে ওঠে। যে শিশুর মাধ্যমে বাদশাহ রাজত্ব মজবুত করতে চেয়েছিল সে-ই তার রাজত্ব নড়বড়ে করে দেয়। যে শিশুর মাধ্যমে বাদশাগহ নিজের শক্তি জাহির করতে চেয়েছিল সে-ই তার দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়।

কোনো ঘরই একেবারে নিখুঁত হিসাবে চলে না।

ঘরে কেবল মানুষ বসবাস করে কিন্তু তাদের অন্তরগুলো তো আল্লাহর হাতে। যেখানে আমরা ধারণা করি যে, হেদায়াত ছাড়া কিছুই নেই সেখানে তিনি গোমরাহ করতে পারেন আর যেখানে আমরা ধারণা করি যে, গোমরাহি ব্যতীত কিছু নেই সেখান থেকে তিনি হেদায়েত দিতে পারেন।

দ্বিতীয় পাঠ

আপনিও চান আমিও চাই, কিন্তু আল্লাহ যা চান তা-ই বাস্তবায়িত হয়। কে ভেবেছিল—এই বালক বাদশাহর রাজত্বকে নড়বড়ে করে দেবে!

কে ভেবেছিল—মদপ্রেমী হামযাহ একসময় আল্লাহর সিংহ হয়ে যাবেন!

কে ভেবেছিল—যিনি উহুদে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের কারণ ছিলেন অচিরেই সেই তিনিই সাইফুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) হয়ে যাবেন!

কে ভেবেছিল—মক্কা বিজয়ের দিন যাঁর রক্ত হালাল ঘোষণা করা হয়েছিল সেই ইকরামা অচিরেই ইয়ারমুকের নেতা এবং শহিদ হয়ে যাবেন!

কে ভেবেছিল—শত মানুষের হন্তারককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য আল্লাহ তাআলা ভূখণ্ডকে সংকুচিত করে দেবেন!

কে ভেবেছিল—যেই উমর খেজুরের মাধ্যমে উপাস্য বানিয়ে তার ইবাদত করতেন এবং তা আবার খেয়ে ফেলতেন তিনিই একসময় ইতিহাসের অন্যতম ন্যায়-

পরায়ণ শাসক হয়ে যাবেন!

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো ইতিহাসের চেয়েও বড় ব্যক্তি ছিলেন, তার সঙ্গে কাউকে তুলনা দেওয়া যায় না।

কে ভেবেছিল—যে ব্যক্তি হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করেছে অচিরেই সে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করবে!

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহ তাআলা কোনো যুদ্ধ সংঘটিত করতে চাইলে তার জন্য এমন অস্ত্র নির্বাচন করেন, আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। একটি ছোট্ট বালক তখন একটি রাজত্ব ধ্বংস করে ফেলে! সাধারণ পানি পুরো জাতিকে ডুবিয়ে দেয়! সমুদ্র ধ্বংস করে ফেলে আস্ত এক বাহিনীকে! সামান্য এক মশা নমরুদকে অপদস্থ করে ফেলে! ভূপৃষ্ঠ কারুনকে গিলে ফেলে! বৃষ্টি পরাক্রমশালী সম্প্রদায়কে পরাভূত করে দেয়! বাতাস জালেমদেরকে টেনে নিয়ে যায়! ছোট্ট এক পাখি আবরাহাকে পিষে মারে! আর এতসব কিছু করতে আল্লাহ তাআলার একটি শব্দের বেশি কিছু খরচ হয় না। তিনি শুধু বলেন, ‘হও!’, হয়ে যায়।

বিশ্বাস রাখুন, যিনি রাজত্বকে ধ্বংস করে দিলেন, তিনি আপনার দুঃখ দূর করে দিতে সক্ষম। যিনি আস্ত এক বাহিনীকে তছনছ করে দিতে পারেন তিনি আপনার নিরাশা দূর করে দিতে সক্ষম। যিনি অহংকারী সম্প্রদায় এবং হস্তিবাহিনীকে পরাজিত করে দিলেন তিনি আপনার কষ্ট দূর করতে সক্ষম। শুধু তাকে দেখাতে হবে যে, আপনি তার জন্য, তাহলে তিনিও আপনাকে দেখাবেন যে, তিনি আপনার জন্য।

চতুর্থ পাঠ

ঈমানের বিষয়টি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক

কেউ গোটা জীবন কুফরি এবং গোমরাহির মধ্যে কাটিয়ে দেয়, আর পরমুহূর্তেই ঈমান তার সবকিছু মুছে ফেলে। তার অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সে যেন কুফর কী জিনিস জানেই না!

মানুষেরা যুগের পর যুগ ধরে বাদশাহর পূজা করত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা

বাদশাহ ছাড়া রব বলে আর কাউকে জানত না। কিন্তু শুধুমাত্র একটি বালকের মৃত্যুতে তারা কুফর থেকে ঈমানের পথে চলে আসে। তাদের জন্য গর্ত খোঁড়া হয়, আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়, জ্বলন্ত আগুনে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু কোনো জিনিসই তাদেরকে ঈমান থেকে টলাতে পারেনি। যেন তাদের জন্মই হয়েছে ঈমানের ওপর এবং ঈমান নিয়ে তারা জীবনযাপন করেছে।

বাদশাহর এই অন্ধ সভাসদ ছিল তারই এক অনুচর। মানুষকে বাদশাহর ইবাদত করার জন্য এবং তাদের কাছে কুফরকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্য সে গোটা জীবন ব্যয় করেছে। তারপর ঈমান আনায় তার মাথায় করাত ধরা হয়েছে, সত্য ধর্ম পরিত্যাগ না করায় তাকে দুটুকরো করে ফেলা হয়েছে।

ফিরআউনের জাদুকরদেরকে মিশরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পূর্বপরিচিতির সূত্র ধরে আনা হয়। তাদের অনেকেই ফিরআউনের সেবক ও সভাসদ ছিল। ফিরআউনের আঙুলের ইশারায় তারা যে-কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে ঈমানের নুর এল, তারা সকলেই মুসা আলাইহিস সালাম এবং হারুন আলাইহিস সালাম-এর রবের উপর ঈমান আনল। তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

ফিরআউন আড়াআড়িভাবে তাদের হাত-পাঁ কেটে দেওয়ার এবং শূলীতে চড়ানোর হুমকি দেয়। তারা কি তখন মাথা নত করে দিয়েছিল? এক মুহূর্তের ঈমান তাদেরকে আমূল বদলে দিয়েছিল।

তারা ফিরআউনকে বলেছিল—

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

> *'তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। যা করবার পার্থিব এই জীবনেই তো তুমি করবে।'*[১]

সকালে তারা জাদুকর ছিল আর সন্ধ্যায় তারা খেজুরগাছের উপর ঝুলন্ত অবস্থায় শহিদ হয়ে যায়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথাই ধরুন না! মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআ তার ব্যাপারে কবুল হয়ে যায়। নবীজি দুআ

[১] সুরা ত্বহা, আয়াত-ক্রম : ৭২

করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আবু জেহেল ও উমর ইবনুল খাত্তাবের মধ্যে যে আপনার কাছে প্রিয় তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।'[১]

ঈমান আনার পর তিনি (হুদায়বিয়ার সন্ধির পর) গর্জে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কি হকের ওপর নই আর তারা কি বাতিলের উপর নয়?'[২] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেছিলেন, 'অবশ্যই।' তখন তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের এই অপমান মেনে নেব?'

এভাবেই এক মুহূর্তে তিনি কুফরের শীর্ষ চূড়া থেকে ঈমানের শীর্ষ চূড়ায় উঠে আসেন। এই ঈমান অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। এটা মানুষের মনে কী না করতে পারে!

পঞ্চম পাঠ

ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আউলিয়াদের কারামত সত্য।

কেবল গোঁড়ামি বশতই তা অস্বীকার করা যেতে পারে। দ্বীন যদিও আমাদেরকে এই কথা বলে যে, গোটা বিশ্বজগত আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু এর বিপরীতে এটি একটি বাস্তবভিত্তিক ধর্ম। যা আমাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী উপকরণ গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তাই কোনো বিষয় হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে আমরা সেই কারামতকে সত্য বলে বিশ্বাস করব।

আর তা শুধু জনশ্রুতি হলে মানুষের কাছে বর্ণনা করব না। অন্যথায় মানুষকে বোকামির পথে চালিত করা হবে।

সহিহ্ হাদিসের মাধ্যমে বহু আউলিয়া কেরামের কারামত সংঘটিত হওয়ার কথা জানা যায়। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারামাত স্বভাববিরুদ্ধ এক বিষয়; আল্লাহ তাআলা যা নেককার বান্দাদের মাধ্যমে সংঘটিত করে থাকেন।

কারামত শুধু আউলিয়া কেরামের সঙ্গে ঘটে থাকে আর মুজিযা শুধুমাত্র নবীদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ছোট বালকের হাতে সংঘটিত এ ঘটনাটি কারামাত; ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মুজিযার সঙ্গে যার সাদৃশ্য রয়েছে। বালকটি কুষ্ঠ এবং অন্ধ ব্যক্তিকে সুস্থ করে দিত। আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে বহু রোগের চিকিৎসা

[১] সুনানে তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৩৬৮১

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১৭৮৫

করত।

মিশরের নীল নদের ব্যাপারে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কারামত রয়েছে। ইতিহাসবিদগণ তা বর্ণনা করেছেন।

মিশর বিজয়ের হওয়ার পর সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে এসে বলল, 'আমির! আমাদের এই নীল নদের এক রীতি রয়েছে, সেই রীতি পালন ব্যতীত তা প্রবাহিত হয় না।' তিনি বললেন, 'সেটা আবার কী?' তারা বলল, 'এই মাসের তেরো তারিখ হলে আমরা এক কুমারী মেয়ের পিতাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সন্তুষ্ট করে মেয়েকে সবচেয়ে সুন্দর পোশাক এবং অলংকার পরিধান করিয়ে নীল নদে ফেলে দেবো।' আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নাই। ইসলাম জাহেলি যুগের এসব বিষয়কে ধ্বংস করে দেয়।' কিন্তু তারা তিন মাস অপেক্ষা করল। নীলনদ আর প্রবাহিত হলো না। তখন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু নীল নদ এবং মিশরবাসীদের অবস্থা জানিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে চিঠি লিখেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে লিখে পাঠান, 'নিশ্চয়ই তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। ইসলাম পূর্ববর্তী সকল কুসংস্কার বাতিল ঘোষণা করেছে। আমি এই চিঠির মধ্যে তোমার কাছে একটি চিরকুট পাঠালাম, তুমি সেটি নীল নদে রাখবে।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নীল নদের প্রতি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চিঠি খুললেন, তিনি দেখতে পেলেন তাতে লেখা রয়েছে—

আল্লাহর বান্দা উমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে মিসরের নীল নদের প্রতি

পর সমাচার এই যে, যদি তুমি তোমার নির্দেশে প্রবাহিত হয়ে থাক তাহলে তোমার কাছে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত হয়ে থাক তাহলে আমরা তোমাকে প্রবাহিতকারী সত্তার কাছে নিবেদন করছি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠিটি নীল নদে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে দরিয়ায়ে নীলকে প্রবাহিত করে দেন। এমনকি সে রাতেই পুরো নদী পানিতে ভরে ওঠে। তখন থেকে নিয়ে আজ অবধি মিশরের নীল নদ আর কখনোই শুকায়নি।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আরেকটি কারামত হলো—মদিনায় একবার ভূমিকম্প দেখা দেয়, উমর তখন ভূপৃষ্ঠকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে বলেন—'

হে জমিন! থেমে যাও! আমি কি তোমার উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিনি?' সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পন থেমে যায়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আরও একটি কারামত হলো— এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে এসে বলল, 'আমার হাতে এক জখম হয়েছে, উমর জীবিত থাকাবস্থায় আমি তার কাছে একই জখম নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার হাতে তার হাত রেখে সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করেন, এতে আমি সুস্থ হয়ে যাই।' ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তার হাতে আপন হাত রাখেন এবং সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেন। কিন্তু সে সুস্থতা লাভ করল না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার বললেন, 'ফাতিহা তো সেই ফাতেহাই রয়েছে কিন্তু উমরের হাত কোথায়!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'রও কারামত রয়েছে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সময় একবার অনাবৃষ্টির ফলে শষ্যভূমি অনুর্বর হয়ে যায়।

উমর তখন জনগণকে নিয়ে সালাতুল ইসতিসকার জন্য বের হন। সঙ্গে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। তিনি তার বাহু আঁকড়ে ধরেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ আমরা আপনার নবীর চাচার মাধ্যমে আপনার নৈকট্য কামনা করছি।

কেননা আপনি বলেছেন আর আপনার কথাই সত্য—

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

> *প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।*[১]

[১] সুরা কাহাফ, আয়াত-ক্রম : ৮২

'তাদের পিতা সৎ হওয়ার কারণে তাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল। অতএব, হে আল্লাহ, আপনি নবীর মাধ্যমে তার চাচাকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদেরকে আপনার কাছে সুপারিশকারী এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারী হিসেবে নিয়ে এসেছেন।'

এরপর তিনি লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

> *'আর হে আমার কওম! তোমাদের রবের কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তারই দিকে মনোনিবেশ করো; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন।'*[১]

এরপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দুআ করতে থাকেন আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। একসময় মেঘ তৈরি হয়। তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এমনকি বৃষ্টির পানি হাঁটু পর্যন্ত উঠে যায়।

মানুষ তখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে এসে তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে বলতে লাগল, 'হে হারামাইনের পানি সিঞ্চনকারী! আপনার জন্য মুবারকবাদি।' তখন বৃষ্টি থামে।

এ ধরনের আরও বহু ঘটনা রয়েছে। এখানে সেসব ঘটনা উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কারামাতের বিষয়টি চলে এসেছে, তাই এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো। এর চেয়ে বেশি উল্লেখ করা হলে মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে যাবে।

ষষ্ঠ পাঠ

জাহান্নামকে কামনা বাসনা দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে আর জান্নাতকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে। [২]

জান্নাতের রাস্তা অত্যন্ত কঠিন তবে আল্লাহ তাআলা যাকে চান তার জন্য তা

[১] সুরা হুদ, আয়াত-ক্রম : ৫২
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৪৮৭। যারা নিজের খেয়াল-খুশি কামনা-বাসনা পূরণ করার কাজে লিপ্ত হবে তারা জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছবে। নেক আমল করা ও সত্যের পথে দৃঢ় ও অটল থাকার জন্য বহু দুঃখ-কষ্ট-মুসিবত সহ্য করতে হয়। এ পথ পাড়ি দিতে পারলেই জান্নাতে পৌঁছা সম্ভব হবে।

সহজ করে দেন। বিশ্বজগতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার রীতি হলো, এই ধর্মের অনুসারীরা কিছুটা কষ্ট এবং শাস্তি ভোগ করবে।

এর কারণ তাদেরকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অক্ষমতা নয় (নাউজুবিল্লাহ); বরং আল্লাহ্ তাআলা জালেমকে একটু ছাড় দিতে চান এবং মুমিনকে উঁচু করতে চান।

নবুওয়াত লাভের পর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে নিয়ে যান তখন ওয়ারাকা নবীজি বলেন, 'হায়! যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বের করে দেবে, তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম, অবশ্যই আমি তোমাকে সবরকমের সহযোগিতা করতাম।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে!' তিনি বলেন, 'তুমি যে জিনিস নিয়ে এসেছ তা নিয়ে যারাই এসেছে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা হয়েছে।'

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-কে করাত দ্বারা বিদীর্ণ করে ফেলা হয়েছে। এক নবীকে তার সম্প্রদায় পাথর দ্বারা আঘাত করতে করতে রক্ত ঝরিয়ে ফেলেছে। তিনি রক্ত মুছতে মুছতে বলছেন, 'হে আমার রব, আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন। তারা তো জানে না।'

উপরোল্লিখিত ঘটনায় মুমিনরা যে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে এ যেন লম্বা এক শেকলের ছোট্ট আংটা। অর্থাৎ শুরু থেকে চলে আসা ধারাবাহিকতা।

এই দ্বীন তো কেবল রক্ত এবং কুরবানির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিলাল ইবনে রাবাহের সঙ্গে উমাইয়া ইবনে খালাফ যে আচরণ করেছে উদাহরণ হিসেবে সেটিই যথেষ্ট।[১]

বিলাল বলেন, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে হাজির হলাম। তখন তিনি নিজ চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাবাঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা মুশরিকদের পক্ষ থেকে কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিলাম। তাই আমি বললাম, "আপনি কি আল্লাহর কাছে দুআ করবেন না?" তখন

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৮৫২। খাব্বাব বিন আরাতের হাদিসটি যথেষ্ট।

তিনি উঠে বসলেন এবং তার চেহারা লাল হয়ে গেল। বললেন, "তোমাদের পূর্বের ঈমানদারদের মধ্যে কারও কারও শরীরের হাড় পর্যন্ত তামাম গোশত ও শিরা উপশিরাগুলো লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে বের করে ফেলা হতো। কিন্তু এসব নির্যাতনও তাদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ করতে পারত না। তাদের মধ্যে কারও মাথার মাঝখানে করাত রেখে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ নির্যাতনও তাদেরকে দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না।

আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন। তখন একজন উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত একাই সফর করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সে ভয় করবে না এবং তার মেষপালের উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া সে অন্য কিছুর ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তড়িগড়ি করছ।"'

সপ্তম পাঠ

কখনো উস্তাদের তুলনায় ছাত্রের যোগ্যতা বেশি হয়।

আমরা যেসব আলেমের কথা জানি তারা অধিকাংশই এমন উস্তাদের ছাত্র যাঁদেরকে আমরা চিনি না। আপনার ছাত্র আপনার চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হলে একে সমস্যা মনে করবেন না। সে যদি আপনার চেয়েও অধিক খ্যাতি লাভ করে তবে এটা আপনার জন্য একটি সাদাকায়ে জারিয়া। উপরোল্লিখিত ঘটনায় ছাত্র তার উস্তাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়ে ওই ধর্মযাজকের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বালকটি প্রতিবারই নিজ পায়ে হেঁটে বাদশাহর কাছে ফিরে এসেছে। ধর্মযাজক মৃত্যুভয়ে বালককে তার সন্ধান দিতে নিষেধ করেছিলেন, আর বালকটি নিজেকে হত্যা করার পদ্ধতি নিজেই বাদশাহকে বলে দিয়েছিল! ঘটনাতেই আমরা এর কারণ জানতে পেরেছি।

ধর্মযাজক যেহেতু বালককে এই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন তাই তিনি অবশ্যই এর সওয়াব পাবেন।মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের চেয়ে বড় না হতে পারব, যতক্ষণ আমরা অন্যের মাধ্যমে হলেও হকের বিজয়ের আশা না করতে পারব কিংবা অন্যের মাধ্যমে হলেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না চাইব ততক্ষণ পূর্ণতায় পৌঁছুতে পারব না।

নিজের সাওয়াবের অংশের ব্যাপারে ভীত হবেন না। এটা এমন এক দ্বীন যে

দ্বীনের অনুসারী কাউকে ভালো কাজের সন্ধান দিলে সে ওই কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব লাভ করে থাকে।

অষ্টম পাঠ

অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করুন, যদিও তা সামান্য হয়। অন্যের ক্ষুধা নিবারণ করুন, যদিও তা একটুকরো রুটির মাধ্যমে হয়। অন্যের ব্যথা হালকা করুন, যদিও তা সামান্য ঔষধের মূল্যের মাধ্যমে হয়। বিবাদ মিটিয়ে দিন, যদিও তা একটি মিষ্টি-কথার মাধ্যমে হয়।

সরল, সহজ, সাধারণ এবং প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত আপনাকে দাওয়াত থেকে বিমুখ করে দেবে না; বরং এটাই হলো দাওয়াত।

ঘটনায় উল্লিখিত বালকের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা বড় কাজ নিতে চেয়েছেন।

মানুষকে বাদশাহর ইবাদত-উপাসনা থেকে বের করে আল্লাহ্ তাআলার উপাসনার দিকে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। এই বিষয়টি তাকে মানুষ থেকে বিমুখ করে রাখেনি; বরং সম্পূর্ণ উল্টো হয়েছে। সে সবসময় অসুস্থ, প্রয়োজনগ্রস্ত ও দুর্বলদের সঙ্গেই ছিল।

মানুষ যখন আমাদেরকে ভালোবাসবে তখন তারা আমাদের দাওয়াতকেও ভালোবাসবে।

আমরা যদি নিকৃষ্ট নমুনা হই, তাহলে কোন জিনিস তাদেরকে তাদের বর্তমান অবস্থা পরিত্যাগ করে আমাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে?

আচার-আচরণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হোন। লেনদেনে নরম হোন। কথাবার্তায় সুমিষ্ট হোন।

জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন, আপনার পকেটে কুরআনুল কারিম থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার চরিত্রে যেন একটি হলেও আয়াত ফুটে ওঠে।

আলেমকে উপদেশদানকারী নারী

মুয়াত্তা মালেকে এসেছে কাসেম ইবনে মুহাম্মদের সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> *আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কুরাযি আমাকে সান্ত্বনা জানানোর জন্য আসেন। তিনি বলেন, বনি ইসরাইলে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আলেম, ফকিহ, আবেদ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তার এক স্ত্রী ছিল, যার সৌন্দর্যে তিনি আকৃষ্ট ছিলেন। তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একদিন ওই স্ত্রী মারা যায়। এতে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। তিনি তার জন্য আফসোস করতে থাকেন। ঘর বন্ধ করে নির্জনে অবস্থান করতে থাকেন। মানুষজন থেকে আড়ালে চলে যান। কেউ তার কাছে যেতে পারত না। এক নারী তার এ অবস্থার কথা শুনে তার কাছে এল। সে বলল, তার কাছে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আর বিষয়টি সরাসরি সাক্ষাৎ ব্যতীত সম্ভব হবে না। লোকের সমাগম কমে গেলে সে ওই আলেমের দরজায় পড়ে রইল। সে বলল, আমার অবশ্যই তাকে প্রয়োজন। এক ব্যক্তি ওই আলেমকে গিয়ে বলল, 'এখানে একজন নারী এসেছে, সে আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চায়, সরাসরি সাক্ষাৎ ছাড়া নাকি তা সম্ভব না। সবাই চলে গেছে, কিন্তু সে দরজা ছাড়ছে না।' তিনি বললেন, 'তাকে প্রবেশের অনুমতি দাও।' নারীটি তার কাছে প্রবেশ করে বলল, 'আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।' তিনি বললেন, 'কী?' সে বলল, 'আমি আমার প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটি অলংকার ধার নিয়েছিলাম। আমি তা পরিধান করতাম। এরপর তারা আমার কাছে তা ফেরত দেওয়ার সংবাদ পাঠায়। আমি কি তাদেরকে তা ফেরত দিয়ে দেব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' নারীটি বলল, 'এই অলংকার তো আমার কাছে কিছু কাল ছিল!' তিনি বললেন, 'তারা যেহেতু কিছু সময়ের জন্য তোমাকে ধার*

দিয়েছিল তাই তাদের কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক।' নারী বলল, 'আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে জিনিস কিছুদিন ব্যবহারের জন্য ধার দিয়েছেন এরপর তা নিয়ে নিয়েছেন, আপনি সে কারণে আফসোস করছেন! অথচ তিনি সে ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক হকদার!' আল্লাহ তাআলা নারীটির কথার মাধ্যমে ওই আলেমের দৃষ্টি খুলে দেন এবং তাকে উপকৃত করেন।[১]

প্রথম পাঠ

প্রাচীনকালের আরবগণ বলতেন—বিচক্ষণ ব্যক্তিরও ভুল হয়ে থাকে। দানশীল ব্যক্তিরও আবদার থাকে। ভালো মানের ঘোড়াও হোঁচট খায়!

এটি আরবদের এক বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি।

আমরা তো মানুষ। আর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কর্মকাণ্ডের রেলগাড়ি লাইনচ্যুত হতে পারে। যে হাকিম মানুষের সমস্যা সমাধান করেন তিনি নিজেও সমস্যায় নিপতিত হয়ে থাকেন। মুত্তাকি ব্যক্তিরও কখনো গুনাহ হয়ে যায়। দানশীলও কখনো কৃপণতার নিকটবর্তী হয়ে। নম্র ব্যক্তিও কখনো রাগান্বিত হয়। তাই সাময়িক ও সামান্য কোনো ঘটনার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব ও মানবতায় পরিপূর্ণ ইতিহাসকে মুছে ফেলবেন না। ফিকহের একটি মূলনীতি রয়েছে, পানি অনেক বেশি হলে তখন নাপাকি পড়লেও তা বিবেচ্য হয় না। বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা দান-দক্ষিণার দিক থেকে সমুদ্রের মতো। কখনো তাদের দ্বারা কলংকজনক কোনো কাজ প্রকাশ পেলে তাদের সুউজ্জ্বল অতীতকে স্মরণ করুন।

বদরি সাহাবি হাতেব ইবনে আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশদের চিঠি লিখেন। এতে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মক্কা বিজয়ের অভিযানের সংবাদ প্রদান কেরন। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টিকে গোপন রাখতে বলেছিলেন।

এরপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেন। হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু যে নারীকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুঁজে নিয়ে আসার

[১] মুয়াত্তা মালেক, হাদিস-ক্রম : ৮১১

জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু চিঠি লেখার কারণ সম্পর্কে বলেন যে, মক্কায় তার পরিবার-পরিজন রয়েছে। তার প্রবল ধারণা হয়েছিল, যদি চিঠি লেখার মাধ্যমে তিনি মক্কার কুরাইশদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেন তাহলে তারা তার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে।

যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মারাত্মক বিশ্বাঘাতকতা!

এই কারণে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। কিন্তু দয়ালু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভুল কাজের কারণে তার অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাস ভুলে যেতে পারেন না। তাই তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সম্ভবত বদরবাসীদের প্রতি উঁকি দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা যা খুশি করতে পারো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।'[১]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে কিতাবুল্লাহর হাফেজ ছিলেন। কুরআনের উপর তিনি আমল করতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের দিন তিনি মসজিদে রাগান্বিত হয়ে যান। যারা ধারণা করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার সংকল্প করেন। তিনি মনে করেছিলেন, মুসা আলাইহিস সালাম-এর মতোই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাত করতে সাময়িকের জন্য গেছেন। কিন্তু যখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী তিলাওয়াত করলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, মৃত্যুই আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। কোনো জিনিস একে প্রতিহত করতে পারবে না।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

> *'আর মুহাম্মদ তো একজন রাসুলই! তার পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়েছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তোমরা*

[১] সহিহ বুখারি ৩০০৭

> *পশ্চাদপসরণ করবে?'*[১]

পরবর্তী সময়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমার মনে হচ্ছিল যেন ইতিপূর্বে আমি এ আয়াত শোনিইনি।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসা বশতঃ সামান্য সময়ের এ ঘটনার মাধ্যমে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র খেলাফত-পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উজ্জ্বল ইতিহাস মুছে ফেলাটা কি ইনসাফ হবে?

দ্বিতীয় পাঠ

নারীদেরকে তুচ্ছ ভাবা থেকে বিরত থাকুন।

এমনও ক্ষেত্র রয়েছে যে ক্ষেত্রে একজন নারী এক-হাজার পুরুষের সমান। বহু সমস্যা ও সংকটে একজন নারীর মত হাজার পুরুষের মতের চেয়েও অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

নারী তো মানুষ। তার আছে অতি সংবেদনশীল মানসিকতা এবং সুবিশাল হৃদয়। এটা কখনো এই কথার প্রমাণ বহন করে না যে, সে কম বুদ্ধিসম্পন্ন। সংবেদনশীলতা মূলত নারীর প্রশংসা। এটি তার কোনো দোষ নয়।

কে বলেছে যে, সংবেদনশীলতা জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী? যদি আমরা এমনটি বলি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে তার বিপরীত বিষয় বলতে হবে যে, মানুষের কোনো হৃদয় নেই।

এই বিষয়টি যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জুলুম তেমনিভাবে নারী ক্ষেত্রেও।

আল্লাহ তাআলা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় নারীকে অধিক সংবেদনশীলতা দান করেছেন। তিনি তাকে শাসনকার্য ও বিচার-আচারের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেছেন। সেটা হলো বিচারক এবং শাসকদের প্রতিপালন।

তিনি পুরুষদেরকে অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি দেওয়ার কারণ হলো—তাদের জীবনযাপন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বহু স্থানে তাদেরকে কঠোর ও দয়ামায়াহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

সুখময় পরিবার তো সেটি, যে পরিবারের নারীরা পুরুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সংবেদনশীলতার মাধ্যমে নরম করে তোলে। আর পুরুষেরা আপন বিবেক-বুদ্ধির

[১] সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৪

মাধ্যমে নারীর সংবেদনশীল হৃদয়কে শক্ত করে তোলে।

আল্লাহ তাআলার অপার হেকমত হলো, তিনি নারীকে পুরুষের পূর্ণতাদানের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর পুরুষকে নারীর পূর্ণতাদানের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

পুরুষ যখন জানতে পারবে, নারী অনুভূতিপ্রবণ বিষয়ে তার চেয়েও অধিক সংবেদনশীল। তখন তার জন্য নারীর জ্ঞান-বুদ্ধিকে তুচ্ছ ভাবা ঠিক হবে না। আর নারী যখন জানতে পারবে পুরুষ জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে তারচেয়েও পূর্ণ, কেননা তার সংবেদনশীলতার ঘাটতি রয়েছে, তখন যেন সে পুরুষকে নির্দয় মনে না করে। সে যেন বুঝে নেয় যে, কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে দয়া-অনুগ্রহের চেয়ে বিচক্ষণতার প্রয়োজন বেশি।

তৃতীয় পাঠ

নবী-রাসুলগণ ব্যতীত কোনো মানুষ নিষ্পাপ নয়।

নিজ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও অন্তর অনুপাতে মানুষের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পার্থক্য ঘটে থাকে। আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা ফেরেশতা বা নবী নই। মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এ বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতপথ ও চিন্তা-চেতনা রয়েছে। আমি এমন বিষয় দেখে থাকি যা অন্য কেউ দেখে না। আবার সে যা দেখে আমি তা দেখি না। তাই আমার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অন্যকে অপারগ ভাবা উচিত। তেমনিভাবে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও আমাকে অপারগ ভাবা উচিত। কারও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে এমনভাবে নেওয়া যাবে না যে, যেন আমরা মানুষের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

সুফিয়ান ইবনে হুসাইন রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি ইয়াস মুয়াবিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি'র কাছে এক ব্যক্তির দোষের কথা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে কি সিন্ধু হিন্দুস্তান এবং তুর্কে যুদ্ধ করেছ?' আমি বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'হিন্দ, সিন্ধু, তুর্ক রোমানরা তোমার থেকে নিরাপদ থাকতে পারে কিন্তু তোমার মুসলিম ভাই তোমার থেকে নিরাপদ থাকতে পারছে না!'

মানুষ কবে আবার প্রত্যেক বিষয়ে একমত হবে? যদি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এক

ধরনের হতো তাহলে আর ফিকহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ এবং বহুমত তৈরি হতো না! এইসব ইজতিহাদ এবং মতবিরোধে অবশ্যই রহমত রয়েছে।

ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি যদি তার উস্তাদ শাফেয়ি রহমতুল্লাহি আলাইহি'র সঙ্গে সকল বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন তাহলে তিনি কোনো মাজহাবের ইমাম হয়ে যেতেন না। কিন্তু তিনি নিজে উস্তাদকে সম্মান করার পাশাপাশি তার সঙ্গে মতবিরোধ করতেন। আর সর্বক্ষেত্রেই উস্তাদ-ছাত্রের বিষয়টি বিদ্যমান থাকে না। সমসাময়িকদেরকে বিশেষ ক্ষেত্রে অপারগ মনে করাটা আলিমগণের বৈশিষ্ট্য।

আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, খোরাসান থেকে ইলমের ইসহাক ইবনে রাহওয়াই যে পরিমাণ সাঁকো পার হয়ে এসেছেন তা আর কেউ করতে পারেনি। যদিও তিনি আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতবিরোধ রাখেন।

প্রতিটি মানুষেরই কারও না কারও সঙ্গে মতবিরোধ থাকে।

এই তো ইউনুস সাদাফি। সিয়ারু আলামিন নুবালায় এসেছে—তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ি চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। তার সঙ্গে একটি মাসআলা নিয়ে আমার বিতর্ক হয়েছিল, কিন্তু আমরা একমত হতে পারিনি, ভিন্নমত নিয়েই পৃথক হয়ে যাই। এরপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমার হাত ধরে বলেন, 'মাসআলা নিয়ে মতবিরোধ করলেও কি আমরা পরস্পর ভাই হতে পারি না?'

চতুর্থ পাঠ

একটি ঘটনা হাজার ক্লাস থেকে উত্তম।

জেনে রাখুন, কুরআনুল কারিমের এক-তৃতীয়াংশই ঘটনা। এগুলো আনন্দ, ফূর্তি ও উপভোগের জন্য নয়; বরং তা আগ্রহোদ্দীপক পাঠ।

আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে চারিত্রিক পবিত্রতা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যখন দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার আদর্শ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, ফিরআউনের জাদুকরদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যখন দুআ কবুল হওয়ার বিষয়টি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, নুহ ও যাকারিয়া আলাইহিমাস সালাম-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যখন অপরাধীদের ছলচাতুরির বিবরণ পেশ করতে চেয়েছেন, বনি ইসরাইলের গাভীর ঘটনা

উল্লেখ করেছেন। যখন তাঁর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম সম্পর্কে জানাতে চেয়েছেন, বাগানবাসী দুই ব্যক্তির আলোচনা করেছেন। যখন সৎকাজ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর কথা আলোচনা করেছেন। যখন আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদেরকে সাহায্য করার বিষয়টি আলোচনা করতে চেয়েছেন, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে আগুনে নিক্ষেপ করার বিষয়টি এবং মুসা আলাইহিস সালাম-এর সমুদ্রের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যখন কৃপণতার পরিণাম শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, বাগানবাসীদের কথা আলোচনা করেছেন। যখন তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি অবগত করাতে চেয়েছেন, সামুদ, আদ ও লুত সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন। যখন হেকমত শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, লুকমান আলাইহিস সালামের কথা আলোচনা করেছেন। যখন কৃপণতা এবং অহংকারের পরিণাম জানাতে চেয়েছেন, কারুনের কথা আলোচনা করেছেন। যখন ভাই ভাইকে ভালোবাসার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম-এর কথা আলোচনা করেছেন। যখন এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, নিকটাত্মীয়রাও বিদ্বেষী হয়ে যেতে পারে, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইদের কথা আলোচনা করেছেন। যখন হারাম মনোবাসনার কুফল জানাতে চেয়েছেন, জুলাইখার কথা আলোচনা করেছেন। যখন মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে তার কুদরত সম্পর্কে জানাতে চেয়েছেন, উযাইরের গাধা এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর পাখি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যখন দুশমনের মোকাবেলায় তার সেনাবাহিনী নির্বাচনের বিষয়টি জানাতে চেয়েছেন, নুহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন এবং আবরাহার হস্তিবাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যখন দ্বীনের ব্যাপারে সন্তানের অবাধ্যতা সম্পর্কে জানাতে চেয়েছেন, নুহ আলাইহিস সালাম-এর পুত্রের আলোচনা করেছেন। যখন হিংসা সম্পর্কে অবগত করতে চেয়েছেন, হাবিল-কাবিলের কথা আলোচনা করেছেন। আর যখন তিনি আমাদেরকে অবাধ্য ও বোকাদের সম্পর্কে অবগত করতে চেয়েছেন, ফিরআউন ও নমরুদের কথা আলোচনা করেছেন।

মানব-মনে ঘটনা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এটি ছোটদের পূর্বে বড়দের জন্য শিক্ষা, উপদেশ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে। তাই ঘটনার ব্যাপারে বিমুখ হবেন না। একটি ঘটনা হাজারটা উপদেশের সমান হতে পারে।

পঞ্চম পাঠ

পূর্ববর্তীদের ঘটনায় অবশ্যই সান্ত্বনার উপাদান রয়েছে।

যার সন্তান তার অবাধ্যতা করে থাকে সে যেন নুহ আলাইহিস সালাম-এর ঘটনার মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করে।

হে বালক! পিতার পাপাচারের কারণে তুমি পরীক্ষায় নিপতিত? তুমি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করতে পারো।

হে স্বামী আপনি কি পাপাচারী স্ত্রীর মাধ্যমে পরীক্ষার নিপতিত? আপনি লুত আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

হে স্ত্রী! আপনি কি পাপাচারী স্বামীর মাধ্যমে পরীক্ষায় নিপতিত? আপনি ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়ার মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

আপনি কি রোগব্যাধির মাধ্যমে পরীক্ষায় নিপতিত? তাহলে আপনি আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

আপনার কি সন্তান হারিয়ে গেছে? তাহলে আপনি ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

আপনি কি ভাইদের মাধ্যমে জুলুমের শিকার হচ্ছেন? তাহলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

আপনার চাচা কি আপনাকে কষ্ট দেয়? তাহলে আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

আপনার দৃষ্টিতে যদি এই সকল ব্যক্তি সান্ত্বনা লাভের মাধ্যম না হয়, তাহলে জেনে রাখুন, আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো পৃথিবীতে আর কোনো জিনিস নেই।

আল্লাহ তাআলার তাকদিরের ওপর রাগ-অভিমান কখনো আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। বরং তা গুনাহ এবং আজাব নিয়ে আসবে। আবার তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি কখনো আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার নাও করতে পারে। কিন্তু এতে আপনার দ্বিগুণ সওয়াব অর্জনের পাশাপাশি আপনার মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটবে।

সালেহ আলাইহিস সালাম-এর উটনী

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজর উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন বলেন—

لَا تَسْأَلُوا الْآيَاتِ، وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ، فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَقَرُوهَا، وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا، وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا، فَعَقَرُوهَا، فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَهْمَدَ اللهُ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ »، قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « هُوَ أَبُو رِغَالٍ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ

> *'তোমরা নিদর্শন চেয়ো না, সালেহের সম্প্রদায় নিদর্শন চেয়েছিল, সেই নিদর্শনটি (উটনী) এই স্থান থেকে বের হতো এবং এই স্থান দিয়ে চলে যেত। তারা তাদের রবের অবাধ্যতা করে সেটিকে হত্যা করে ফেলেছে। তা একদিন তাদের পানি পান করত আর তারা একদিন তার দুধ পান করত। তারা সেটিকে হত্যা করে ফেলে। তখন এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে গ্রাস করে নেয়। আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে তাদেরকে নির্বাপিত করে দেন। তবে এক ব্যক্তি ব্যতীত, যে হারামে ছিল।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি কে?' তিনি বললেন, 'সে হলো আবু রিগাল। হারাম থেকে বের হওয়ার পর তার সম্প্রদায় যার মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছিল সেও তার মাধ্যমে আক্রান্ত হয়।'*[১]

[১] মুসনাদে আহমাদ (১৪১৬০)

প্রথম পাঠ

বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গেলও বাতিল কখনোই স্থায়িত্ব লাভ করে না।

তাবুক-যদ্ধে যাওয়ার পথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর উপত্যকা অতিক্রম করেন। এই উপত্যকায় সামুদ সম্প্রদায় বসবাস করত। তিনি এর নিকটস্থ এক স্থানে সেনাবাহিনী নিয়ে অবস্থান করেন। সামুদ সম্প্রদায় যেসব কূপ থেকে পানি পান করত সাহাবায়ে কেরাম সেসব কূপের কাছে গেলেন। কূপ থেকে তারা পানি তুললেন এবং রান্নাবান্নার ইনতেজামে ব্যস্ত হয়ে হাঁড়ি-পাতিল চড়ালেন।

রুটি বানানোর জন্য আটা-খামিরা করলেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাদেরকে এসব হাড়ি-পাতিল উল্টে দেওয়ার জন্য বললেন। আটাগুলো উটকে খেতে দিতে বললেন। সাহাবায়ে কেরামকে সামুদ সম্প্রদায়ের পানি পানের স্থানে আসাকে তিনি অপছন্দ করলেন। যে সম্প্রদায়কে আজাব স্পর্শ করেছে তিনি তাদের পানি পান করাটাকেও অপছন্দ করলেন।

তিনি আমাদের শিক্ষা দিলেন, শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন হলেও আমাদের সকলের ধর্ম এক। তিনি আমাদেরকে জীবিতদের পূর্বে মৃত জালেমদের ব্যাপারে দায়মুক্তির বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন।

একটি যুগ হয়তো সত্যকে আড়াল করে রাখতে পারে কিন্তু তাকে স্তিমিত করে দিতে পারে না। বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গেলও বাতিল কখনোই স্থায়িত্ব লাভ করে না। এটি নিছক হাঁড়ি-পাতিল আর রুটির ঘটনা নয়; বরং এটি সর্বপ্রকার জুলুম, অবাধ্যতা ও কুফরি থেকে দায়মুক্তির ঘটনা।

দ্বিতীয় পাঠ

নেয়ামত অস্বীকার করাটা মানুষের স্বভাব।

উটটি যে কূপ থেকে পানি পান করত তিনি তাদেরকে নিয়ে সেখানে যাত্রা করলেন। উট যে রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করত তিনি সে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তাদেরকে জানালেন যে, কূপের পানি উটনী এবং সামুদ সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টিত ছিল।

উটনীটি একদিন কূপ থেকে পানি পান করত আর তারা একদিন কূপ থেকে পানি

পান করত। তারা যেদিন কূপে পানি পানের জন্য আসত না, সেদিন তারা উটনী থেকে এই পরিমাণ দুধ গ্রহণ করত যা তাদের সকল গোত্রের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

কিন্তু নেয়ামত অস্বীকার করাটা মানুষের স্বভাব। এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে, যে নবী মৃত পাথর থেকে জীবিত উটনী বের করে আনলেন তাকে সত্যায়ন করার পরিবর্তে তারা সকলে মিলে উটনীটিকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই কাজের দায়িত্ব নেয় নেতাগোছের এক ব্যক্তি। যার চেহারায় লাল চিহ্ন ছিল।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, 'আমি কি তোমাকে দুই হতভাগা ব্যক্তির সংবাদ দেব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসুল বললেন, 'সে হলো সামুদ সম্প্রদায়ের লাল-চেহারা-বিশিষ্ট ব্যক্তি; যে উটনীকে হত্যা করেছিল।' তারপর তিনি ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এবং যে ব্যক্তি তোমার এই স্থানে আঘাত করবে।'

তৃতীয় পাঠ

তারা উটনীকে হত্যা করে ফেললে আল্লাহ তাআলা নবীকে ওহি প্রেরণ করে জানিয়ে দেন, তিনদিন পর অবশ্যই তাদের উপর আজাব অবতীর্ণ হবে। তৃতীয় দিন এক বিকট আওয়াজে তারা সকলেই মারা যায়। যারা তখন হিজর উপত্যাকায় উপস্থিত ছিল এবং যারা সফর কিংবা কোনো প্রয়োজনে এখান থেকে বের হয়েছিল তারা সকলেই মারা যায়। তবে এক ব্যক্তি ব্যতীত; যার উপনাম ছিল আবু রুগাল। সে তখন কাবায় অবস্থান করছিল। সে শুরুতে ধ্বংস হয়নি। কাবা থেকে বের হওয়ার পর তার সম্প্রদায় যে আজাবে নিপতিত হয়েছিল সেও সেই আজাবে নিপতিত হয়।

চতুর্থ পাঠ

আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের সুযোগ খুঁজতে থাকুন। দিনগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

[১] মুসনাদে আহমদ, হাদিস-ক্রম : ১৮৩২১

অন্য কিছুর তুলনায় মানুষ নিজেদের বিষয়ে উপদেশ শুনতে অধিক আগ্রহী হয়ে থাকে। এটা নবীদের রীতি।

এই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হিজর উপত্যকা অতিক্রমের সময়কে তিনি এখানে ঘটিত বিষয়ের সংবাদ দেওয়ার এক মোক্ষম সময় হিসেবে বেছে নেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সাধারণভাবে শুধু ঘটনা বলে ক্ষান্ত হননি; বরং যেই কূপ থেকে উটনী পানি পান করত সেখানে তাদেরকে নিয়ে গেছেন। তাদেরকে সে উটনীর চলাফেরার রাস্তা দেখিয়েছেন।

তেমনিভাবে আমাদের ক্ষেত্রে বৃষ্টি হলো আল্লাহর রহমত সম্পর্কে আলোচনার সুবর্ণ সুযোগ। মৃত্যু হলো আমাদের সকলের একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব—এই নসিহতের সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করার নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিয়ে এক সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও শুকরিয়া আদায়ের আলোচনা করার জন্য সন্তান জন্মগ্রহণ করার সময়টি একটি সুযোগ। আল্লাহ তাআলার কুদরত, তার ক্রোধ এবং ধৈর্যধারণের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এক সুবর্ণ সুযোগ। বিশ্বজগতের সকল কিছু আল্লাহ তাআলার হাতে, তা আলোচনা করার জন্য চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়টা সুবর্ণ সুযোগ। ইসলামের আনন্দগুলো আনুগত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এই বিষয়টি আলোচনা করার জন্য ঈদ এক সুবর্ণ সুযোগ।

লক্ষ করুন, রোজার পরে ঈদুল ফিতর আসে, হজের পরে আসে ঈদুল আজহা। তাই উপদেশের সময় ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করুন। আনন্দের সময় তাদের কাছে মৃত্যুর আলোচনা করবেন না। কারও মৃত্যুর সময় আনন্দের আলোচনা করবেন না।

আপনি বিচক্ষণ হোন, মনে রাখবেন, প্রতিটি সময় ও স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলাদা আলাদা আলোচনা রয়েছে।

পঞ্চম পাঠ

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর পূর্বেও কাবা ছিল। ফেরেশতারা বহু পূর্বে তা নির্মাণ করেছেন।

ফুকাহায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য ভাষ্য হলো—নুহ আলাইহিস সালাম-এর

প্লাবনের সময় তা ধ্বসে হয়ে গিয়েছিল। এরপর ইমারত না থাকলেও এর ভিত্তিটুকু দৃশ্যমান ছিল। এর উপর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালাম পূর্বের মতো কাবা নির্মাণ করেন।

এটা হলো আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা—

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

> *‘স্মরণ করুন, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। তারা দুআ করেছিলেন, পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।’*[১]

মুসলমানদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই যে, সামুদ সম্প্রদায় ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর পূর্বের জাতি। নুহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবনের পর কাবার যে ভিত্তি বাকি ছিল হতভাগা আবু রুগাল তার নিকটবর্তী থাকায় শুরুতে ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

ষষ্ঠ পাঠ

আল্লাহ তাআলা কাবা শরিফের সম্মানার্থে গোটা সম্প্রদায়কে শাস্তি দিলেও আবু রুগালকে শাস্তি দেননি, অথচ তখন কাবা-ইমারত বিশিষ্ট ছিল না। এর মাধ্যমে আমরা কাবা শরিফের সম্মান এবং তাতে অবস্থানকারীর মর্যাদার বিষয়টি বুঝতে পারি। একজন হতভাগা যখন তাতে অবস্থানের কারণে নিরাপদ থাকতে পারে, তাহলে একজন মুমিন তো অবশ্যই নিরাপদ থাকবে।

বর্তমানে আমাদের জন্য তাকে নিরাপদ রাখা আবশ্যক। এখানে নারীদের সংখ্যা অনেক হলেও এটি উত্তেজিত হওয়ার স্থান নয়।

এক তাওবাকারী বলেছিল—আমার তাওবার কারণ হলো কাবায় এসে আমি এক নারীর প্রতি উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম, তখন সে আমাকে বলল, ‘আমরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে এখানে এসেছি নিজেদের গুনাহ ও পাপাচার ধুয়ে মুছে সাফ করার জন্য; কিন্তু তুমি তোমার গুনাহ কোথায় ধৌত করবে?’

[১] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ১২৭

এটা ভালো কাজ করে প্রসিদ্ধি লাভের জায়গা নয়। বাতিল কাজ তো আরও দূরের বিষয়। কাবায় সুন্দরী নারীরা গেলেও এটি প্রেমপ্রীতির স্থান নয়। এক্ষেত্রে একটি চমৎকার বিষয় উল্লেখ করা হয়। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ উমাইয়া-কবি উমর ইবনে আবু রবিআর সঙ্গে ঘটেছিল।

হজের উদ্দেশ্যে এক সুন্দরী নারী মক্কায় আসে। সে কংকর নিক্ষেপের জন্য গেলে উমর ইবনে আবু রবিআ তার মাধ্যমে ফেতনায় পড়ে যায়। সে নিকটে গেলে নারীটি তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। দ্বিতীয় রাতে যখন সে ওই নারীর সামনে যায় তখন নারীটি চিৎকার করে বলে ওঠে, 'নির্বোধ কোথাকার! আমার থেকে দূরে সরে যাও। কেননা আমি আল্লাহর হারামে রয়েছি।' তৃতীয় রাতে ওই নারী আশংকা করে যে দুশ্চরিত্র পুরুষ তার কাছে আসতে পারে। তাই সে তার ভাইকে বলে, 'আমার সঙ্গে তুমি চলো। আমাকে হজের কাজগুলো দেখিয়ে দেবে।' এরপর উমর ইবনে আবু রবিআ নারীটির সঙ্গে তার ভাইকে দেখে আর সামনে আসেনি। খলিফা আবু জাফর মনসুর ঘটনাটি শুনে বলেন, 'হায়, যদি কুরায়েশের কোনো যুবতী এ ঘটনাটি না শুনতে পেত!'

কাবা শরিফ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মেটানো এবং রক্তপাতের জায়গা নয়। যেমনটা রক্তপিপাসু হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে করেছিল।

সংক্ষেপে ঘটনাটির বিবরণ এরকম—

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া যখন তার পিতার কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। এরপর একসময় ইয়াজিদ মারা যায়। তার ছেলেরও মৃত্যু হয়। তখন মারওয়ান ইবনে হাকাম শাসন ক্ষমতা লাভ করে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন হিজায, ইয়ামান, খোরাসান এবং ইরাকের কিছু অংশ শাসন করতেন। মারওয়ান ইবনে হাকামের মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুল মালিক স্থলাভিষিক্ত হয়। সে তখন শামবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের মধ্যে কে আছে যে ইবনে যুবায়েরের জন্য যথেষ্ট হবে?' হাজ্জাজ বলে, 'আমিরুল মুমিনীন! আমি।' এরপর হাজ্জাজ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাবায় প্রায় সাত মাস অবরুদ্ধ করে রেখে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। কাবা শরিফে সে মিনজানিক দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে। এতে লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-

কে ছেড়ে চলে যায়। তিনি তখন তার মা আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কাছে যান। তাকে বলেন, 'আম্মা, মানুষ আমাকে অপদস্থ করেছে। এমনকি আমার পরিবার-পরিজনের লোকজনও। এখন শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোক অবশিষ্ট আছে। এ পরিস্থিতিতে আপনার মতামত কী?'

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'বেটা, তুমি নিজের ব্যাপারে ভালো জানো। যদি তুমি মনে করো যে, তুমি হকের ওপর আছ তাহলে হকের ওপরই থাকো। তোমার সঙ্গী তাহলে হকের ওপরই নিহত হয়েছে। আর যদি তুমি দুনিয়ার আশায় এমনটি করে থাক তাহলে তুমি কতই-না নিকৃষ্ট! নিজেকেও ধ্বংস করলে তোমার সাথিদেরও ধ্বংস করলে। আর যদি তুমি বলো আমি হকের ওপর রয়েছি কিন্তু সাথি-সঙ্গীরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে এটি কোনো স্বাধীন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। তারা তোমাকে কতদিন দুনিয়ায় চিরস্থায়ী করে রাখবে? মৃত্যুই তোমার জন্য উত্তম।'

তিনি তখন বললেন, 'আম্মাজান, আমি আশংকা করি যে তারা আমাকে হত্যা করে আমার অঙ্গপ্রতঙ্গ বিকৃত করবে।' মা বললেন, 'বকরি জবাইয়ের পর তার চামড়া ছিলে ফেললে তাতে কোনো সমস্যা হয় না।'

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবার তার মাকে বললেন, 'আমি এতদিন পর্যন্ত এই বিষয়ের প্রতিই মানুষকে আহ্বান করে আসছি। আমি দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিনি আর দুনিয়ার জন্যও বের হইনি।

আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বিষয়ের মানহানি করেছে, একমাত্র আল্লাহর স্বার্থে রাগান্বিত হয়েই আমি এ পথে এসেছি। আমি আপনার মতামত শুনতে চাইলাম। আপনার কথার মাধ্যমে আপনি আমার অন্তর্দৃষ্টিই বাড়িয়ে দিলেন। আমি আজই নিহত হয়ে যাব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন।'

তারপর তিনি লড়াই করে শহিদ হয়ে যান। হাজ্জাজ তখন তার মাথা কেটে আবদুল মালিকের কাছে প্রেরণ করে।

তারপর সে লোক পাঠিয়ে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আসতে বলে। তিনি আসতে অস্বীকৃতি জানান।

হাজ্জাজ তখন বলে, 'তাকে জানিয়ে দাও, হয়তো সে নিজেই আমার কাছে আসবে অন্যথায় আমি চুল ধরে তাকে টেনে আনব।' আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু

বললেন, 'আল্লাহর শপথ, সে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চুল ধরে টেনে আনার জন্য কাউকে না পাঠাবে ততক্ষণ আমি তার কাছে যাব না।' তখন হাজ্জাজ নিজে তার কাছে এসে বলে, 'তোমার পুত্র হারামে ধর্মবিরোধী কাজ করেছে।' তিনি বলেন, 'হে হাজ্জাজ! তুমি মিথ্যা বলেছ। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মদিনায় জন্মগ্রহণ-করা সর্বপ্রথম মুসলিম সন্তান ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাধ্যমে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। নিজ হাতে তাকে তাহনিক (খেজুর চিবিয়ে মুখে দেওয়ার কাজ) করেছেন। মুসলমানরা সেদিন তাকবির-ধ্বনিতে মদিনায় আলোড়ন তৈরি করেছিল। আর আজ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা তাকে হত্যা করে আনন্দ করছ! যারা তার হত্যার কারণে আনন্দিত তাদের চেয়ে ঐ সকল লোক কতই-না উত্তম যাঁরা তার জন্মের কারণে আনন্দিত হয়েছিলেন!'

এরপর তিনি হাজ্জাজকে বলেন, 'ওই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মাদকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন! আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, সাকিফ গোত্র থেকে মিথ্যুক ও রক্তপাতকারী বের হবে। মিথ্যুক ব্যক্তিকে আমরা চিনি, সে হলো মুখতার সাকাফি। আর আমি মনে করি রক্তপাতকারী হলে তুমি।'[১]

হাজ্জাজ তখন কালবিলম্ব না করে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কাছ থেকে বের হয়ে যায়। সে আর তার কাছে আসেনি।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলা হলো, আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মসজিদের কোণে রয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর তখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র সঙ্গে সাক্ষাত করে বলেন, 'মৃতদেহ তো কিছুই নয়, আর রুহ তো আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে! আপনি ধৈর্যধারণ করুন।' তিনি বললেন, 'আমার ধৈর্যধারণ করতে সমস্যা কী? ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করে তার মাথা বনি ইসরাইলের এক ব্যভিচারিণীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' এরপর তিনি তার সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেন, 'এই ঘোড়সওয়ারের কি এখনো বীরপুরুষ হওয়ার সময় হয়নি?' হাজ্জাজের কাছে এ সংবাদ পৌঁছুলে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শূলী থেকে নামিয়ে দিতে বলে। তিনি তখন তাকে গোসল করিয়ে দাফন করে দেন।

[১] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭/২৫৯

হাজেরা ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম

এটি বেশ দীর্ঘ একটি ঘটনা। এতে শিক্ষা ও উপদেশের বহু উপকরণ রয়েছে। আমি কিতাবের স্বাভাবিক রীতি থেকে বের হয়ে এই ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছি।

ইতিপূর্বে প্রথমে পুরো ঘটনা উল্লেখ করা হতো এরপর তা থেকে অর্জিত শিক্ষাগুলো উল্লেখ করা হতো। তখন আমার সামান্য বিবেকে এবং স্বল্প বুদ্ধিতে মনে হয়েছিল যে, সেটাই উপকারী হবে। কিন্তু এই ঘটনায় আমার মনে হচ্ছে যে, একসঙ্গে পুরো ঘটনা উল্লেখ না করাটাই ভালো হবে। ঘটনাটি অল্প অল্প করে উল্লেখ করব এবং তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ বের করব। এভাবেই শেষ পর্যন্ত চলবে।

আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। তার ওপরই ভরসা করি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ

> *‘নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে ইসমাইলের মায়ের কাছে থেকে। হাজেরা কোমরবন্ধ লাগাতেন সারাহ’র কাছ থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য।’*[১]

প্রথম পাঠ

কোমরবন্ধ হচ্ছে ঘরের কাজের সময় নারীরা যা শরীরের মাঝখানে বেঁধে রাখে। (একে কাপড় উঁচু থাকে।)

হাদিসের উদ্দেশ্য হলো হাজেরাই সর্বপ্রথম এটি বানিয়েছিলেন। প্রকৃত বিষয় হলো একদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে ছেলে ইসমাইলকে নিয়ে বের হন। সারাকে তখন নেওয়া হয়নি। পদচিহ্ন গোপন রাখার জন্য তিনি কোমরবন্ধ হালকা করে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৩৬৪

দিয়েছিলেন। ফলে তিনি কোথায় যাচ্ছেন সারা তা জানতে পারবেন না। তিনি নিজের ওপর আশংকা করে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

ঘটনার শুরু-অংশের মাধ্যমে আমরা সতীনদের মধ্যকার ঈর্ষা সম্পর্কে বুঝতে পারি। সতীনদের মধ্যকার ঈর্ষা বিশেষত সারার বিষয়টি আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে তার চেষ্টা-মুজাহাদার বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না।

তিনি সেই নারী, যখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর প্রতি কেউ ঈমান আনেনি তিনি তার প্রতি ঈমান এনেছেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাকে নিয়ে মিশর যাচ্ছিলেন, তখন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'তুমি এবং আমি ছাড়া এই ভূ-পৃষ্ঠে আর কোনো মুমিন নেই।' তিনি সেই নারী মিশরের বাদশাহ যাকে নিজের জন্য গ্রহণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজের পবিত্রতার হেফাজত করেছেন। তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার সম্মান রক্ষা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মুমিন-কাফের, ভালো-খারাপ—কেউই তা থেকে মুক্ত নয়। নারীরা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তেমনিভাবে পুরুষেরা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ঈমানের স্তর বিবেচ্য থাকে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে তা প্রোথিত রেখেছেন। এর হেকমত একমাত্র তিনিই জানেন।

ইসলাম মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য আসেনি; বরং তাকে পরিমার্জিত করার জন্য এসেছে। ইসলাম মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকে।

সতীনের প্রতি ঈর্ষা নারীদের স্বভাবজাত বিষয়। ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ *ফাতহুল বারিতে* বলেছেন, নারীদের ঈর্ষাবোধ কারও ক্ষমতাধীন বিষয় নয়। এটি তাদের স্বভাবজাত বিষয়। তারা কখনো এটা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভূতির পর্যায়ে থাকবে আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ এগুলোর হিসাব নেবেন না। কিন্তু যখন এই অনুভূতি থেকে মন্দ কিছু প্রকাশ পাবে তখন এ জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সারা ছিলেন স্বামী-ভক্ত, দীর্ঘকাল তিনি তার স্বামীকে নিয়েই কাটিয়েছেন। এখন সেই স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ায় এবং সেই স্ত্রী থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করায় তিনি তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু নতুন স্ত্রী সন্তান প্রসব করায়

স্বাভাবিকভাবেই স্বামী তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকবেন। এতে স্বভাবতই তার মনে ঈর্ষা জেগে উঠে। আর দশজন স্ত্রীর বেলায় যা ঘটে থাকে তার থেকেও তাই ঘটে যায়।

এটি কোনো আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয় নয়, বরং স্বভাবজাত বিষয়। কোনো নারীই তা থেকে নিরাপদ নয়।

এই তো আয়েশা সিদ্দিকা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা। একদিন নির্ধারিত পালা অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে অবস্থান করছিলেন। তখন সাওদা বিনতে যামআ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সেবিকার মাধ্যমে এক পেয়ালা খাবার প্রেরণ করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পাত্রটিতে আঘাত করে তা ভেঙে ফেলেন। সাহাবিগণ আশেপাশেই উপস্থিত ছিলেন। আর এ পরিস্থিতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য কিছুটা বিব্রতকর ছিল। কিন্তু দয়ালু রাসুল আল্লাহ-প্রদত্ত মানব-স্বভাব সম্পর্কে জানতেন। তিনি শুধু একটা মুচকি হাসি দিয়ে সাহাবিদের বললেন, ‘তোমাদের মা ঈর্ষান্বিত হয়ে গেছে।’ এরপর তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার পেয়ালা ফেরত দিতে বলেন।[১]

ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পাঠ

কাজ অনুযায়ী প্রতিদান হয়ে থাকে। ঈর্ষার কথা আলোচনার পর এখন সারার উন্নত চরিত্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা তাকে মিশরের তৎকালীন বাদশাহ ‘ফারাও’ থেকে রক্ষা করেছেন। বাদশাহ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের নিদর্শন স্বরূপ হাজেরাকে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী হাজেরা সারার বাঁদি হন। কিন্তু মহৎ চরিত্রের অধিকারী সারা তখন পর্যন্ত সন্তানহীনা ছিলেন। তার কোনো সন্তান হতো না। অগত্যা তিনি ব্যক্তিগত সুখের ওপর স্বামীর সুখকে প্রাধান্য দেন। স্বামী সন্তানহীন থেকে যাবেন বিধায় তিনি নিজের আমিত্বকে পরিত্যাগ করেন। তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কাছে হাজেরাকে বিয়ে

[১] মুসনাদে আহমদ, হাদিস-ক্রম : ১৩৭৭; সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৫২২৫

করার প্রস্তাব দেন।

এই ঘরে ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়। আল্লাহ তাআলা তো দয়াময়। ইনসাফ ও কল্যাণের বিনিময়ে তিনি কল্যাণ দান করেন। তিনি সন্তানহীনা সারাকে সুস্থ করে দেন। তার গর্ভে নবী ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়।

ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর বংশ থেকেই পরবর্তীতে বনি ইসরাইলের সকল নবী প্রেরিত হয়েছেন।

তবে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর বিষয়টি ব্যতিক্রম। কারণ, তিনি পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন। অথবা বলা যায়, তিনি মায়ের দিক থেকে ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর বংশধর।

পক্ষান্তরে ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর বংশে শুধু আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি একাই এমন এক নবী, যদি অন্যসকল মানুষ ও নবীকে এক জায়গায় রাখা হয় তাহলে তিনি তাদের সকলকে ছাড়িয়ে যাবেন। সকল নবী ও রাসুলের প্রতি দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচ্য ঘটনায় বলেছেন—

ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيْمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِيْ أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيْمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ أَآللهُ الَّذِيْ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيْمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبَّنَآ إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُوْنَ (إبراهيم : ٣٧)س

'অতঃপর ইবরাহিম হাজেরা ও তার শিশু-ছেলে ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এ অবস্থায় যে, হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কাবাঘর অবস্থিত, ইবরাহিম তাদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে জমজম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বড় গাছের নিচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোনো মানুষ, না ছিল কোনোরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। এ ছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে অল্প পরিমাণ পানি। অতঃপর ফিরে চললেন। তখন ইসমাইলের মা পিছু পিছু এলেন এবং বলতে লাগলেন, "হে ইবরাহিম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোনো সাহায্যকারী আর না আছে কোনো ব্যবস্থা।" তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহিম তার দিকে তাকালেন না। হাজেরা বললেন, "এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" হাজেরা বললেন, "তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।" অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহিমও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন তিনি কাবাঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর দুহাত তুলে এ দুআ করলেন, আর বললেন—

رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

"হে আমাদের রব! আমি নিজের এক সন্তানকে আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় পুনর্বাসন করেছি; হে আমাদের রব! যাতে তারা নামাজ কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রিজিক দান

করুন, যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে।"' [১]

তৃতীয় পাঠ

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার পরিবারের ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনটি বেশি বিস্ময়কর তা নির্ধারণ করতে আপনি হিমশিম খেয়ে যাবেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কথাই ধরুন। যিনি শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত গোটা জীবন আল্লাহর জন্য কষ্ট ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে করতে ব্যয় করে দিয়েছেন। কিশোর অবস্থায় তিনি মূর্তি ভেঙেছেন। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। যুবক অবস্থায় তিনি নমরুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। যার ফলে জন্মভূমি থেকে তাকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এরপর তিনি ফিলিস্তিনে হিজরত করেছেন। মূর্তিপূজারীরা সেখানে বসবাস করত। এখানে এসে তিনি তাদের বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণ কায়েম করেন। সেখান থেকে তিনি মিশর যাত্রা করেন। মিশরের বাদশাহ 'ফারাও' তার স্ত্রীকে হরণ করতে চেয়েছিল।

আবার ভরা যৌবনে তিনি ছিলেন সন্তানহীন। বার্ধক্য পর্যন্ত তিনি এর ওপর ধৈর্যধারণ করেছেন। তারপর সর্বশেষে যখন তাকে এক সন্তান দান করা হয় তখন সেই স্ত্রী এবং কলিজার টুকরো সন্তানকে রেখে আসতে বলা হয়।

কোথায় তাদেরকে রেখে আসবেন? বিশ্বস্ত কারও নিরাপত্তায়? এমন এক উপত্যকায় যেখানে কোনো শস্য এবং পানি নেই। যেখানে কোনো মানুষ বা কাফেলার আগমন ঘটে না। কিন্তু ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এসবের কোনো চিন্তাই করেননি। আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করেছেন, অবশ্যই তার আদেশ এবং ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে।

নাকি আপনি সন্তানকে স্তন্যদানকারিণী মমতাময়ী কোমল হৃদয়ের মায়ের কথা ভেবে আশ্চর্য হবেন? যিনি তার স্বামীর পিছুপিছু চলছেন আর বলছেন, আপনি কি আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন? স্বামী তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। এরপর যখন তিনি জানতে পারলেন এটি আল্লাহর নির্দেশ, তখন তিনি পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, তাহলে আল্লাহ্ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। এটা কোন ঘর! এঁরা কোন মানুষ!

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত-ক্রম : ৩৭; সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৩৬৪

আল্লাহ তাআলা শুরুতে তাদের সঙ্গে রয়েছেন, শেষেও তাদের সঙ্গে রয়েছেন।

চতুর্থ পাঠ

ছেলেকে দূরে রেখে এসে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পিতৃত্বের অনুভূতিতে কোনো সমস্যা অনুভব করেননি। আর হাজেরা স্বামী থেকে দূরে অবস্থান করেও কোনো সমস্যা অনুভব করেননি। এই স্ত্রী একাকিত্বকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কারণ, এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা।

এর দ্বারা বুঝে আসে, আল্লাহর কাছে পৌঁছার রাস্তা কখনো মনের বিপরীত হয়ে থাকে। কিংবা সবসময় তা মনের বিপরীত হয়ে থাকে। যারা নিজেদের মনের উপর বিজয়ী হতে পারে তারাই কেবল আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ভালোবাসা সত্ত্বেও সাদাকাহ করে থাকে, ঘুম পছন্দ করা সত্ত্বেও যারা রাত্রিজাগরণ করে, নারীদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও যারা চারিত্রিক পবিত্রতা অবলম্বন করে, ঘর ও সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যারা ঘুষ পরিত্যাগ করে, গ্রাহক অন্য দোকানে চলে যাওয়া সত্ত্বেও যে নামাজের জন্য দোকান বন্ধ করে রাখে, তারা সকলেই আল্লাহর রাস্তার পথিক। কারণ জান্নাত অপছন্দনীয় বিষয় দ্বারা পূর্ণ এবং জাহান্নাম মনোবাসনা দ্বারা পূর্ণ।

পঞ্চম পাঠ

হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন?' ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলেন না। আচ্ছা আপনি কি ভেবে দেখেছেন, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কেন তার প্রতি এবং সন্তানের প্রতি তাকালেন না? এটি কি অহংকার? নাউজুবিল্লাহ, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বহু উঁচু স্তরের মানুষ। বরং তিনি দুর্বল হয়ে যেতে চাননি। আপন স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে রেখে চলে যাচ্ছেন, এ সময় যেন তার মন বিগলিত না হয়ে যায়, তাদের ভালোবাসায় যেন তিনি আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে অক্ষম হয়ে না পড়েন, এজন্য তিনি এমন করেছিলেন।

বড়রা এমনই হয়ে থাকেন। তারা রবের ভালোবাসায় নিজেদের ভালোবাসাকে বিসর্জন দেন।

দুআ মুমিনের অস্ত্র। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। যার হাতে সকল বিষয়ের ক্ষমতা তার কাছে সবকিছু সোপর্দ করে দেন। তিনি বলেন—

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

> *'অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন।'*[১]

তার দুআর ফলে সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কাবার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। শুধু জুরহুম গোত্র নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিনের অন্তর এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। মক্কার সেই বাইতুল আতিকের প্রতি মানুষের দেহের পূর্বে হৃদয় উৎসর্গিত হয়ে থাকে। উঁচু-নিচু সকল স্থান থেকেই সেখানে মানুষের ঢল নামে। কারণ আল্লাহর খলিলের দুআর তির এর দিকে বিদ্ধ করেছে।একজন মাত্র নারী, তার দেখাশোনার জন্য পুরো একটি গোত্র (জুরহুম গোত্র) চলে আসে।

যে ছেলেকে পিতা একাকী রেখে গেছে এখন তাকে দশ দশ জন মানুষ দেখাশোনা করে।

আপনার সমস্যার ফাইলটি (দুআর মাধ্যমে) আসমানে (আল্লাহর দরবারে) পাঠিয়ে দিন। এ পৃথিবীর সবকিছুই তো উপরের দুটি শব্দের (কুন : হও) মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

হে অসুস্থ ব্যক্তি, ডাক্তার তো আকাশে!

হে দরিদ্র ব্যক্তি, ধনী সত্তা তো আকাশে!

হে দুঃখভারাক্রান্ত ব্যক্তি, বেদনা উপশমকারী তো আকাশে!

হে ভগ্ন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, অন্তর ঠিককারী তো আকাশে!

হে একাকী ব্যক্তি, সান্ত্বনা প্রদানকারী তো আকাশে!

হে নিঃসন্তান! সন্তান প্রদানকারী তো আকাশে!

হে চিন্তিত ব্যক্তি! চিন্তা বিদূরিতকারী তো আকাশে!

মানুষ তো কেবল উপকরণ! তাকদির অনুযায়ী সে উপকরণগুলো কার্যকর হয়ে থাকে। তাই উপকরণের মালিককে ভুলে গিয়ে শুধু উপকরণের প্রতি ধাবিত হবেন

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত-ক্রম : ৩৭

না।

কাজ তো একটা উপকরণ মাত্র, রিজিক প্রদানকারী হলেন আল্লাহ। বিয়ে তো উপকরণ মাত্র, সন্তান প্রদানকারী হলেন আল্লাহ। বন্দুক উপকরণ মাত্র, নিক্ষেপকারী হলেন আল্লাহ। তাই প্রয়োজনে যথাসম্ভব উপকরণ গ্রহণ করুন, কিন্তু উপকরণ যেন আপনাকে উপকরণ-স্রষ্টার কথা ভুলিয়ে না দেয়।

ষষ্ঠ পাঠ

আল্লাহ কি আপনাকে আদেশ করেছেন?

কত মিষ্টি প্রশ্ন...

কত চমৎকার সেই উত্তর... যখন আমরা মানুষকে বলি—আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কত চমৎকার সেই ঈমান... যখন আমরা কেবল আল্লাহ তাআলার নির্দেশের কারণে কোনো কাজ করি।

• আপনি কেন আপনার সৌন্দর্য গোপন রাখবেন? কারণ আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

• আপনি কেন স্বামীর আনুগত্য করবেন? কারণ আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

• আপনি কেন ঘুষ গ্রহণ করেন না? কারণ আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

• আপনি কেন স্ত্রীকে সম্মান করেন? কারণ আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

• আপনি কেন মাতা-পিতার আনুগত্য করেন? কারণ আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা রোজা রাখি, হজ করি, জাকাত দিই—কারণ আল্লাহ আমাদেরকে এগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এর চেয়ে উত্তম জবাবের কি আর কোনো প্রয়োজন আছে?

এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন, যে আল্লাহর আদেশ পালন করে আল্লাহ তাআলা তার দেখাশোনা করেন। যে হারাম থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নেয় আল্লাহ হালাল

থেকে তাকে রিজিক প্রদান করেন।

তুলনাটা একটু কঠিন। বহু মানুষ এটা বুঝতে পারে না। আপনি হালাল উপায়ে যে রিজিক অর্জন করেছেন, যদি ধৈর্যধারণ করতেন তাহলে হালাল উপায়ে তা পেতে পারতেন। আপনি হারাম উপায়ে লোকমা গ্রহণ করেছেন, যদি ধৈর্যধারণ করতেন তাহলে হালাল উপায়ে তা গ্রহণ করতে পারতেন। আপনি হারাম উপায়ে যে মুদ্রা অর্জন করেছেন, যদি ধৈর্যধারণ করতেন তাহলে তা হালাল উপায়েই পেতেন। আপনি হারাম দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে যে স্বাদ পেয়েছেন, ধৈর্যধারণ করলে হালাল উপায়েই সেই স্বাদ পেতেন।

এর পরের ঘটনায় হাদিসে আরও এসেছে—

وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنْ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِيَ ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنْ الْمَاءِ فِيْ سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنْ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَافُوْا

الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللهِ يَبْنِيْ هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوْهُ وَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ

'আর ইসমাইলের মা ইসমাইলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তার শিশু-পুত্রটিও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির দিকে তাকাতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা বর্ণনাকারী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশু-পুত্রের এ করুণ অবস্থার দিকে তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তার অবস্থানের নিকটবর্তী পর্বত 'সাফা'-কে একমাত্র তার নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। অতঃপর তিনি এর উপর উঠে দাড়ালেন এবং ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায়ও কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমনকি যখন তিনি নিচু ময়দানে পৌঁছলেন, তখন নিজের কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মতো ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের কাছে এসে তার উপর উঠে দাড়ালেন। অতঃপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কি না। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এ জন্যই মানুষ এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সাঈ করে থাকে।' 'অতঃপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ। যদি তোমার কাছে কোনো সাহায্যকারী থাকে। যেখানে জমজম কূপ অবস্থিত হঠাৎ সেখানে তিনি একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। হাজেরা'র চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউজের

মতো করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠছিল।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসমাইলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে জমজমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে জমজম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঝরনায় পরিণত হতো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হাজেরা আলাইহিস সালাম পানি পান করলেন, শিশু-পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, "আপনি ধ্বংসের কোনো আশংকা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তার পিতা দুজনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তার আপনজনকে কখনো ধ্বংস করেন না।"'

সপ্তম পাঠ

হাজেরা যদি ভগ্নহৃদয়ে বসেও থাকতেন তাহলেও কেউ তাকে তিরস্কার করত না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুও তার সঙ্গে রয়েছে। এ শিশু সে সময় তার নিঃসঙ্গের সাথি হলেও এখন বোঝা হয়ে গেছে। যখন তার কাছে খেজুর ও পানি ছিল তখন তিনি পানাহার করতেন এবং শিশুকে দুধ পান করাতেন। তখন শিশুটি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কিন্তু এখন ধূ-ধূ মরুভূমি, যাতে কোনো কিছুই নেই, প্রচণ্ড তাপ, পিপাসা, কষ্ট কিছুই যেখানে সহ্য করা যাচ্ছিল না, এর ওপর আবার নতুন এক কষ্ট আপতিত হয়েছে। তা হলো তৃষ্ণায় তার কলিজার টুকরো সন্তান গড়াগড়ি খাচ্ছে। এখন শারীরিক শাস্তির পাশাপাশি মানসিক শাস্তি এসে যোগ হয়েছে।

কিন্তু হাজেরা তো ভেঙে পড়তে জানেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে যান দেখতে থাকেন কেউ আসে কি না। মারওয়া যাওয়ার পথে তিনি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সন্তানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। কিন্তু কোনোকিছুই তাকে শান্ত করতে পারেনি। সে অবিরত গড়াগড়ি খেতে থাকে।

সাঈর ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবক। আলোচ্য হাদিসে যে সাঈর কথা

এসেছে এটা সেই সাঈ নয়; বরং এটা হলো দুনিয়াবি সাঈ (বিপদে পড়ে দৌড়ঝাঁপ চেষ্টা-প্রচেষ্টা)। আপনার পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, কখনো তা হাজেরার চেয়ে কঠিন হবে না। তিনি একাকী মরুভূমিতে দৌড়াতে থাকেন। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, চেষ্টা-প্রচেষ্টা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

নবীর স্ত্রী ও নবীর মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবকিছু মেনে নিয়ে বিকল হয়ে বসে থাকেননি। গালে হাত দিয়ে তিনি কোনো মুজেযা সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষা করেননি।

যখন প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্যায় পড়ে যাবেন তখন অবশ্যই আল্লাহ তাকে সেটা থেকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অক্ষম হয়ে বসে থাকা আর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে।

দুনিয়াটা চেষ্টা-প্রচেষ্টার ঘর। তাই যথাসম্ভব চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, কোনো জিনিস সহজে অর্জিত হয় না। আল্লাহ তাআলা তো মানুষকে তৈরি করেছেন কষ্ট স্বীকার করার জন্য। প্রতিটি কাজেই চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মুজাহাদা ব্যতীত নফস কখনো ঠিক থাকতে পারে না। চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা ব্যতীত কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বহু কষ্ট সহ্য করা ব্যতীত সন্তান কখনো বড় হতে পারে না। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ব্যতীত রিজিক অর্জিত হয় না।

অষ্টম পাঠ

প্রতিটি কাজেই কষ্ট অনুযায়ী প্রতিদান অর্জিত হয়ে থাকে।

এটি স্পষ্ট এক বিষয়। সকল ঘটনায় সর্বক্ষেত্রে তা বারংবার প্রতিভাত হচ্ছে।

যে নারী বলেছিলেন—'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না'—আল্লাহ তাআলা সেই নারীর কাছে এক ফেরেশতা পাঠিয়ে বলেন—'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার নিকটতম বান্দাদের ধ্বংস করেন না।'

মানুষ মিষ্টি কথা শোনার মুখাপেক্ষী থাকে। মানুষ বিপদের সময় সান্ত্বনাদানকারী লোকের মুখাপেক্ষী থাকে। এমন মানুষের অপেক্ষায় নয়, যে তাদের কষ্ট এবং দুশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে দেবে।

আপনি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে সুস্থ হওয়ার আশার বাণী শোনান।

ব্যর্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলুন, ব্যর্থতার পর সফলতার দেখা মেলে। কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখলে অভয় দিন যে, চেষ্টা করলেই প্রাচুর্য আসতে পারে। সন্তান-মারা-যাওয়া ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে তাকে সান্ত্বনা দিন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরও সন্তান মারা গিয়েছিল। কেউ আপনার কাছে তার সন্তানের ব্যাপারে অভিযোগ করলে তাকে নুহ আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা দিন যে, তার সন্তান তার অবাধ্য ছিল। কেউ আপনার কাছে তার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে এলে তাকে লুত আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা দিন। কারণ, লুত আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী তার অবাধ্য ছিল। কেউ আপনার কাছে তার পিতার ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে এলে তাকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সান্ত্বনা দিন। কেউ আপনার কাছে যদি নিঃসন্তান হওয়ার অভিযোগ নিয়ে আসে, তাহলে তাকে বলুন, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর সন্তান ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম এমন সময় জন্মগ্রহণ করেছেন যখন যাকারিয়ার মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন কোনো নারী আপনার কাছে বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ নিয়ে আসে, তাকে সারা আলাইহাস সালাম-এর কথা বলুন।

বেকারকে অভয় দিন যে, অচিরেই কাজের সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে। বিপদে পতিত ব্যক্তিকে এই বলে সান্তনা দিন যে, সমস্যা অবশ্যই সমাধান হয়ে যাবে। নিরাশায়-ভোগা ব্যক্তিকে সংবাদ দিন যে, অবশ্যই মুক্তির উপায় রয়েছে।

বর্তমানে মানুষ এমন মানুষের মুখাপেক্ষী, যে তাদেরকে আদর-সোহাগ দেবে।

মানুষের জীবন তো কষ্ট-যাতনায় পরিপূর্ণ। আর তারা এমনিতেই বিভিন্ন দুর্ভোগে নিপতিত। আপনি তাদের দুর্ভোগ বাড়ানোর চেষ্টা করবেন না। তাদেরকে আশার বাণী শোনান। তাদেরকে বলুন, শিগগির তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ঘোর অমানিশাপূর্ণ অন্ধকার রজনীর পরই দিগন্ত ভেদ করে আলোর আভা ফুটে ওঠে।

নবম পাঠ

গোটা বিশ্বজগত আল্লাহর হাতে। তাই আপনি আল্লাহর সঙ্গে থাকুন, আল্লাহ বিশ্বজগতকে আপনার অনুকূল করে দেবেন।পানির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা চাইলে হাজেরার জন্য পানি বের করে আনতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা

তার জন্য জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে পাঠালেন। কারণ তিনি বিপদ অনুযায়ী সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন। এই সান্ত্বনা কতই-না সুমিষ্ট!

বিশুদ্ধ মত হলো—জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিজ দায়িত্ব পালনের পর মানুষের আকৃতিতে হাজেরার কাছে এসেছিলেন। কারণ হাজেরা যদি তাকে তার প্রকৃত আকৃতিতে দেখতেন তাহলে ভীত হয়ে পড়তেন। উপরন্তু এটি ছিল সান্ত্বনা দেওয়ার স্থান, নিজের শক্তি-সামর্থ প্রদর্শনের নয়।

জিন ও ফেরেশতাদের বিষয়টা মানুষ থেকে ভিন্ন। তারা চাইলে অন্য আকৃতি ধারণ করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো, জিনরা যে আকৃতি ধারণ করে তারা সে আকৃতির অধীন হয়ে যায়। কিন্তু ফেরেশতাগণ অধীন হন না। উদাহরণতঃ কোনো জিন সাপ বা কুকুরের রূপ ধারণ করলে তার শক্তি সুরত-ধরা সে প্রাণীর মতোই হয়ে যায়। এভাবে তার শক্তি কমে যায়। এমতাবস্থায় যদি কেউ সেই কুকুর বা সাপটিকে আঘাত করে মেরে ফেলে তাহলে সে জিন মারা যায়।

কিন্তু ফেরেশতাগষ অন্য আকৃতি ধারণ করলেও নিজেদের শক্তি বিদ্যমান থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে ফেরেশতাদের আকৃতি অত্যন্ত ভয়ানক। এমনকি খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে আপন আকৃতিতে মাত্র দুইবার দেখেছেন। প্রথমবার দেখে তিনি ভয় পেয়ে যান। এ কারণে লুত আলাইহিস সালাম-এর কাছে ইসরাফিল, মিকাইল ও জিবরাইল আলাইহিমুস সালাম-কে আল্লাহ তাআলা মানুষের আকৃতিতে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার কাছে সম্প্রদায়ের ফিতনা-ফাসাদ এবং ফেরেশতাদের ভীতিকে একত্রিত করতে চাননি।

দশম পাঠ

যদি হাজেরা আলাইহাস সালাম মশকে পানি না ভরতেন এবং তাকে চারদিক থেকে বেষ্টন না করতেন তাহলে জমজম একটি প্রবহমান ঝরনা হয়ে যেত। মানুষ যতই মুত্তাকি এবং পরহেজগার হোক সে মানুষই। তাই মুত্তাকিদেরকে ফেরেশতা মনে করে আচরণ করা যাবে না। ভুলে যাবেন না যে তারাও আপনার মতো মানুষ। তারা বিভিন্ন জিনিস অপছন্দ করেন। দুর্বল হয়ে যান। সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীকে আপনি যেমন ভালোবাসেন তারাও বাসেন। তাদের দুনিয়াবি কর্মকাণ্ড দেখে তাদের ঈমানের হিসাব করবেন না।

ঈমান কবে আবার দুনিয়া-পরিপন্থী হয়ে গেল? দুনিয়ার ধন-সম্পদ, রিজিক—কোনোকিছুই জান্নাতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; বরং এগুলোই জান্নাতে পৌঁছার রাস্তা।[১]

হাজেরা আলাইহাস সালাম খুবই পিপাসার্ত ছিলেন। মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাই তিনি স্বভাবগতভাবেই সে পানিকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে দিয়েছেন, তা মশকে ভরে রেখেছেন। বরং এমন না করাটাই ছিল অস্বাভাবিক।

মুমিনের ওপর বিপদ আসে, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলতে চায়, কারণ সে তো মানুষ। আবার যখন সে আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করে তখন সে সবকিছু ভুলে যেতে চায়, কারণ সে তো মানুষ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি হাজেরা তার চারদিক থেকে বেষ্টন না করতেন এবং মশকে পানি না ভরতেন তাহলে তা প্রবহমান ঝরনার রূপ ধারণ করত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বক্তব্যটি সংবাদ-পর্যায়ের; এর মাধ্যমে তার নিন্দা করা হয়নি।

তিনি মুসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারেও এমনটি বলেছেন। মুসা আলাইহিস সালাম যখন কিছু বিষয় শেখার জন্য খিজির আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন খিজির আলাইহিস সালাম তাকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করার শর্তারোপ করেন। কিন্তু খিজির আলাইহিস সালাম নৌকা বিদীর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালাম তাকে প্রশ্ন করা শুরু করে দিলেন। খিজির আলাইহিস সালাম যখন বালকটিকে হত্যা করলেন, মুসা তখন পূর্বের প্রতিশ্রুতি কথা ভুলে গেলেন। তাকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন। তারপর তিনি খিজি আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে নতুন করে ওয়াদাবদ্ধ হলেন যে, খিজির আলাইহিস সালাম কোনো বিষয়ে সংবাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন না। কিন্তু

[১] এর মাধ্যমে বৈরাগ্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। বৈরাগ্যবাদের সারকথা হলো, ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি, স্ত্রী, পরিবার-পরিজন—সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যাওয়া। খ্রিষ্টান যাজকরা এটা উদ্ভাবন করেছিল। খ্রিষ্টধর্মে মৌলিকভাবে এর বৈধতার অনুমতি প্রদান না করা হলেও তাদের এ উদ্ভাবনকে পরবর্তীতে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সুরা হাদিদের ২৭ নম্বর আয়াতে তাদের এ উদ্ভাবন নয়; বরং বৈরাগ্যবাদ অনুযায়ী আমল না করার নিন্দা করা হয়েছে। ইসলাম একে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। (মারাসিলে আবু দাউদ, ২৮৭)—অনুবাদক

খিজির আলাইহিস সালাম যখন দেয়াল উঠিয়ে দিলেন তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করে সে ওয়াদা আর রক্ষা করতে পারলেন না।

আশ্চর্যজনক বিষয় দেখলে মানুষ স্বভাবজাত কারণেই এ ধরনের আচরণ করে থাকে।

মনে রাখতে হবে, মুসা আলাইহিস সালাম নবী, তবে তার পূর্বে তিনি একজন মানুষ। আর বিস্ময়কর বা নতুন কিছু দেখলে জিজ্ঞেস করা মানুষের স্বভাব। মুসা আলাইহিস সালাম যখন তৃতীয়বার প্রশ্ন করেছিলেন, খিজির আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, এটি হলো আমার এবং আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, 'আমার ভাই মুসাকে আল্লাহ রহম করুন,

যদি তিনি ধৈর্যধারণ করতেন তাহলে খিজিরের কাছে-থাকা আল্লাহর আশ্চর্য আশ্চর্য জ্ঞান সম্পর্কে আমরা জানতে পারতাম।' [১]

একাদশ পাঠ

যিনি ধূ-ধূ মরুভূমি থেকে পানি বের করতে পারেন তিনি অবশ্যই মানুষকে বহু সমস্যা-সংকট থেকেও উদ্ধার করতে পারেন। তাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখুন। কোনো জিনিসের ব্যাপারে তিনি অক্ষম নন। সকল সমস্যা-সংকট তার একটি মাত্র শব্দের (কুন) মাধ্যমে সমাধান হয়ে যেতে পারে। আপনার সকল জটিল সমস্যার বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিন।

যিনি পাথর থেকে উটনী বের করতে পারেন তিনি আপনার জন্য মানুষের অন্তর থেকে দয়া-মমতা বের করতে পারেন। যিনি তার নবীর লাঠির আঘাতে সমুদ্রকে বিদীর্ণ করতে পারেন তিনি আপনার জটিল বিষয়গুলো বিদীর্ণ করে সহজ করে দিতে পারেন। যিনি নুহ আলাইহিস সালাম-এর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি আপনার পক্ষ থেকেও প্রতিশোধ নিতে পারেন। যিনি বার্ধক্যে উপনীত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-কে সন্তান দান করেছেন তিনি আপনাকেও সন্তান দিতে পারেন। যিনি ইউশা আলাইহিস সালাম-এর জন্য সূর্যকে থামিয়ে দিয়েছেন তিনি আপনার শত্রুকেও থামিয়ে দিতে পারেন।

[১] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৩৯৮৪

তিনি কুরআনুল কারিমে তার কুদরত বর্ণনা করেছেন, যেন আপনি তার কাছে আশ্রয় নেন। তিনি রাগ-ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছেন, যেন আপনি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। তিনি রহমত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যেন আপনি সে ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। আপনাকে তিনি পথ দেখিয়েছেন, এতে আপনি হয়তো কৃতজ্ঞচিত্ত-শোকরগুজার বান্দা হবেন কিংবা অকৃতজ্ঞ হবেন।

তাই আপনি নিজেই কোনো একটি পক্ষ নির্বাচন করে নিন, কোন দলে যেতে চান?

ঘটনার বিবরণে এর পরে বলা হয়েছে—

وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيْهِ السُّيُوْلُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءٍ فَنَزَلُوْا فِيْ أَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِيْ وَمَا فِيْهِ مَاءٌ فَأَرْسَلُوْا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوْا فَأَخْبَرُوْهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوْا قَالَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوْا أَتَأْذَنِيْنَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوْا وَأَرْسَلُوْا إِلَى أَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوْهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ

> *‘ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি সমতল ভূমি থেকে টিলার মতো উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙে যাচ্ছিল। অতঃপর এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কায় নিচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে*

উড়ছে। তখন তারা বলল, "নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোনো পানি ছিল না।" তখন তারা নিজেদের একজন কি দুজন লোককে সেখানে পাঠাল। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হলো। বর্ণনাকারী বলেন, ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর মা পানির কাছে ছিলেন। তারা তাকে বলল, "আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদের কি অনুমতি দেবেন?" তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না।" তারা "হ্যাঁ" বলে তাদের মত প্রকাশ করল। ইবনে আব্বাস বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাইলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হলো। আর ইসমাইলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবি ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তারা তার সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিয়ে দিল।'

দ্বাদশ পাঠ

তারা ছিল ঘোড়সাওয়ার, তিনি ছিলেন একা। তারা তার কাছে অবস্থানের অনুমতি চায়। তিনি শর্তারোপ করেন, পানির উপর তাদের কোনো অধিকার থাকতে পারবে না। তারা সেটা মেনে নেয়। এটি চরিত্রের এক বিশাল পাঠ।

জুরহুম গোত্রের লোকজন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ধর্মের উপর ছিল না তাই তিনি তাদেরকে চিনতেন না। তারাও তাকে চিনত না। কিন্তু তাদের মধ্যে কার্যত ইসলামের চরিত্র বিদ্যমান ছিল। ঘোড়সওয়ারীরা এক দুর্বল নারীর কাছে

অনুমতি চাচ্ছে! যেগুলো প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকার নয় তারা সেগুলো গ্রহণ করছে না!

অমুসলিমদের এইসব চরিত্রগুণ দেখে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বরং মুসলমানদেরকে চরিত্রহীন দেখাটা আশ্চর্যজনক।

এই ধর্মটাই হলো চরিত্র। যে ব্যক্তি চরিত্রের দিক দিয়ে উৎকর্ষ সাধন করল সে দ্বীনের দিক দিয়ে উৎকর্ষ সাধন করল।[১]

অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হলো আমরা ইসলাম পালন করি কিন্তু তার চারিত্রিক উৎকর্ষকে ধারণ করি না। ঘোড়সাওয়ার আরব, যাদের কোনো ধর্ম নেই, তারা কোনো কিছুই গ্রহণ না করার শর্তে রাজি হয়ে যাওয়াটা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে! অথচ আমরা অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকি! তারা মনে করত শক্তির চেয়ে অধিকার বড়, কিন্তু আমাদের বিষয়টা উল্টো। আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলের অধিকার হরণ করে থাকে।

ত্রয়োদশ পাঠ

মানুষকে এ জন্যই ইনসান বলা হয় যে, সে অন্যের মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং অন্যরাও তার মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এভাবেই পরস্পর ভালোবাসার মাধ্যমে আমাদের মানবতাবোধ বাস্তবায়িত হয়। ক্ষুধার্তরা আমাদের কাছে রুটি পাবে। দুঃখ-ভারাক্রান্ত ব্যক্তি আমাদের কাছে সান্ত্বনা পাবে। দুর্বল ব্যক্তি আমাদের কাছে সাহায্য পাবে।

অন্যদেরকে দেওয়া হলে আমরা নিজেদেরকে বেশি দিই। আসুন, নিজেদেরকে মানবিক মনে করি। কারণ মানবতা মানেই উত্তম চরিত্র এবং উন্নত ব্যবহার। জীব-জন্তু তো কেবল জীব-জন্তুই জন্ম দেয়। কিন্তু মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য অবশ্যই উত্তম চরিত্রগুণের অধিকারী হতে হবে।

আপনার মানবতার পরিমাণ পরখ করে দেখুন।

আপনার মা-বাবা কি আপনার কাছ থেকে এমন সাহায্য লাভ করেন যার ফলে আপনি তাদের ছেলে হওয়ার যোগ্যতা রাখেন? আপনার মধ্যে কি এ ধরনের

[১] রাসূল সা. বলেন, আমি তো কেবল উৎকৃষ্ট চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস-ক্রম : ৮৯৫২(

যোগ্যতা রয়েছে যার ফলে সন্তানরা আপনাকে পিতা বলে ডাকবে? ভাই কি ভাই হিসেবে আপনার কাছ থেকে সাহায্য লাভ করে? স্ত্রী কি আপনাকে বন্ধু এবং প্রেমিক হিসেবে পায়? বোন কি আপনার কাছ থেকে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ পেয়ে থাকে? প্রতিবেশী কি উত্তম ব্যবহার লাভ করে?

এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখুন। এগুলো আপনাকে মানুষ বানাতে পারে। তাই আপনি আপনার মানবতাবোধ খুইয়ে বসবেন না।

চতুর্দশ পাঠ

মাত্র চারজন নবী আরব-বংশদ্ভূত, তারা হলেন হুদ, সালেহ, শুআইব আলাইহিমুস সালাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আর বেড়ে ওঠা এবং প্রতিপালনের দিক থেকে ইসমাইল আলাইহিস সালাম আরব; কিন্তু বংশগতভাবে তিনি আরব নন। কারণ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আরব ছিলেন না। তেমনিভাবে তার ছেলেও।

আমরা সকলেই আদম-সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি।

যদিও আরব থেকে এই ধর্মের সূচনা হয়েছিল কিন্তু এটি শুধু আরবের ধর্ম নয়। বরং সাদা-কালো লাল-হলুদ নির্বিশেষে সকল মানুষের ধর্ম। তাই জাহেলি যুগের অবৈধ পক্ষপাত (বংশ গৌরব) ছেড়ে দিন। বংশ প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে গর্ব করবেন না। হাবশি হওয়া সত্ত্বেও বিলাল জান্নাতি। আবার হাশেমি হওয়া সত্ত্বেও আবু লাহাব জাহান্নামি। সুহাইব রুমি জান্নাতি, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা মাখযুমি জাহান্নামি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আমাদের চাচা আব্বাস, আপনি আমল করুন। হে মুহাম্মদের বেটি ফাতেমা, তুমিও আমল করো। কেয়ামতের দিন মানুষ আমার কাছে তাদের আমলের মাধ্যমে আসতে পারবে না, আর তোমরা বংশ মর্যাদা দিয়ে কাছে আসবে?’

মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আরবের মধ্যে বানিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু এটা অন্যদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করার বিষয় নয়, এমনটা করা প্রাচীনকালের জাহেলি অভ্যাস;

বরং আমাদেরকে (আরবদেরকে) শুকরিয়া আদায় করতে হবে যে, আল্লাহ

তাআলা আমাদের মধ্যে নবুওয়াত দিয়েছেন। আমাদের ধর্ম যেমন অন্য লোকদের জন্য ব্যাপক তেমনিভাবে আমাদের অন্তরগুলোকেও তাদের জন্য বিস্তৃত করে দিতে হবে।

আরবীয় সম্পর্কের তুলনায় আকিদার সম্পর্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি গোত্রের ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব নির্ণিত হতো তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন না। যদি ভূখণ্ডের ভিত্তিতেই সম্পর্ক নির্ধারিত হতো তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করতেন না। যদি পরিবার এবং গোত্রের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব নির্ধারিত হতো তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু লাহাব থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা করতেন না।

কিন্তু আকিদা হলো গোত্র, মাটি এমনকি রক্ত থেকেও দামি।

সাদিকুল আমিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলেন—

وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيْلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِيْ ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ إِلَيْهِ

قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِيْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُوْلِيْ لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلَنِيْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِيْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِيْ وَقَدْ أَمَرَنِيْ أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيْمُ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتْ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوْ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ

قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِيْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيْهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِيْ عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِيْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَيْرٍ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِيْ وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِيْ أَنْ أُمْسِكَكِ

'এরই মধ্যে ইসমাইলের মা হাজেরা ইন্তেকাল করেন। ইসমাইলের বিয়ের পর ইবরাহিম তার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাইলকে পেলেন না। তার স্ত্রীকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, "তিনি আমাদের জীবিকার খুঁজে বেরিয়ে গেছেন।" অতঃপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবনযাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, "আমরা অতি দুরবস্থায়, অতি টানাটানি ও নিদারুণ কষ্টে আছি।" সে ইবরাহিমের কাছে নিজেদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, "তোমার স্বামী বাড়ি এলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বোলো, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়।" অতঃপর যখন ইসমাইল বাড়ি এলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল?" স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ, এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি।" ইসমাইল জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি কি তোমাকে কোনো নাসিহত করেছেন?" স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তার সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরও বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন।" ইসমাইল

বললেন, "ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দিই। অতএব তুমি তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও।" এ কথা বলে ইসমাইল তাকে তালাক দিয়ে দেন এবং ঐ লোকদের থেকে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। অতঃপর ইবরাহিম এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। কিছুদিন পর আবার দেখতে এলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাইলের দেখা পেলেন না। পুত্রবধূর কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাকে ইসমাইল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, "তিনি আমাদের খাবারের খুঁজে বেরিয়েছেন।" ইবরাহিম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কেমন আছ?" তিনি তাদের জীবনযাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। সে বলল, "আমরা ভালো এবং স্বচ্ছল অবস্থায় আছি।" সাথে সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইবরাহিম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের প্রধান খাদ্য কী?" সে বলল, "গোশত।" তিনি জানতে চাইলেন, "তোমাদের পানীয় কী?" সে বলল, "পানি।" ইবরাহিম তখন দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দিন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সময় তাদের ওখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সে বিষয়েও তাদের জন্য দুআ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশত ও পানি জীবনযাপনের উপযোগী হতে পারে না। ইবরাহিম বললেন, "তোমার স্বামী যখন ফিরে আসবে, তাকে সালাম বোলো আর আমার পক্ষ থেকে হুকুম কোরো, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে।" অতঃপর ইসমাইল যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, "তোমাদের কাছে কি কেউ এসেছিলেন?" স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ, একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন।" এই বলে সে তার প্রশংসা করল, "তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার কাছে আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাকে জানিয়েছি যে, আমরা ভালো আছি।"

> *ইসমাইল বললেন, "তিনি কি তোমাকে আর কোনো কিছুর জন্য আদেশ করেছেন?" স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ, তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন।" ইসমাইল তখন বললেন, "ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি।"*

পঞ্চদশ পাঠ

কত চমৎকার ইঙ্গিত—তাকে আদেশ দাও, যেন সে তার দরজার চৌকাঠ পাল্টে ফেলে! তাকে বলবে, যেন সে তার দরজার চৌকাঠে বহাল রাখে!

কখনো কখনো স্পষ্টভাবে বলাটা শ্রোতার জন্য কষ্টদায়ক হয়।

যদি তিনি বলতেন, তুমি তাকে আদেশ দেবে, যেন সে তোমাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে বিষয়টি রুক্ষ হয়ে যেত। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তো বহু উঁচুমানের মানুষ। তিনি তাকে ব্যথা দিতে চাননি। বার্তা পৌঁছে দিতে তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

কখনো সুস্পষ্টভাবে বলাটা বক্তার নিজের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন এক বেদুইন নারী এক সরদারের কাছে অভিযোগ করে যে, 'আমার ঘরে ইঁদুরের সংখ্যা কম।' সরদার বললেন, 'সে কত চমৎকার ইঙ্গিতবহ শব্দে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করেছে! তোমরা তার ঘরখানা ঘি ও গোশত দিয়ে পূর্ণ করে দাও।'

তাই ইঙ্গিতবহ কথাবার্তার ক্ষেত্রে আপনাকে অত্যন্ত সুক্ষদর্শী হতে হবে।

ষোড়শ পাঠ

আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে কোনো কিছু দান করেন তখন সেটাই দান করেন যেটা অন্যের নয়। যখন তিনি আপনাকে বঞ্চিত করেন তখন যেটা আপনার জন্য নয় তা থেকে তিনি বঞ্চিত করেন।যখন আপনাকে দান করা হয় তখন কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। আর যখন আপনি বঞ্চিত হন তখন ধৈর্যধারণ করুন।

সেই সত্তা মহান, যাঁর দান করাটাও হেকমত, দান না করাটাও হেকমত।

ধৈর্যধারণ এবং শুকরিয়া আদায় উভয়টিই মনের ইবাদত। এতে দেহের কোনো ভূমিকা নেই। এর পাশাপাশি শুকরিয়া জ্ঞাপন পুরোটাই হলো চারিত্রিক উৎকর্ষের ব্যাপার।

ধন-সম্পদের শুকরিয়া হলো এর মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্য করা। সুস্থতার শুকরিয়া—দুর্বলকে সাহায্য করা। জ্ঞানের শুকরিয়া—জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে বুদ্ধি দিয়ে সঠিক পথ দেখানো।

মানুষ যদি বুঝত তাহলে তাকদিরের প্রতি তারা বিরক্ত হতো না। কারণ বিরক্তি ও অসন্তোষ তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারে না। উল্টো এর মাধ্যমে মানুষ দুটি বিপদে পতিত হয়। এক. আল্লাহ তাআলার দান থেকে বঞ্চিত হওয়া। দুই. এতে তাকদিরের প্রতি অসন্তোষের গুনাহ হয়।

প্রকৃত প্রাচুর্য হলো অন্তরের প্রাচুর্য, পকেটের নয়।

দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জীবনের মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়।

প্রথম ও দ্বিতীয়—উভয় স্ত্রীর সময়ই ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর উপার্জন একধরনের ছিল। প্রথম স্ত্রীর দৃষ্টি ছিল না-পাওয়া জিনিসের প্রতি, অর্জিত বিষয়ের প্রতি নয়। আর দ্বিতীয় স্ত্রী যা পেয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থেকেছে, যা পায়নি সে ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। এটিই জীবনের সফলতার রহস্য। খুব কম মানুষই তা বুঝতে পারে।

অকৃতজ্ঞদের সঙ্গে ওঠাবসা করার চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ওঠাবসা করার চেয়ে সুমিষ্ট আর কিছু নেই।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার ছেলের ঘরকে ধ্বংস করে দিতে চাননি; বরং তিনি তার কল্যাণ চেয়েছেন।

সপ্তদশ পাঠ

আমাদেরকে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু নিছক পিতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা কি কল্যাণকর কাজ? আর সে নির্দেশ অমান্য করা কি অবাধ্যতা? কিছুতেই নয়। কারণ সকল পিতাই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নয়। আবার সকল সন্তানও ইসমাইল আলাইহিস

সালাম নয়।

ছেলে নিজেই নিজের জীবনপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। কারণ সে নিজের সম্পর্কে অধিক অবগত। কখনো কখনো সমস্যা নিয়ে জীবনযাপন করাটাই সমাধান। আর সমাধান বের করতে গেলে কখনো কখনো পূর্বের চেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয়। কখনো কখনো মাতা-পিতার দৃষ্টিভঙ্গিও ভুল হতে পারে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলেন—

ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيْلُ يَبْرِيْ نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيْلُ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ بِأَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِيْنُنِيْ قَالَ وَأُعِيْنُكَ قَالَ فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيْلُ يَأْتِيْ بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيْمُ يَبْنِيْ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِيْ وَإِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلَانِ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ } (البقرة : ١٢٧) قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُوْرَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوْلَانِ { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ } (البقرة : ١٢٧)

‘অতঃপর ইবরাহিম এদের থেকে দূরে রইলেন, যতদিন আল্লাহ চাইলেন। কিছুদিন পর তিনি আবার এলেন। (দেখতে পেলেন) জমজম কূপের নিকটস্থ এক বিরাট গাছের নিচে বসে ইসমাইল তার একটি তির মেরামত করছেন। পিতাকে দেখতে পেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পিতার দিকে এগিয়ে এলেন। অতঃপর একজন বাবা তার ছেলের সঙ্গে, একজন ছেলে তার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেমন করে থাকে তারা উভয়ে তাই করলেন। ইবরাহিম বললেন, “হে ইসমাইল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাইল বললেন, “আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তাই করুন।” ইবরাহিম বললেন, “তুমি কি আমাকে

> *সাহায্য করবে?” ইসমাইল বললেন, “আমি আপনাকে সাহায্য করব।” ইবরাহিম বললেন, “আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।” এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করে বললেন, “ঘর বানাতে হবে এর চারপাশ ঘেরাও দিয়ে।” এরপর তারা উভয়ে কাবাঘরের দেয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাইল পাথর আনতেন আর ইবরাহিম নির্মাণ করতেন। একসময় যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, ইসমাইল (মাকামে ইবরাহিম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহিমের জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাইল তাকে পাথর যোগান দিতে থাকলেন। সেসময় তারা উভয়ে এ দুআ করলেন—*

رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ اَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

> *“হে আমাদের রব! আমাদের তরফ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।”[১]*

‘এরপর তারা উভয়ে আবার কাবাঘর তৈরি করতে থাকেন এবং কাবা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এ দুআ করতে থাকেন—

رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ اَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

> *“হে আমাদের রব! আমাদের তরফ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।”’[২]*

অষ্টাদশ পাঠ

ইসমাইল আলাইহিস সালাম অত্যন্ত দক্ষ তিরন্দাজ এবং দক্ষ শিকারি ছিলেন।

এ ঘটনায়ও এর বিবরণ রয়েছে। বলা হয়েছে, তার পিতা এসে তাকে তির মেরামত করতে দেখেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের একদিন বলেন—

[১] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম: ১২৭
[২] সুরা বাকারা, আয়াত-ক্রম: ১২৭

ارْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

> *'হে ইসমাইলের সন্তানেরা! তোমরা তির-চালনা শিখো, কারণ তোমাদের পিতা তিরন্দাজ ছিলেন।'*[১]

এই ধর্ম যেহেতু জিহাদ ও বিজয়ের ধর্ম তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তির-চালনা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

তিনি বলেছেন—

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

> *'জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপে, শক্তি হলো নিক্ষেপে, শক্তি হলো নিক্ষেপে।'*[২]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে, তোমরা সন্তানদেরকে সাঁতার কাটা, তির-চালনা এবং ঘোড়ায় আরোহণ শিক্ষা দাও।

উনবিংশ পাঠ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

> *নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়াত ও বরকত।*[৩]

আয়াতে উল্লিখিত 'بَكَّةَ' (বাক্কা)-এর ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। একটি হলো মক্কা এবং বাক্কার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ আরবদের ভাষায় 'বা' এবং 'মিম' অক্ষর-দুটি একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন 'ضربة لازم' (দারবাতুন লাযিমুন) আর 'ضربة لازب' (দারবাতুন লাযিবুন) উভয়টি একই অর্থ (শক্তভাবে আঘাত করা) প্রদান করে থাকে।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৩৭৩
[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১৯১৭
[৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৯৬

দ্বিতীয় মত হলো, দীর্ঘ অধ্যয়নের পর এটাই আমার কাছে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মনে হয় যে, বাক্কা হলো বাইতুল্লাহর নাম আর মক্কা হলো জনপদের নাম। তখন বাক্কা মক্কার ক্ষুদ্র অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেন, 'সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে?' তিনি বলেন, 'মাসজিদুল হারাম।' এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এরপর কোনটি?' তিনি বলেন, 'মাসজিদুল আকসা।' আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, 'দুটির মধ্যে কত বছরের ব্যবধান?' তিনি বলেন, '৪০ বছর।'[১]

পূর্বে এ বিষয়ক আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, ফেরেশতারা আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্য কাবা নির্মাণ করেছিলেন। নুহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবনের সময় তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ইবরাহিম তখন এর ইমারত পুনরায় নির্মাণ করেন।

বিংশ পাঠ

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যে আকৃতিতে কাবা নির্মাণ করেছিলেন বর্তমানে কি তা সে অবস্থায় আছে? উত্তর হলো—না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, 'কাবার দুটি দরজা ছিল। যদি কুরাইশরা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ না করে থাকত তাহলে আমি তা সংস্কার করতাম, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সময় যেমন ছিল আমি তাকে সেভাবে নির্মাণ করতাম।'[২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময় কাবার দুটি দরজা ছিল এবং হাতিম (একে হিজরে ইসমাইলও বলা হয়। ইসমাইল আলাইহিস সালাম তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন) তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সময় এটা যেমন ছিল কুরাইশদের সময় তেমন না থাকার কারণ হলো, কুরাইশদের সময় প্লাবনে এটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের হালাল সম্পদ একত্রিত করে তা পুনঃনির্মাণ করে। কিন্তু তখন তাদের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংকুলান ছিল না, তাই হাতিমকে বাইরে রেখে

[১] সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস-ক্রম : ১৫৯৮
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম :১২৬

দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের শাসনকালে এটিকে পুনঃনির্মাণ করেন। কুরাইশদের সময় এটি যেমন ছিল তাকে সেভাবে নিয়ে আসেন।

আবু জাফর মানসুর নিজের খেলাফতকালে এটিকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সময় যেমন ছিল সেভাবে নির্মাণ করতে চান। তবে এর আগে তিনি ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি'র সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আপনি এটা করবেন না। অন্যথায় এটা রাজা-বাদশাহদের খেলনার পাত্র হয়ে যাবে। যখনই নতুন কোনো বাদশাহ আসবে এটিকে ভেঙে পুনঃনির্মাণ করতে চাইবে।' বর্তমানে এটি কুরাইশদের নির্মাণের ওপর বহাল রয়েছে।'[১]

একবিংশ পাঠ

আমরা কাবা শরিফের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করে এর ইতি টানব।

এক. হাজরে আসওয়াদ

ফেরেশতারা জান্নাত থেকে পাথরটি এনেছিলেন। হাদিসে এসেছে এটি বরফের চেয়েও সাদা ছিল। মুশরিকদের গুনাহ একে কালো বানিয়ে ফেলেছে।[২]

---

[১] অবকাঠামোর প্রশ্নে কাবা শরিফে দুবার পরিবর্তন সাধিত হয়। আদম আলাইহিস সালামের পূর্বে ফেরেশতাদের নির্মাণ থেকে নিয়ে কুরাইশদের নির্মাণ পর্যন্ত তা এক অবস্থায় বহাল ছিল। এসময় কাবার মধ্যে আজকের হাতিমও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুরাইশদের সময় অসতর্কতা বশতঃ তাতে আগুন লেগে গেলে দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দেয়। তারা একে নতুনভাবে নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হালাল অর্থের সংকটের কারণে তারা তখন কাবার একটি অংশকে বাইরে রেখে দেয়। বর্তমানে একে হাতিমে কাবা বলা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও নবুওয়াত লাভ করেননি। তার বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। মক্কা বিজয়ের পর তার সামনে কাবাকে পূর্বের মতো নির্মাণের সুযোগ তৈরি হলেও কুরাইশদের সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণের কারণে তা করেননি। পরবর্তী কালে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু নিজ শাসনামলে—৬৫ হিজরিতে একে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইচ্ছানুযায়ী ইবরাহিম আ. যেভাবে নির্মাণ করেছিলেন সেভাবে নির্মাণ করেন। ৭৪ হিজরিতে মারওয়ান বিন আবদুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এ নির্মাণ ভেঙে একে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যায়। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মানসুর ১৩৭ হিজরিতে বাইতুল্লাহ সম্প্রসারণের সময় কাবাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইচ্ছানুযায়ী ইবরাহিম আ.-এর মতো তা নির্মাণ করতে চাইলে ইমাম মালেক রহ. তাকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, অন্যথায় কাবা শরিফ শাসকগোষ্ঠীর খেলনার পাত্র হয়ে যাবে।— অনুবাদক

[২] সুনানে তিরমিযি, হাদিস-ক্রম : ৮৭৭

এখানে একটু থামা প্রয়োজন।

মানুষের গুনাহ যখন জান্নাতের একটি সাদা পাথরকে কালো বানিয়ে দিতে পারে তখন গুনাহ অন্তরের কী অবস্থা করতে পারে! অথচ অন্তর তো জান্নাতের নয়; বরং তা পৃথিবীর!

হাজরে আসওয়াদ বর্তমানে আট টুকরো হয়ে রয়েছে। এর কারণ হলো কারামাতিরা কাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একে চুরি করে নিয়ে যায়। তাদের কাছে এটি ২০ বছর থাকে। এরপর একে নিজ স্থানে নিয়ে আসা হয়। কারামতিরা এক পাপাচারী সম্প্রদায়। তারা কাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। আরাফার আগের দিন হাজিদেরকে হত্যা করে। জমজম কূপে ২০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে দেয়। আবু তাহের কারামতির ওপর প্রতিনিয়ত আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক! কাবার দরজায় ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে সে বলে, 'আমি আল্লাহ, আল্লাহ তো আমি, আমি মানুষকে সৃষ্টি করি এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করি (নাউজুবিল্লাহ)।'

তারা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এতটাই স্পর্ধা দেখিয়েছিল যে, এক কারামতি সেদিন এক আলেমকে বলে তোমাদের আল্লাহ কি বলেননি—

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

> *'আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে।'*[১]

এখন তোমার রব কোথায়? সে আলেম তাকে বলেন, 'আরে আহাম্মক! আল্লাহ তাআলা তো বলতে চেয়েছেন, যে ব্যক্তি কাবায় প্রবেশ করবে তাকে তোমরা নিরাপত্তা দেবে। এটি নির্দেশের পর্যায়ভুক্ত, এটি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয়। তোমরা তো মূর্খ সম্প্রদায়।'

দুই. হাতিমে কাবা

এটা কাবার পাশে অর্ধবৃত্তাকার অংশ। বিধানগত দিক থেকে এটা কাবার অংশ। যে ব্যক্তি শুধু এটা তাওয়াফ করবে তার তাওয়াফের এই চক্করটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ শুধু হাতিমে তাওয়াফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং পুরো কাবার চতুর্পাশে তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যদিও এটি কাবার বাইরে তবুও এটি সবদিক থেকে কাবার ভেতরের হুকুমভুক্ত।

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ৯৭

তিন. মাকামে ইবরাহিম

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এই পাথরটিতে দাঁড়িয়ে কাবা নির্মাণ করতেন। আল্লাহ তাআলা পাথরটিকে তার জন্য নরম বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই এতে তার পায়ের চিহ্ন বসে যায়।

এখানে একটি বিষয় ভাবা প্রয়োজন, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তার অন্তরকে আল্লাহর জন্য নরম করে দিয়েছেন আল্লাহ তখন পাথরকে তার পায়ের জন্য নরম করে দিয়েছেন।

এই মাকামে ইবরাহিম তখন কাবার দেয়ালের পাশেই ছিল। কারণ কাবার দেয়ালের পূর্ণতাদানের জন্য তা রাখা হয়েছে। তাওয়াফের সুবিধার্থে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ খেলাফতকালে একে দূরে নিয়ে যান।

এরপর এটাকে স্বর্ণ দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়। বর্তমানে এটি সেই অবস্থায় রয়েছে।

মুসা আলাইহিস সালাম ও খিজির আলাইহিস সালাম

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—'একবার মুসা বনি ইসরাইলের মধ্যে বয়ান করার জন্য দাড়ালেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী?" তিনি বললেন, "আমি।" মুসা আলাইহিস সালাম-এর এ উত্তরে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কারণ তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করেননি। আল্লাহ তাকে বললেন, "বরং দুই সমুদ্রের সংযোগ স্থলে আমার একজন বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী।" মুসা আলাইহিস সালাম আরজ করলেন, "হে আমার রব! আমি তার সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ করব?" আল্লাহ বললেন, "তুমি একটি মাছ ধরো এবং তা একটি থলের মধ্যে ভরে রাখো। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন।"

'অতঃপর মুসা একটি মাছ ধরলেন এবং থলের মধ্যে ভরে রাখলেন। তিনি এবং তার সাথি ইউশা ইবনে নুন চলতে লাগলেন। একসময় তারা দুজন একটি পাথরের কাছে এসে পৌঁছে তার উপরে মাথা রেখে বিশ্রাম করলেন। মুসা ঘুমিয়ে পড়লেন। আর মাছটি নড়াচড়া করতে করতে থলে থেকে বের হয়ে নদীতে চলে গেল। সে নদীতে সুড়ঙ্গ আকারে নিজের রাস্তা তৈরি করে নিল। অতঃপর তারা উভয়ে অবশিষ্ট রাত এবং পুরো দিন পথ চললেন। শেষে যখন পরের দিন ভোর হলো মুসা তার সাথিকে বললেন, "আমাদের সকালের খাবার আনো। আমরা এ সফরে খুব ক্লান্তিবোধ করছি।" সঙ্গী (ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, "আপনি কি লক্ষ করেছেন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম (মাছটি তখন চলে গিয়েছিল), তা চলে যাবার কথা আপনাকে জানাতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আসলে আপনার কাছে তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে মাছটি নদীতে নিজের রাস্তা করে নিয়েছে।" মুসা বললেন, "ওটাই তো সেই স্থান যা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।" অতঃপর উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন ধরে পেছনের দিকে ফিরে

চললেন, এবং একটা সময় সেই পাথরটির কাছে এসে পৌঁছলেন। তারা দেখলেন, সেখানে জনৈক ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত হয়ে আছেন।

'মুসা তাকে সালাম করলেন। তিনি বললেন, "এখানে সালাম কী করে এলো?" তিনি বললেন, "আমি মুসা।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি বনি ইসরাইলের মুসা?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনাকে যে মহাজ্ঞান দান করা হয়েছে তা শেখার জন্য এসেছি।" তিনি বললেন, "হে মুসা! আমার কাছে আল্লাহর দেয়া কিছু জ্ঞান আছে যা আল্লাহ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনি তা জানেন না। আর আপনারও আল্লাহ-প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে, যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন, আমি তা জানি না।"

'মুসা বললেন, "আমি কি আপনার সাথি হতে পারি?" খিজির বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্য রাখবেন কী করে, যার রহস্য আপনার জানা নেই!" মুসা বললেন, "ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে একজন ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোনো আদেশই অমান্য করব না।"

'অতঃপর তারা দুজন রওনা হয়ে নদীর তীর ঘেঁষে চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। নৌকাওয়ালারা খিজিরকে চিনে ফেলল। তারা তাকে সঙ্গীসহ পারিশ্রমিক ছাড়াই নৌকায় তুলে নিল।

'অতঃপর খিযির হঠাৎ কুঠার নিয়ে নৌকার একটি তক্তা খুলে ফেললেন। মুসা বললেন, "আপনি এ কী করলেন! তারা আমাদেরকে মজুরি ছাড়া নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি তাদের নৌকার যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ফুটো করে দিলেন! এ তো আপনি একটি গুরুতর কাজ করলেন!"

খিজির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?"

'মুসা বললেন, "আমি যে বিষয়টি ভুলে গেছি, তার জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন না। আর আমার এ ব্যবহারে আমার প্রতি কঠোর হবেন না।" এমন সময় একটি চড়ুইপাখি এসে নৌকাটির এক পাশে বসল এবং একবার কি দুবার নদীর পানিতে ঠোঁট ডুবাল।

'খিজির বললেন, "হে মুসা! আমার এবং তোমার জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর জ্ঞান থেকে ততটুকুও কমেনি যতটুকু এ পাখিটি তার ঠোঁটের দ্বারা নদীর পানি হ্রাস করেছে।"'অতঃপর নদী পার হয়ে তারা একটি বালকের পাশ দিয়ে গেলেন। সে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলছিল। খিজির তার মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে তার ঘাড় আলাদা করে ফেললেন। এতে মুসা তাকে বললেন, "আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে বিনা অপরাধে হত্যা করলেন! নিশ্চয়ই আপনি একটি অন্যায় কাজ করলেন।" খিজির বললেন, "আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না?"

মুসা বললেন, "এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। কারণ আমার উজর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে।"

'তারা চলতে লাগলেন, একসময় তারা এক জনপদে এসে উপনীত হলেন। গ্রামবাসীদের কাছে তারা খাবার চাইলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানেই একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তা একদিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। খিজির নিজ হাতে দেয়ালটি সোজা করে দিলেন।

'মুসা বললেন, "তারা এমন মানুষ—আমরা তাদের কাছে আসলাম, তারা আমাদেরকে না খাবার দিল, না আমাদের আতিথেয়তা করল আর আপনি এদের দেয়াল সোজা করতে গেলেন! আপনি ইচ্ছা করলে এর বদলে মজুরি গ্রহণ করতে পারতেন।"

'খিজির বললেন, "এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হলো। তবে এখনই আমি আপনাকে জ্ঞাত করছি সেসব কথার রহস্য, যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি।"'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর সুরা কাহফের পরবর্তী আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন—

ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

> *'আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হলো তার*

ব্যাখ্যা।'[১]

উল্লিখিত এই আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যদি ধৈর্য ধরতেন, তাহলে তাদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে আরও অনেক ঘটনা জানানো হতো।'[২]

প্রথম পাঠ

ঘটনা থেকে প্রাসঙ্গিকভাবেই খিজির আলাইহিস সালাম-এর পরিচয়ের বিষয়টি চলে আসে।

কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খিজির নামে একজন ব্যক্তি রয়েছেন। এ ধরনের ব্যক্তি থাকার ব্যাপারে ঈমান আনা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে বহু হাদিস এবং বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তার জীবিত থাকার ব্যাপারে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার একটিও বিশুদ্ধ নয়।

ইবনুল কাইয়িম জাওযি রহমতুল্লাহি আলাইহি খিজির আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত মত উদ্ধৃত করে বলেন—'যেসব হাদিসে খিজির আলাইহিস সালাম জীবিত থাকার কথা উল্লেখ হয়েছে সবগুলোই মিথ্যা। তার জীবিত থাকার ব্যাপারে একটি হাদিসও সহিহ নয়।'[৩]

এক হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ছিলেন। তখন তিনি পেছন থেকে কথার আওয়াজ পান। সাহাবিরা সেখানে খিজির আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পান। হাদিসটি জাল।

আরেক হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, খিজির আলাইহিস সালাম এবং ইলিয়াস আলাইহিস সালাম প্রতিবছর সাক্ষাৎ করেন। এটিও বানোয়াট।

আরেক হাদিসে বলা হয়, প্রতিবছর আরাফার ময়দানে জিবরাইল, মিকাইল এবং খিজির আলাইহিস সালাম একত্রিত হন। এটিও জাল হাদিস।

[১] সুরা কাহাফ, আয়াত-ক্রম : ৮২
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪০; সহিহ মুসলিম হাদিস-ক্রম : ২৩৮০
[৩] আল মানারুল মুনিফ, ৬৭। তবে ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ সহিহ হাদিস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত না হলেও আলেমগণের এক জামাআতের মতে তিনি জীবিত রয়েছেন। -আল-মাতালিবুল আলিয়া, ১৭/৫৩০

আমরা শুধু এতটুকুই জানি যে, তিনি একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বহু জ্ঞান দান করেছেন।

তার জন্ম ও বংশ সম্পর্কে বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে যা বলা হয় তা সম্পূর্ণ মনগড়া এবং অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার নামান্তর। বরং এগুলো হাদিস এবং বিবেকের পরিপন্থী বিষয়। যেমন কেউ বলেছে যে, তিনি আদমের ঔরসজাত সন্তান। কেউ বলেছে, আদমের পুত্র ও কাবিলের সন্তান। আবার কেউ বলেছে, তিনি শিস আলাইহিস সালাম-এর সন্তান। কেউ বলেছে, তিনি পারসিক। এগুলোর কোনো কথাই সহিহ সনদে প্রমাণিত নয়।

এইসব জ্ঞান যেমন কোনো উপকারী নয় তেমনই তার সম্পর্কে না-জানাটাও ক্ষতিকর নয়। যদি আমাদের এই সকল জ্ঞানের প্রয়োজন হতো তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এর সংবাদ প্রদান করতেন।

কোনো কোনো ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে এই পর্যন্ত বলেছে যে, তিনি আজও পর্যন্ত জীবিত। আল্লাহ তাকে রিজিক প্রদান করে থাকেন। এমনকি তিনি দাজ্জালকে হত্যা করার বিষয়টি দেখা পর্যন্ত জীবিত থাকবেন।

ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'খিজির আলাইহিস সালাম এবং ইলিয়াস আলাইহিস সালাম কি জীবিত?' তিনি বলেন, 'এমনটা হতে পারে না। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বর্তমানে যারা ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে একশত বছর পর তাদের কেউই অবশিষ্ট থাকবে না।'[১]

ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কুরআন, হাদিস, আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং বিবেক—সবগুলো এ কথার প্রমাণ করে যে, খিজির আলাইহিস সালাম জীবিত নন। যৌক্তিকভাবেও বোঝা যায় যে, তিনি এখন জীবিত নন। যেমন কেউ কেউ বলেছে যে, তিনি নাকি আদমের ঔরসজাত সন্তান! তাদের কথা অনুযায়ী এখন তার বয়স হাজার বছর হওয়ার কথা। অথচ এটা অসম্ভব। কেউ বলেছে, তিনি আদমের সন্তান ছিলেন। এক সময় তিনি যুলকারনাইনের উজির ছিলেন। এটাও অসম্ভব বিষয়। কারণ সে-ক্ষেত্রে তিনি তার পিতা আদম আলাইহিস সালাম-এর মতো ষাট হাতের বিশাল দীর্ঘদেহী হবেন। আর যুলকারনাইন একজন

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬০১

সাধারণ আকৃতির লোক ছিলেন। তাই বয়স এবং দৈহিক দিক থেকে এটি একটি অগ্রহণযোগ্য মত।

উপরন্তু তিনি নুহ আলাইহিস সালাম-এর পূর্বের লোক হলে তার সঙ্গে তিনি কিশতিতে আরোহণ করতেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সহিহ, এমনকি বানোয়াট বর্ণনাও পাওয়া যায় না। এ ছাড়াও নুহ আলাইহিস সালাম-এর নৌকায় যারা আরোহণ করেনি তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে। শুধু নুহ আলাইহিস সালাম-এর বংশধরগণই পরবর্তীতে বাকি ছিলেন।

কুরআনুল কারিমে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে—

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

> *'এবং তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম।'*[১]

এ ছাড়া যদি তিনি আদম-সন্তান হতেন এবং প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির ধ্বংস লগ্ন পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহলে এটি আল্লাহ তাআলার এক নিদর্শন হতো। কুরআন বা হাদিসে কমপক্ষে এ বিষয়ে আলোচনা থাকত।

পরিশেষে, যদি তিনি জীবিত থাকেন,

তাহলে বর্তমানে আমাদের উম্মতের অবস্থা লক্ষ করুন, সর্বত্র মারামারি-কাটাকাটি হচ্ছে, হত্যাযজ্ঞ চলছে, ইসলামি শরিয়াহ উপেক্ষিত, তার জন্য কি এখন মরুভূমিতে নির্জন স্থানে অবস্থানের তুলনায় জনসম্মুখে উপস্থিত হয়ে জিহাদ করা এবং শরিয়াহ্ আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাটা উত্তম ছিল না? সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল, তিনি আমাদের মতো এক আদম-সন্তান। আদম আলাইহিস সালাম-এর ঔরসজাত নন। তিনি সাধারণভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। এর বিপরীত মতের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগের কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন।

যদি মুসা আলাইহিস সালাম-এর পরও তিনি জীবিত থেকে থাকেন তাহলে আরও সাধারণ মানুষ যেভাবে জীবিত থাকে এবং একসময় মারা যায় তিনিও সেভাবে ইন্তেকাল করেছেন।

[১] সুরা সাফফাত, আয়াত-ক্রম : ৭৭

দ্বিতীয় পাঠ

বিনয়ী হোন।

আমরা সবসময় নিজেদের সম্মান রক্ষা করার চেষ্টা করি। আরও স্পষ্ট করে বললে আমরা নিজেদেরকে সর্বক্ষেত্রে যোগ্য মনে করি। এমন ডাক্তার খুব কম পাওয়া যাবে যে নিজেকে অধিক যোগ্য মনে করে না। এমন কবি খুব কম পাওয়া যাবে যে নিজেকে সবচেয়ে বড় ভাবে না। এমন শিক্ষক খুব কম পাওয়া যাবে যে নিজেকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করে না। তেমনিভাবে ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিজ্ঞানী, বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি, ঘরের পরিচারিকা—সকলেই নিজেকে বড় মনে করে থাকে। আত্মমর্যাদা এক বিষয়, আর এই ধারণা রাখা যে আমাদের কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা ও অজানা নেই—তা ভিন্ন বিষয়।

মুসা আলাইহিস সালাম হলেন কালিমুল্লাহ; আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতেন। পাঁচজন মহাসম্মানিত নবীর একজন। সম্মানিত নবী, ওহি হলো তার জ্ঞান; যাতে কোনো ভুল-ভ্রান্তির অবকাশই নেই। তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নিজেকে বড় জ্ঞানী বলেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে শিক্ষামূলক তিরস্কার করেন।

বহু মানুষ এমন আছে—যারা আপনার চেয়ে বেশি জানে। আপনি হয়তো কোনো বিষয়ে বেশি জানেন আর অন্যরা অন্য কোনো বিষয়ে বেশি জানে। দেখা যাবে, যে সর্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞ সেই আবার সর্বক্ষেত্রে অজ্ঞ। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই কিছু বিষয়ে জ্ঞান রাখে আবার কিছু বিষয়ে জ্ঞান রাখে না। আমাদের রব আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন—

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

> *'তোমরা না জানলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।'*[১]

আর কোনো ব্যক্তি সর্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখাটা অসম্ভব।

ভাষার দক্ষতা প্রমাণ করে না যে, আপনি মানুষদের ডাক্তারি করতে পারবেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উৎকর্ষতা বোঝায় না যে, আপনি ফতোয়া দিতে পারবেন। ঘরের বিদ্যুৎ-লাইন ঠিক করবার দক্ষতা দ্বারা বোঝা যায় না যে, আপনি একজন

[১] সুরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ৪৩

ইঞ্জিনিয়ার।

অন্যরা যতই সাধারণ হোক, তাদের জ্ঞানের সম্মান করুন। পৃথিবীর সকল ডাক্তার মিলেও পানির কল ঠিক করতে অক্ষম হয়ে যেতে পারে। গোটা বিশ্বের সকল ইঞ্জিনিয়ার মিলেও একটি অপারেশন করতে অক্ষম হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সত্তা। তিনি মানুষ থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

আপন হেকমতের মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন।

তৃতীয় পাঠ

উপরোল্লিখিত ঘটনা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চলে আসে যে, কে উত্তম—মুসা নাকি খিজির?

নিঃসন্দেহে মুসা আলাইহিস সালাম উত্তম। কারণ, নবুওয়াতের সমতুল্য আর কোনো মর্যাদা হতে পারে না। আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির সকল মানুষের চেয়ে সর্বোত্তম। তার পরের স্তরে রয়েছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। তারা হলেন 'উলুল আযম' পাঁচ-নবীর দুজন। অবশিষ্ট তিনজনের কে উত্তম? তাদের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

প্রশ্ন হলো, তবুও খিজির আলাইহিস সালাম কীভাবে মুসা আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে বেশি জানেন?

আসলে অধিক জ্ঞান রাখাটা অধিক উত্তম হয়ে যাওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

কারণ, উত্তম-অনুত্তমের বিষয়টি এক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হয়।

বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা সাহাবায়ে কেরাম থেকে একটি উদাহরণ টানতে পারি।

উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চেয়ে কুরআনুল কারিম সুন্দর করে তেলাওয়াত করতে পারতেন, কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার চেয়ে উত্তম। যুদ্ধ বিষয়ে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চেয়ে অধিক অবগত, কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

তার চেয়ে উত্তম। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হালাল-হারাম বিষয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চেয়ে অধিক অবগত, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তম। তেমনিভাবে বিভিন্ন সাহাবি বিভিন্ন দিক থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চেয়ে উত্তম, কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সার্বিক দিক থেকে তাদের চেয়ে উত্তম।

এ বিষয়টি তেমনই।

খিজির আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তাআলা বিশেষ জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাই তিনি মুসা আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী। কিন্তু নবুওয়াতের কারণে মুসা আলাইহিস সালাম খিজির আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে উত্তম।

মুসা আলাইহিস সালাম যেহেতু বলেছিলেন, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, এ-কারণে আল্লাহ তাকে শিক্ষামূলক তিরস্কার করেছেন। আল্লাহ তাকে এই আদেশ করেননি যে, খিজির থেকে জ্ঞান লাভ করো। বরং মুসা আলাইহিস সালাম নিজেই তার কাছে যাওয়ার আবেদন করেছেন। এর মাধ্যমে মহান ব্যক্তিদের প্রতি বিনয় প্রদর্শনের বিষয়টি বুঝে আসে।

মুসা আলাইহিস সালাম মহান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তার চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করতে সংকোচবোধ করেননি।

মুসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণ করুন। তিনি কত উত্তম আদর্শ!

আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে কিছু আয়াত উল্লেখ করেছেন। এজন্য কেয়ামত পর্যন্ত তাকে ঈর্ষা করা যায়।

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي

> *'আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও।'*[১]

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

> *'এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি।'*[২]

[১] সুরা ত্ব-হা, আয়াত-ক্রম : ৩৯
[২] সুরা ত্ব-হা, আয়াত-ক্রম : ৪১

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

> *'এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি।'*[১]

আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তি, আল্লাহর পক্ষ থেকে যাঁর প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে, যিনি তার চোখের সামনেই প্রতিপালিত হয়েছেন, আল্লাহ যাঁকে নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন—এমন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে অপমানবোধ করেননি।

অভিজাত লোকেরা বিনয়ী হয়ে থাকেন, তাই আপনিও বিনয়ী হোন।

চতুর্থ পাঠ

কষ্টের সঙ্গেই ইলম জড়িত।

এক টুকরো রুটিই যখন সহজে অর্জিত হয় না, ইলমের ব্যাপারে তো প্রশ্নই ওঠে না!

একটিমাত্র হাদিস সন্ধানের জন্য ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহি আলাইহি এক-শহর থেকে আরেক শহর ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহি আলাইহি একটি মাসআলার উত্তর খোঁজার জন্য এশার ওজু দিয়ে ফজরের নামাজ পড়েছেন।

কষ্ট স্বীকার মুসা আলাইহিস সালাম-কে ইলম অর্জন থেকে বাধা দিতে পারেনি। তাই তিনি ইলম অর্জনের সফরে বের হয়ে যান।

ওই সময়টায় কোনো গাড়ি ছিল না যে, দীর্ঘপথ মাত্র ঘণ্টা কয়েকে পাড়ি দেবেন। কোনো প্লেন ছিল না যে, চোখের পলকেই শহরের পর শহর পার হয়ে যাবেন। কোনো বিশাল লাইব্রেরি ছিল না যেখানে হাজার হাজার উৎসগ্রন্থ থাকবে; যেখান থেকে বই নিয়ে নিয়ে গবেষক হওয়া যাবে। কোনো ফটোকপির মেশিন ছিল না; তাই জ্ঞানার্জন করতে নিজ হাতে অক্ষরের পর অক্ষর লিখে কপি তৈরি করতে হতো।

[১] সুরা ত্ব-হা, আয়াত-ক্রম : ১৩

পঞ্চম পাঠ

খিজির আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম-কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন। বিষয়টিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে বিশেষ কিছু জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানেন না, আর আপনাকে বিশেষ কিছু জ্ঞান দান করেছেন যা আমি জানি না।'

জ্ঞান দুই প্রকার।

এক. ইলমে লাদুনি, আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তা দান করেন।

দুই. এমন জ্ঞান যা কষ্ট, সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ধৈর্যধারণের পর আল্লাহর তাওফিকে অর্জিত হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকারের জ্ঞানার্জনের কোনো উপায় না থাকলেও দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানার্জনের রাস্তা রয়েছে। কষ্টের মাধ্যমে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে তা অর্জন করতে হয়।

শুধু জ্ঞান নয়, বরং জীবনের সবকিছুই এমন।

কিছু বিষয় আল্লাহ তাআলা কোনো উপকরণ ব্যতীতই দান করে থাকেন আর কিছু বিষয় উপায়-উপকরণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। বুদ্ধিমানগণ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উপকরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা জানেন, ফলাফল আল্লাহর হাতে। তাই উপকরণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও আল্লাহ না চাইলে আমরা লক্ষ্যে নাও পৌঁছুতে পারি।

আল্লাহ তাআলা আইয়ুব আলাইহিস সালাম-কে ডাক্তার ব্যতীত সুস্থ করে দেওয়াটা এই কথার প্রমাণ বহন করে না যে, আমাদেরকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। আল্লাহ তাআলা মারইয়াম আলাইহিস সালাম-কে স্বামী ব্যতীত সন্তান প্রদান করাটা এই কথার প্রমাণ বহন করে না যে, বিয়ে এবং শারীরিক সম্পর্ক ব্যতীতই সন্তান হবে। আল্লাহ তাআলা ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে মাছের পেটে রক্ষা করাটা এই কথার প্রমাণ করে না যে, মাছের পেট নিরাপদ স্থান। আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম-এর জন্য লাঠির আঘাতে সমুদ্র বিদীর্ণ করে দেওয়াটা এই কথা প্রমাণ করে না যে, লাঠি সবসময়ই সমুদ্রকে বিদীর্ণ করবে। বরং এসব বিষয় এই কথার প্রমাণ করে যে, সবকিছুই আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন।

তবে আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বজগতের জন্য কিছু নীতিমালা তৈরি করেছেন। সে অনুযায়ী ভালোভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। যদি কেউ উপায়-উপকরণ থেকে অমুখাপেক্ষী হতো তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সবচেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী হতেন। কিন্তু তিনি উপায়-উপকরণকে বাদ দিয়ে দেননি। তার হিজরতের রাস্তার প্রতি লক্ষ্য করুন—

প্রথমত: তিনি একজন সঙ্গী গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়েছেন।

তৃতীয়ত: তার পাথেয় এনে দেওয়ার মতো আরেক ব্যক্তির ব্যবস্থা করেছেন।

চতুর্থত: আরেকজন ব্যক্তি রেখেছেন, যে বালুতে-পড়া তার পদচিহ্ন মুছে দেবে।

পঞ্চমত: তিনি এক অস্বাভাবিক রাস্তা অবলম্বন করেছেন।

এর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে বাস্তবভিত্তিক কাজ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

ষষ্ঠ পাঠ

বড় বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা ছোট ছোট বিপদে নিপতিত করে থাকেন।

বিপদাপদ রহমত নিয়ে আসে, কিন্তু মানুষ তা জানে না। হয়তো এগুলো দুনিয়াতেই কল্যাণ ও রহমত হয়ে আসে, কিংবা আখেরাতে রহমত বয়ে আনে।

খিজির আলাইহিস সালাম যদি নৌকাটিকে ভালো রাখতেন তাহলে অত্যাচারী বাদশাহ তা ছিনিয়ে নিতো।

কোনটি অধিক ক্ষতিকর, নৌকাটি সাময়িকের জন্য ফুটো হয়ে যাওয়া, নৌকার আরোহীরা কিছুটা কষ্ট বোধ করা নাকি নৌকাটি সম্পূর্ণরূপে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া? সন্দেহ নেই, এক ক্ষতি অপর ক্ষতি থেকে তুচ্ছ হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষ তা জানে না। নৌকার আরোহীরা জানতে পারেনি যে, এই অকল্যাণ আসলে কল্যাণ। যদি কুরআন আমাদেরকে সংবাদ না দিত তাহলে আমরাও তা জানতাম না।

জীবন যদি আমাদেরকে ভালো এবং মন্দের মধ্যে ইচ্ছাধিকার প্রদান করত তাহলে

এটি সহজ হতো। কিন্তু অধিকাংশ সময় এই জীবন আমাদেরকে দুটি অকল্যাণের মধ্যে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি তো সে, যে দুই অকল্যাণের মধ্যে তুলনামূলক কল্যাণকরটি নির্বাচন করে নেয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি অকল্যাণ থেকে কল্যাণকে চিনতে পারে সে জ্ঞানী নয়; বরং জ্ঞানী হলো সে, যে দুই অকল্যাণের মধ্য থেকে তুলণামূলক কল্যাণকরটি চিনে নিতে পারে।'

সবসময় কম ক্ষতিকর বিষয়টি গ্রহণ করুন। সম্পূর্ণ বিষয়টি রক্ষা করার জন্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করে নিন।

ডাক্তারদেরকে কি দেখেন না যে, তারা সন্তানের মাকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভ্রূণ ফেলে দিয়ে থাকেন? গোটা দেহকে বাঁচানোর জন্য তারা হাত-পা কেটে ফেলেন।

এই ইচ্ছাধিকার কখনও কখনও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু নির্বাচন করার জন্য আমাদের বিবেক-বিবেচনা রয়েছে।

বিভিন্ন সময় সাহসিকতা প্রদর্শনের তুলনায় লাঞ্ছনা সয়ে যাওয়া উত্তম হয়ে থাকে। আমি লাঞ্ছনা সয়ে যেতে বলছি না, বলছি ধৈর্যধারণের কথা। কারণ ধৈর্যের ফল অনেক উত্তম।

স্বামী দুশ্চরিত্রবান হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর জন্য তার ওপর ধৈর্যধারণ করাটা তার এবং সন্তানের জন্য উত্তম হয়ে থাকে।

কখনো আমরা এমন দুটি বিষয়ের ইচ্ছাধিকার পেয়ে থাকি যার অধিক মিষ্ট দিকটাই বাস্তবে তেতো। জ্ঞানী ব্যক্তি সে, যে কম তিক্ত বিষয়টি নির্বাচন করে।

কখনো কখনো স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে তাকে নিয়ে ঘরসংসার করাটা উত্তম হয়ে থাকে। আমাদের কল্পিত সমাধান অনেক সময় আরেক বিপদ ডেকে আনতে পারে; যা পূর্বের চেয়েও বড় কোনো বিপদের দ্বার খুলে দেয়।

পরকাল ঠিক করার জন্যও মানুষকে বিপদে ফেলা হয়ে থাকে।

এ বিষয়টি খিজির আলাইহিস সালাম কর্তৃক বালককে হত্যা করার মধ্যে ঘটেছে।

এ-জাতীয় বহু বিষয় আছে, আমরা তা জানি না।

এই মুমিন মাতাপিতা কীভাবে জানতে পারত যে, তাদের ছেলে ভিন্ন রকম হয়ে যেত? সে বড় হয়ে একসময় কাফের হয়ে যেত? ধর্মের প্রশ্নে তাদেরকে ফেতনায় নিপতিত করে দিত? আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য দুই অকল্যাণের মধ্যে তুলনামূল কল্যাণকরটি নির্বাচন করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুফরির চেয়ে সন্তান হারানোটা কম ক্ষতিকর।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস থেকে বঞ্চিত করেন, আমরা তার হেকমত সম্পর্কে জানি না। তাই আপনি নিশ্চিত থাকুন, যে বিষয়টাকে আপনি অকল্যাণকর মনে করছেন বাস্তবে তা কল্যাণকর। এবং যেটাকে আপনি কল্যাণকর মনে করছেন বাস্তবে তা অকল্যাণকর।

কল্যাণ তো সেটাই আল্লাহ আমাদের জন্য যেটা নির্বাচন করেছেন।

সপ্তম পাঠ

আপনি সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত হলে তাদের জন্য ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট খুলবেন না। তাদের জন্য বিশাল মিরাস জমা করবেন না। যদিও বিষয়টি ভালো; বরং তাদেরকে আল্লাহর নিরাপত্তায় সোপর্দ করুন এবং আপনি সৎ হয়ে যান। কারণ, সন্তানের জন্য শুধু মিরাস রেখে যাওয়ার অর্থ হলো তার জন্য কিছু উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করা। পক্ষান্তরে তার জন্য তাকওয়া রেখে যাওয়ার অর্থ হলো উপায়-উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহকে তার জন্য রেখে যাওয়া। কোনো সন্দেহ নেই, একসময় উপায়-উপকরণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বাকি থাকবেন।

তাকওয়ার ফলাফল দেখুন।

আল্লাহর এক নেককার বান্দা। আমরা যাঁর পরিচয় জানি না। মুসা আলাইহিস সালাম, এমনকি খিজির আলাইহিস সালামও যাঁর পরিচয় জানেন না। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তার পরিচয় জানেন। আর এটাই তার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট।

ভূপৃষ্ঠের মানুষের কাছে তিনি অপরিচিত হলেও আকাশে তিনি সুপরিচিত। আল্লাহ তাআলা মহাসম্মানিত একজন নবী এবং একজন নেককার বান্দাকে পাঠালেন, তার সন্তানদের জন্য রাখা সম্পত্তির দেওয়াল ওঠানোর জন্য।

এই নিরাপত্তার পর কি কোনো জীবনবীমার প্রয়োজন আছে?

খলিফা মানসুরের হাতে যেদিন খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করা হয় সেদিন মুকাতিল ইবনে সুলাইমান রহমতুল্লাহি আলাইহি তার কাছে যান। মানসুর তাকে বলেন, 'হে ইবনে সুলাইমান, আমাকে উপদেশ দাও!' তিনি বললেন, 'আমি যা দেখেছি তার মাধ্যমে উপদেশ দেব নাকি যা শুনেছি তার মাধ্যমে?'

মানসুর বললেন, 'যা দেখেছ তার মাধ্যমেই দাও।'

ইবনে সুলাইমান তখন বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন! উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি'র ১১জন সন্তান ছিল আর মৃত্যুর সময় তিনি মাত্র ১৮ দিনার রেখে যান। পাঁচ দিনার দিয়ে তাকে কাফন দেওয়া হয় আর চার দিনার দিয়ে তার জন্য একটি কবর ক্রয় করা হয়। অবশিষ্ট দিনারগুলো তার সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

'অপরদিকে হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের সন্তান ছিল ১১জন। প্রত্যেক সন্তান উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে দশ লক্ষ করে দিনার লাভ করেছিল।

'হে আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহর কসম, আমি একদিন দেখলাম, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি'র ছেলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একশত ঘোড়া সাদাকাহ করছেন। অপরদিকে হিশামের এক ছেলেকে রাস্তায় ভিক্ষা করছেন।'

অষ্টম পাঠ

এই ঘটনাটি আমাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে শিষ্টাচারের বিষয়টি শিক্ষা দেয়।

বর্তমানে অভিযোগ ও অসন্তোষ বেড়ে গেছে। এসময় ঘটনাটির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

খিজির আলাইহিস সালাম যা করেছিলেন সবই আল্লাহর নির্দেশে করেছেন। এটি তো সুস্পষ্ট।

কিন্তু বিষয়গুলোর সংবাদ দিতে গিয়ে তিনি দারুণভাবে শিষ্টাচার রক্ষা করেছেন।

যে বিষয়গুলো বাহ্যিকভাবে দেখতে অকল্যাণ তিনি সেগুলোকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন।

আর যে বিষয়গুলো কল্যাণকর তিনি সেগুলোর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করেছেন।

এই তো দেখুন, তিনি উল্লিখিত ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম-কে বলছেন—

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

> *'নৌকাটি কয়েকজন দরিদ্র লোকের ছিল। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি সেটিকে ক্রটিযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম। তাদের পেছনে এক বাদশাহ ছিল; যে বলপ্রয়োগে প্রতিটি নৌকা ছিনিয়ে নিত।'*[১]

তিনি বললেন, 'আমি তা ক্রটিযুক্ত করতে চাচ্ছি।'কত চমৎকার শিষ্টাচার!

তিনি আল্লাহর নির্দেশে এ কাজটি করেছিলেন, কিন্তু ক্ষতির সম্বন্ধটা নিজের দিকে করেছেন।

বালকটিকে হত্যা করার বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়েও শিষ্টাচার রক্ষা করেছেন। তিনি বলছেন—

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

> *'বালকটির পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি চাইলাম, তাদের রব যেন তাদেরকে পবিত্রতায় উত্তম এবং ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি সন্তান দান করেন।'*[২]

এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় ছিল, হত্যা এবং রহমত। হত্যার সম্বন্ধ তিনি নিজের দিকে করেছেন আর রহমতের সম্বন্ধ করেছেন আল্লাহর দিকে।

দেয়ালের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি আদব রক্ষা করেছেন—

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ

---

[১] সুরা কাহাফ, আয়াত-ক্রম : ৭৯
[২] সুরা কাহাফ, আয়াত-ক্রম : ৮০-৮১

أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

> *'প্রাচীরটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিলেন সৎকর্ম-পরায়ণ। সুতরাং আপনার রব দায়বশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক।'*[১]

এখানে পুরো বিষয়টি কল্যাণকর হওয়ায় তিনি এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করেছেন।

কুরআনুল কারিমে এ ধরনের বহু আদব রয়েছে। এটা তা আলোচনার উপযোগী স্থান নয়।

বিষয়টি বোঝার জন্য একটি সহজ উদাহরণ দিই।

আল্লাহ তাআলা মারিয়াম-পুত্র ঈসাকে বলবেন—

يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

> *'হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত করো? ঈসা বলবেন, আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত। আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন। আর আপনার মনের বিষয় আমি জানি না। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।'*[২]

ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য শুধু 'না' উত্তর দেওয়াটাই যথেষ্ট হতো। এটাও প্রশ্নের সুন্দর উত্তর হতো। কিন্তু এটা আল্লাহর সঙ্গে নবীদের শিষ্টাচার নয়। তাই

[১] সুরা কাহাফ, আয়াত-ক্রম : ৮২
[২] সুরা মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ১১৬

তিনি বলছেন—

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

> *'আপনি পবিত্র! আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।'*[1]

তেমনিভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর সঙ্গে শিষ্টাচার রক্ষা করে কথা বলেছেন—

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

> *'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।*[2]

অসুস্থতা আল্লাহর হাতে, তিনিই মানুষকে অসুস্থ করেন, কিন্তু ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর সঙ্গে শিষ্টাচার রক্ষা করে সেটাকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যখন আমি অসুস্থ হই।' আর সুস্থতার সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করে বলেছেন, 'তিনি আমাকে সুস্থ করেন।' অর্থাৎ সকল ধরনের কল্যাণ—সৃষ্টি করা, হেদায়েত দেওয়া, পানাহার করানো—সবগুলো তিনি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করেছেন।

অসুস্থতা (যা বাহ্যিকভাবে অকল্যাণকর)-কে তিনি নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন।

তেমনিভাবে আইয়ুব আলাইহিস সালামও আল্লাহর সঙ্গে শিষ্টাচার রক্ষা করেছেন—

[১] সুরা মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ১১৬
[২] সুরা শুআরা, আয়াত-ক্রম : ৭৮-৮০

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

> *'এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তার রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।'*[১]

তিনি বলেননি—'হে আমার রব, আপনি আমার ওপর রোগব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছেন!' অথচ তিনি জানেন যে, এসব রোগ-ব্যাধি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা। বরং তিনি বলেছেন, 'আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি। ভাবখানা এমন—যেন এই দুঃখ-কষ্ট একাকী তার কাছে এসেছে।

শিষ্টাচার বশত তিনি আল্লাহর প্রতি তার সম্বন্ধ করেননি। এমনকি তিনি স্পষ্টভাবে সুস্থ করে দেওয়ার আবেদনও করেননি। অথচ তা সমস্যার কিছু ছিল না। বরং তিনি বলেছেন, 'আপনি তো সকল দয়ালুর চেয়েও অধিক দয়ালু।' এটা হলো প্রশংসার মাধ্যমে আবেদন।

আদম আলাইহিস সালামও আল্লাহর সঙ্গে শিষ্টাচার রক্ষা করতেন। তিনি বলেছেন—

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> *'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।'*[২]

অথচ ইতিপূর্বে আমরা মুসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে আদম আলাইহিস সালাম-এর আলাপচারিতার বিষয়টি জেনে এসেছি। আদম আলাইহিস সালাম সেক্ষেত্রে মুসা আলাইহিস সালাম-কে পরাজিত করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তাআলার পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় ছিল।

আদম আলাইহিস সালাম তার মতো একজন মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলেছেন আর তার রাব্বে কারিম আল্লাহর সঙ্গে কীভাবে কথা বলেছেন—এ দুটির মধ্যে

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত-ক্রম : ৮৩
[২] সুরা আরাফ, আয়াত-ক্রম : ২৩

তুলনা করুন। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি জুলুমের সম্বন্ধ নিজের দিকে করছেন। অথচ তাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা এর ফায়সালা করে রেখেছিলেন।

এমনকি জিন জাতিও আল্লাহর সঙ্গে শিষ্টাচার রক্ষা করে থাকে। তারা বলেছে—

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

> *'আমরা জানি না পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের রব তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন।*[১]

অমঙ্গল ও অনিষ্ট আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং তিনি তা জানেন। তো তারা অনিষ্টের বিষয়ে কর্তার কথা উহ্য রেখে বলেছে, তাদের ব্যাপারে অমঙ্গলের ইচ্ছা করা হয়েছে। আর তারা যখন কল্যাণ, মঙ্গল ও হেদায়েতের আলোচনা করেছে তখন সরাসরি আল্লাহ দিকে এর সম্বন্ধ করে বলেছে, 'নাকি তাদের রব তাদের প্রতি মঙ্গলের ফায়সালা করেছেন।'

[১] সুরা জিন, আয়াত-ক্রম : ১০

নিজের ওপর জুলুমকারী ব্যক্তিটি

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ

‘আগের যুগে এক লোক তার নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছিল। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে তার পুত্রদেরকে বলল, “মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড়-গোশতসহ পুড়িয়ে ছাই করে তা প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিয়ো। আল্লাহর কসম! যদি আমার রব আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠিনতম শাস্তি দেবেন যা অন্য কাউকে দেননি।” তারপর যখন তার মৃত্যু হলো—তার কথামতো সেভাবেই করা হলো। অতঃপর আল্লাহ ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করলেন, “তোমার মধ্যে ঐ ব্যক্তির যা আছে জমা করে দাও।” ভূপৃষ্ঠ তা জমা করে দিল। এ ব্যক্তি তখনই দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কীসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল?” সে বলল, “হে আমার রব! আপনার ভয়।” অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।’[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৪৮; সহিহ মুসলিম, ২৭৫৬

প্রথম পাঠ

এই হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, লোকটি গুনাহের ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। অন্য এক বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, সে কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি।

আমরা দেখছি, দুনিয়া থেকে তার বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার মতো কোনো নেক কাজ তার নেই। এমতাবস্থায় সে তার সন্তানদেরকে একত্রিত করে শুধু একটি ওসিয়ত করে গেল—যেন তার গোশত-চামড়া ও হাড়গুলো পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে দেওয়া হয়। তার আশঙ্কা ছিল ছাই বিদ্যমান থাকলে আল্লাহ্ এর মাধ্যমেই তাকে পাকড়াও করবেন। তাই সে ছাইগুলো বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার ওসিয়ত করে যায়।

সে কেন এ ওসিয়ত করেছিল? কারণ সে জানত আল্লাহ্ তাআলার আজাব অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হলে কোনো কিছুই তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করত।

আজাব ও শাস্তিদাতা সত্তা মহান আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের ওপর ঈমান রাখত। সে বুঝতে পারছিল যে, তার সময় সংকীর্ণ হয়ে আসছে, তাই সে অপেক্ষমান শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সে বুঝতে পারছিল, মিছে এই দুনিয়ায় তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। তাই সে হিসাব থেকে পলায়ন করতে চাচ্ছিল। সে ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে যেতে চেয়েছিল।

তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, অবশ্যই তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে কোনো ওজর পেশ করতে পারবে না। কারণ কোনো নেক আমল তার নেই। অবশ্য সে ভুলে গিয়েছে যে, সে এমন এক সত্তার কাছে যাচ্ছে যিনি গলিত হাড্ডিসমূহও জীবিত করতে পারেন।

দ্বিতীয় পাঠ

অন্তরই সকল ইবাদতের মূল।

অন্তরের ধ্যান, খেয়াল ও নিবেদন ব্যতীত শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। খুশু তথা বিনয় ব্যতীত নামাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া বৈ কিছু নয়। এতে নামাজে আল্লাহর সঙ্গে একান্ত আলাপের বিষয়টি ফুটে ওঠে না।

তাকওয়া ব্যতীত রোজা রাখাটা নিছক পণ্ডশ্রম। এতে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার জন্য পানাহার এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগের বিষয়টি ফুটে ওঠে না।

হজ তো কোনো ভ্রমণের নাম নয়; বরং আধ্যাত্মিক ইবাদতের এক মাধ্যম। যদি অন্তরের মাধ্যমে সেটি অনুভূত না হয় তাহলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে।

অন্তরের অন্যতম ইবাদত আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা। যদি কেউ আল্লাহ্র অস্তিত্বের ওপর ঈমান না রাখে তাহলে তাকে ভয় করে কোনো কাজ হবে না।

আলোচ্য ঘটনায় এ ব্যক্তিটি আল্লাহ্র ওপর ঈমান রাখত কিন্তু তার অবাধ্যতা করত। সে সাধারণ কোনো গুনাহ্ করেনি; বরং গুনাহের ক্ষেত্রে নিজের ওপর অনেক বাড়াবাড়ি করেছে। সে এমন কোনো আমল করেনি যার মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমতের আশা করতে পারে। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল, তার ধ্বংস অনিবার্য। তার জানা ছিল আল্লাহ্ দয়ালু ও পরম ক্ষমাশীল সত্তা হলেও এর পাশাপাশি তিনি শাস্তিও দিয়ে থাকেন।

তার রহমত সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। তবে তিনি শিরিক করাকে কখনো ক্ষমা করেন না, শিরিক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ্ তিনি চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আপনার অন্তর ও মনের গোপন অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানেন। তিনিই তার নেয়ামতসমূহ আপনার কাছে প্রিয় করে তোলেন। তিনি ক্ষমা নিয়ে তাওবার দরজায় আপনার জন্য অপেক্ষা করেন। যে ব্যক্তি তার কাছে দুনিয়া-সমান পাপ নিয়ে আসে তিনি তার কাছে সমপরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে আসেন। আপনার গুনাহ্ যত বেশিই হোক না কেন যদি আপনি ক্ষমার আশা রাখেন তাহলে তিনি চাইলে সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

তিনি জানেন, এই ব্যক্তিটি জীবনে একদিনও তার আনুগত্য করেনি। তেমনিভাবে তিনি তার অন্তরে-থাকা আল্লাহ্র ভয়ের ব্যাপারেও জানেন। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তিনি তো বদান্যতার আধার। আর বদান্যশীল ব্যক্তিদের কাছে কেউ অপরাধের কথা স্বীকার করলে তারা ক্ষমা করে দিয়ে থাকে। দেরিতে হলেও আল্লাহ্র

ভয় জাগ্রত হওয়ায় আল্লাহ তাআলা তাকে তার এই ভয়ের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহর ভয়ের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

কেউ আল্লাহ তাআলার ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকে। আবার কেউ গুনাহ করে আল্লাহর ভয়ে লজ্জিত হয়। সফল তো সেই ব্যক্তি আল্লাহর ভয় যাকে তাওবার পথে টেনে আনে।

সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পূর্বে লজ্জিত হতে হবে। আল্লাহকে ভয় করার জন্য কারও গুনাহ করার সুযোগ নেই। যদিও গুনাহগারদের উচিত আল্লাহকে অধিক ভয় করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে ভয় করাটা তার সম্মানের অংশ।

এই তো উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু! অত্যন্ত মুত্তাকি ও পরহেজগার এক ব্যক্তি। তিনি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার এবং তার শাস্তিতে গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা করছেন। তাই তিনি বলছেন, 'যদি আকাশ থেকে কোনো ঘোষক ঘোষণা করে যে, হে লোক সকল! তোমরা সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে একজন ব্যতীত! তাহলে আমার আশঙ্কা হয়, সেই ব্যক্তি আমিই হব! আর যদি কোনো ঘোষক ঘোষণা করে যে, হে লোক সকল! তোমরা সকলে জাহান্নামি তবে একজন ছাড়া! তাহলে আমি আশাবাদী আমিই সেই ব্যক্তি হব।'

আল্লাহ তাআলাকে ভয় করাটা তার প্রতি ঈমান রাখার অংশ। অন্তরে আল্লাহর ভয় ঢুকে গেলে বান্দা অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না।

মুমিন তো একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। সে জানে, তার রিজিক আল্লাহর হাতে। তাই সে রিজিক বন্ধ হওয়ার ভয় করে না। সে জানে, জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে, তাই সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তার রুহ নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে না। সে জানে, মানুষ সামান্য উপকরণ মাত্র। তাদের সকলের ফলাফল সেই সত্তার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় যিনি কোনো বিষয়ে ফায়সালা করতে চাইলে শুধু বলেন, (কুন) 'হও', সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

অফিসের বস তো হলো একজন সাধারণ মানুষ। আল্লাহ তাআলা যাকে রিজিক দিয়ে থাকেন। বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, চেয়ারম্যান—সকলেই মানুষ।

তাদের প্রত্যেকের ওপর একজন প্রতিপালক রয়েছেন। তার কাছে সকলেই সমান। পার্থক্যের একমাত্র মানদণ্ড হলো তাকওয়া।

তাই প্রত্যেকের মর্যাদা রক্ষা করুন। কিন্তু কাউকে তার মর্যাদার চেয়ে উঁচুতে নিয়ে যাবেন না। আল্লাহ তাআলাকে ভয়ের ক্ষেত্রে কাউকে অংশীদার করবেন না। কারও সামাজিক অবস্থান, তার পদ-পদবী ও মূল্যায়ন এ কথা প্রমাণ করে না যে, আপনার পরিণাম তার হাতে, কিংবা তার সন্তুষ্টি স্রষ্টার সন্তুষ্টির ঊর্ধ্বে! কিংবা সেই চাইলে আপনাকে গোলাম বানিয়ে ফেলতে পারে কিংবা আপনার সঙ্গে তার পূর্বনির্ধারিত যোগ্যতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে! আমাদের দায়িত্ব হলো—সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে সমস্ত বস্তু এবং ব্যক্তি থেকে বড় বলে মেনে নেওয়া।

আল্লাহর ভয় অন্য সকলের ভয়ের মতো নয়। আল্লাহর ভয় হলো মুক্তির উপায়। তাই আল্লাহর ভয়ের এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে অন্য কারও জন্য সমর্পণ করবেন না।

চতুর্থ পাঠ

সত্য স্বীকার করে নেওয়াটা মর্যাদার বিষয়। সাহসিকতারও।

যদিও ভয় তার পিছু তাড়া করে বেড়ায়। সবচেয়ে উত্তম অজুহাত হলো নিজের ভুল স্বীকার করে নেওয়া। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভুল হলো—ভুলের পক্ষে সাফাই গাওয়া।

ভুল হয়ে গেলে তা স্বীকার করে নিন। কারণ সৃষ্টিগতভাবে সকলেই মানুষ। মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে।

আপনি সেইসব অভিজাত লোকের অন্তর্ভুক্ত হোন যাদের কাছে কেউ ভীত হয়ে বা লজ্জিত হয়ে আসলে তারা অহংকার করে না। বদান্যশীলদের শক্তি তাদেরকে প্রতিশোধের আহ্বান জানালেও তারা মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। কোনো ক্ষেত্রে তাদের পা পিছলে গেলেও তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেয়। তাদের থেকে কদাচিৎ অশোভনীয় কথা বা কাজ প্রকাশিত হয়ে গেলে তা স্বীকার করে নেয়।

ভুল মানুষের স্বভাবের অংশ। এমনকি এটা মানুষের উত্তম বৈশিষ্ট্য। কারণ ভুলের কারণে মানুষ শিখে থাকে, পরিমার্জিত হয়।

কারণ ভুলের মাধ্যমে আমরা নিজেদের মনুষ্য-প্রবৃত্তিকে স্মরণ করে থাকি।

নিজেদের দুর্বলতার কথা বুঝতে পারি। তখন আমরা এর হিসাব-নিকাশ করতে পারি। আমরা এমনসব চিন্তা করি, ভুল না হলে যার চিন্তা করতাম না।

ভুলের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে পূর্ণ ভাবার অহমিকা থেকে এবং অহংকারের অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারি।

গুনাহের কারণে বিনয় অবলম্বন কখনো আল্লাহর কাছে নেক-কাজের-ফলে-সৃষ্ট অহমিকা থেকে উত্তম হয়ে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

> *‘পবিত্র সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদের বিলুপ্ত করে দিতেন এবং এমন সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত। আল্লাহ তখন তাদের ক্ষমা করে দিতেন।’*[১]

পঞ্চম পাঠ

সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর আনীত ঈমান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

> *‘যেদিন আপনার রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন যারা পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনোরূপ সৎকর্ম করেনি তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না।’*[২]

ফিরআউনের ক্ষেত্রে এমনই ঘটেছিল। তারা সমুদ্রের ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ২৭৪৯
[২] সুরা আল-আনআম, আয়াত-ক্রম : ১৫৮

বিশাল বিশাল ঢেউ ফিরআউনের উপর উপচে পড়ছিল। মৃত্যুযন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তখন সে বলে উঠেছিল—

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

> *'আমি ঈমান আনলাম যে, বনি ইসরাইল যার ওপর ঈমান এনেছে, তাকে ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। বস্তুত আমিও তারই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।'*[১]

এ ঈমান তার কোনো উপকারে আসেনি। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ফিরআউনের এ কথার উত্তরে বলেন—

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

> *'এখন এ কথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানি করছিলে, এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে।*[২]

হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফিরআউন যখন বলল, 'আমি ঈমান আনছি—সে সত্তা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, বনি ইসরাইল যার উপর ঈমান এনেছে।' জিবরাইল আমাকে বলেন, 'যদি আপনি আমাকে দেখতেন, আমি সমুদ্রের কাদামাটি তার মুখে নিক্ষেপ করে দিয়েছি। যেন সে আল্লাহর রহমত না পেতে পারে।'[৩]

ফিরআউন জীবিত থাকাবস্থায় প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। শুধু এতটুকুই নয়, বরং সে বলেছে—

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

> *'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।'*[৪]

যারা ফিরআউনের প্রতি ঈমান এনেছিল তিনি তাদেরকেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করিয়েছেন।

হাদিসে উল্লিখিত আলোচ্য ব্যক্তিটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। তবে তার

[১] সুরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৯০
[২] সুরা ইউনুস, আয়াত-ক্রম : ৯১
[৩] মুসনাদে আহমদ, হাদিস-ক্রম : ২৮২০। সনদ যঈফ।
[৪] সুরা নাযিয়াত, আয়াত-ক্রম : ২৪

পাপাচার বেশি ছিল। আল্লাহ তাআলা চাইলে তার হকের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বান্দার হকের গুনাহ তিনি ক্ষমা করেন না; বরং বান্দা তা মাফ করে দিলে কিংবা তার হক আদায় করা হলেই কেবল তা মাফ হতে পারে।

এটি আল্লাহ তাআলার ইনসাফ। যদিও তিনি সকলের রব, সকলের বিষয় তারই হাতে, তবুও তিনি বান্দার কোনো হক নষ্ট করেন না; বরং তিনি তাদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা করেন। তিনি সর্বোত্তম দয়ালু।

চোর মানুষের হক ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কিংবা ওই ব্যক্তি তাকে মাফ না করা পর্যন্ত তিনি কখনো চোরকে ক্ষমা করেন না।

যার গিবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তিনি গিবতকারীকে ক্ষমা করেন না। অন্যথায় তিনি তার নেক আমলসমূহ ওই ব্যক্তির আমলনামায় দিয়ে দেন।

তিনি জালেমকে ক্ষমা করেন না। মাজলুম আপন প্রতিশোধ গ্রহণ পর্যন্ত কিংবা জালেম মজলুমকে তার অধিকার ফিরিয়ে না দেওয়া অবধি তিনি জালেমকে ক্ষমা করেন না।

যিনি মানুষকে তাদের নিজের ওপর জুলুমকে হারাম করেছেন তিনি কখনও অন্যের ওপর জুলুম পছন্দ করেন না; তার শক্তি ও ক্ষমতা যতই হোক না কেন।

তিনি অবশ্যই এই জুলুমের প্রতিশোধ নেবেন। এমনকি তিনি চতুষ্পদ জন্তুদের পরস্পর থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তাহলে মানুষের বিষয়টি কেমন হতে পারে!

ষষ্ঠ পাঠ

ওসিয়ত পূরণ করা জীবিতদের ওপর মৃতের অধিকার। মাতা-পিতার ওসিয়ত পূরণ করাটা তাদের প্রতি এক ধরনের সদাচার।

তবে জীবিতাবস্থায় আনুগত্যের ক্ষেত্রে যেমন তাদের নির্দেশে আল্লাহর অবাধ্য না হওয়ার এবং কারও ক্ষতির কারণ না হওয়ার শর্ত ছিল এই ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য।

কিন্তু আমরা উল্লিখিত হাদিসে দেখতে পেলাম, সন্তানরা পিতাকে পুড়িয়ে তার

হাড্ডি ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার ওসিয়ত পূরণ করেছে।

এটি খুবই অবাক-করা আনুগত্য, এক অন্ধ-অনুসরণ। পিতা তাদেরকে যেমন ভয়ংকর কাজ করতে বলেছিল তারা তেমনটাই করেছে।

মৃত্যুর পর সন্তানেরা যেন তাদের প্রতি সদাচরণ করে এজন্য ওসিয়ত করে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। দুনিয়া থেকে চলে গেলেও সন্তানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বাকি থাকে। শেষ রাত্রে পিতা-মাতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাটাও এক ধরনের সদাচারণ। দুআ কবুলের সময় তার জন্য দুআ করাটা সদাচারণ। কোনো অভাবগ্রস্তকে তাদের পক্ষ থেকে সাদাকাহ্ করাটা সদাচারণ।

মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করাটাও মাতাপিতার প্রতি এক ধরনের সদাচরণ। কারণ মানুষ তখন আপনার প্রতিপালনকারীর জন্য দুআ করবে। মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা সদাচারণ।

বরং মাতা-পিতার প্রতি প্রকৃত সদাচরণ শুরু হয় তাদের মৃত্যুর পরে। কারণ জীবিত অবস্থায় তারা ইস্তেগফার প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের উপকার করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তখন নেককার সন্তান দুআ করলেই তারা তা ভোগ করে।

যখন নেককার সন্তানের দুআর প্রতি তারা সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকেন, তখন আমরা তাদের জন্য দুআ করতে যেন ভুলে না যাই। যখন তাদের জন্য কেবল আপনাদের পক্ষ থেকেই কোনো কিছু পৌঁছার রাস্তা খোলা রয়েছে তখন তাদেরকে ভুলে যাবেন না।

ইউনুস আলাইহিস সালাম

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—ইউনুস আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন যে, তিনদিন পরই তাদের ওপর শাস্তি নেমে আসবে। এরপর তিনি তাদের ছেড়ে চলে যান। তখন তার জাতি সমস্ত সন্তান থেকে তাদের মায়েদের আলাদা করে দেয়। সকলে বের হয়ে আল্লাহর আশ্রয় নেয়। তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

আল্লাহ তাআলা আজাব উঠিয়ে নেন।

অপরদিকে ইউনুস আলাইহিস সালাম আজাবের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো আজাব দেখতে পেলেন না। তাদের রীতি ছিল, যদি কেউ মিথ্যা বলে আর আপন বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ পেশ না করতে পারে তাহলে সে হত্যার উপযুক্ত হবে। তাই তিনি রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে যান। এক জাহাজের কাছে আসেন। তারা তাকে উঠিয়ে নেয়। জাহাজের লোকেরা তাকে চিনতে পারে। তিনি আরোহণ করার পর জাহাজটি থেমে যায়। জাহাজটি ডানে-বামে কোনো দিকেই চলছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের এই জাহাজের কী হলো?' তারা বলল, 'আমরা জানি না।' তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি জানি।' এ জাহাজে মনিব থেকে পলাতক এক গোলাম রয়েছে। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ না তোমরা তাকে ফেলে দেবে ততক্ষণ এটা চলবে না।' তারা বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনাকে ফেলে দিতে পারব না।' ইউনুস আলাইহিস সালাম বললেন, 'তোমরা লটারি করো, যার নাম আসবে তাকে নিক্ষেপ করা হবে।'

তারা লটারি করলে তিন-তিনবারই ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর নাম আসে। তাকে ফেলে দেওয়া হলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাছের মুখে ছেড়ে দেন। মাছ তাকে গিলে ফেলে। তাকে নিয়ে সমুদ্রের গভীরে চলে যায়।

ইউনুস আলাইহিস সালাম সেখানে নুড়ি পাথরের ঘর্ষণের মতো তাসবিহ পাঠ শুনতে পান। এ সময় তিনি দুআ করেন। যার বর্ণনা কুরআনে উঠে এসেছে এভাবে—

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

> *‘তখন তিনি অন্ধকারের মধ্যে (আল্লাহকে) ডেকে বলেন, আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; আপনি পবিত্রতম সত্তা, আমি গুনাহগার।’*[১]

তিনটি অন্ধকার—মাছের পেটের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার, রাতের অন্ধকার। এই তিন অন্ধকারে তিনি আল্লাহকে ডাকছেন। মাছ তাকে পশমবিহীন পাখি-ছানার মতো (জবুথবু অবস্থায়) পেট থেকে উগরে ফেলে।

আল্লাহ তাআলা সেখানে একটি লাউগাছ উৎপন্ন করেন। তিনি এর মাধ্যমে ছায়া গ্রহণ করতেন। এরপর লাউ গাছটি শুকিয়ে যায়। গাছটি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি ক্রন্দন করতে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা ওহি প্রেরণ করে বলেন, ‘একটি গাছ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তুমি ক্রন্দন করছ! কিন্তু এক লক্ষ বা তারও বেশি লোকদের ব্যাপারে তুমি ক্রন্দন করছ না! তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলে?’তিনি সেখান থেকে বের হন। এক বালকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। বালকটি মেষ চড়াচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কোন সম্প্রদায়ের?’ সে বলল, ‘ইউনুস সম্প্রদায়ের।’ তিনি বললেন, ‘তুমি তাদেরকে গিয়ে সালাম জানাবে। বলবে যে, তুমি ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ।’

বালকটি বলল, ‘যদি তুমি ইউনুস হয়ে থাকো তাহলে তো তুমি জানো, যে কেউ প্রমাণবিহীন মিথ্যা বললে তাকে হত্যা করা হয়ে থাকে। তোমার উক্ত দাবির পক্ষে কে আমার সাক্ষী হবে?’ তিনি বললেন, ‘এই গাছ এবং এই স্থানটি তোমার সাক্ষ্য দেবে।’ বালকটি ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে বলল, ‘তাদেরকে আদেশ করুন।’ ইউনুস আলাইহিস সালাম গাছ ও সেই স্থানকে বললেন, ‘তোমাদের কাছে বালকটি আসলে তোমরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।’ গাছ ও স্থান বলল, ‘হ্যাঁ।’

বালকটি তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল। তার কয়েকজন ভাই ছিল। ফলে সে কিছুটা সাহসবোধ করছিল। সে বাদশাহর কাছে গিয়ে বলল, ‘আমি নবী ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন।’

বাদশাহ বালকটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। বালকটি বলল, 'আমার সাক্ষী রয়েছে।' বাদশাহ তার সঙ্গে কয়েকজন লোক পাঠান। তারা সেই গাছ ও স্থানের কাছে পৌঁছে।

বালকটি এগুলোকে সম্বোধন করে বলে, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, ইউনুস কি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখেননি?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

লোকেরা ভীত হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, 'গাছ এবং জমিন তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিল!' তারা বাদশাহর কাছে গিয়ে এর বিবরণ পেশ করল। বাদশাহ বালকটির হাত ধরে তাকে নিজের আসনে বসালেন। তিনি বললেন, 'তুমিই এ আসনের অধিক উপযুক্ত। বালকটি ৪০ বছর তাদের দায়িত্ব পালন করে।'[১]

প্রথম পাঠ

আল্লাহ তাআলা একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

নবীগণও মানুষ। তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নবুওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। তবে নবুওয়াতের ওপর কোনো মর্যাদা নেই।

যেহেতু আমরা বিশ্বাস রাখি যে, নবীদের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য রয়েছে, তাই তাদের সকলের সঙ্গে শিষ্টাচার রক্ষা করা ফরজ। তাদেরকে ভালোবাসাটা ইবাদত। তাদের থেকে সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তাদের মানববৈশিষ্ট্যের কারণেই ঘটেছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই তা সংঘটিত হয়েছে; যেন তা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি, উপদেশ গ্রহণ করতে পারি।

আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে নিষ্পাপ থাকার গুণ দান করেছেন। সেটা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে। তেমনিভাবে চারিত্রিক ক্ষেত্রেও তারা নিষ্পাপ। তাই তাদের থেকে কোনো ধরনের খারাপ বা অশ্লীল কাজ হতে পারে না। তাদের মিথ্যা বলাটা অসম্ভব।

কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তারা মানুষ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় এসে মদীনাবাসীকে খেজুরগাছ

[১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস-ক্রম : ৩১৮৬৬। সনদ হাসান।

পরাগায়ন করতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরা কেন তা পরাগায়ন করো?’ তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। তাই তারা সেই বছর পরাগায়ন করেনি। কিন্তু তখন আর খেজুর হয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানানো হলে তিনি বলেন, ‘তোমরা পার্থিব বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক অবগত।’

বনি ইসরাইল গো-বৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করায় মুসা আলাইহিস সালাম খুব রাগান্বিত হন, এমনকি নিজ ভাই হারুন আলাইহিস সালাম তাকে বলেন—

يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي

> *‘হে আমার জননী-তনয় (ভাই), আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে টেনো না।’*[১]

তাদের এই বিষয়টি আমাদের আলোচনারও ঊর্ধ্বে। তাই আমরা তা থেকে বিরত থাকব।

মনুষ্য-স্বভাবের কারণে ইউনুস আলাইহিস সালাম থেকে এ কাজ সংঘটিত হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাকে আজাবের সংবাদ দিয়েছিলেন। সম্প্রদায়কে তিনি জানিয়ে দিতে বলেছিলেন যে, তিনদিন পর তাদের উপর আজাব নেমে আসবে।

এরপর তিনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে যান। শাস্তি নেমে আসার অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু তাদের উপর শাস্তি নেমে আসেনি। কারণ তারা উত্তমরূপে তাওবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাওবার জন্য তারা সন্তানদেরকে মায়েদের থেকে পৃথক করে ফেলেছিল। চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চাকে তার মা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ-অনুকম্পা লাভ করতে চাচ্ছিল।

ইউনুস আলাইহিস সালাম এগুলো জানতেন না। কারণ তিনি তো একজন মানুষ। কোনো অদেখা বিষয় সম্পর্কে তিনি জানেন না। আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেই কেবল জানতে পারেন।

তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে দুটি কারণে বের হয়ে যান। প্রথমতঃ তাকে মিথ্যা

[১] সুরা ত্বহা, ২০: ৯৪

প্রতিপন্নকারী সম্প্রদায়ের ওপর শাস্তি আসেনি। দ্বিতীয়তঃ মিথ্যুককে হত্যা করা তার সম্প্রদায়ের এক রীতি ছিল। এরপর সমুদ্রতীরে এসে জাহাজবাসীকে অনুরোধ করেন, তাকে যেন জাহাজে উঠিয়ে নেয়। অন্যসকল জাহাজ ঠিকই চলছিল কিন্তু তিনি যে জাহাজে উঠেছেন সেটা চলছিল না। ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদেরকে জানালেন, জাহাজে একজন পলাতক গোলাম রয়েছে। তিনি এর মাধ্যমে নিজেকেই বোঝাচ্ছিলেন। নিজেকে তিনি সমুদ্রে ফেলে দিতে বলেন। কিন্তু তারা এটা প্রত্যাখ্যান করে। তিনি লটারি দিতে বলেন। তারা তিনবার লটারি করে। প্রতিবারই ইউনূস আলাইহিস সালাম-এর নাম আসে। তখন তিনি নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। আল্লাহ তাআলা একটি মাছ পাঠান। মাছটি তাকে গিলে ফেলে।

সন্দেহ নেই, এই পরিস্থিতি দেখে তারা তার মৃত্যুর ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তাই সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তারা মৃত্যুর খবর জানিয়ে দিয়েছিল। এ কারণেই আলোচ্য বালকটি ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর কাছে সাক্ষ্য চেয়েছিল।

কুরআনুল কারিমের মাধ্যমে জানা যায় তিনি এরপর আপন সম্প্রদায়ের কাছে নবী হিসেবে ফিরে এসেছিলেন। আর পরবর্তীতে তিনি নবী হিসেবেই বহাল থাকেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা রক্ষা করতে বলেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন এটা না বলে যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম।'

দ্বিতীয় পাঠ

তাওবা আজাব উঠিয়ে নেয়। দুআ তাকদির পরিবর্তন করে দেয়।

এই বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো—আল্লাহ তাআলা দুই ধরনের তাকদির লিখেছেন।

এক. তিনি তাদের উপর শাস্তি পাঠানোর ফায়সালা করে রেখেছেন।

দুই. তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, দুআ ও তাওবা শাস্তিকে ফিরিয়ে দেয়।

ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তাআলার লিখিত প্রথম তাকদির সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর তিনিও আল্লাহর পক্ষ থেকে আপন সম্প্রদায়কে এ সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার দ্বিতীয় তাকদির, যা প্রথম তাকদিরকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে তিনি তা জানতেন না। আলোচ্য ঘটনা বোঝার জন্য এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার।

দেখা যাবে বহু আজাব নেমে আসার মতো ছিল; কিন্তু সঠিক-মনে তাওবার ফলে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে তাকদিরের বিভিন্ন ফায়সালা আমাদের অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। সঠিকভাবে দুআ করার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তা ফিরিয়ে দেন।

তৃতীয় পাঠ

মানুষের স্বভাব বিভিন্ন ধরনের। নবীদের স্বভাব অন্য মানুষের তুলনায় ভিন্ন।

আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কারণ, এ বন্দীদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা দেওয়া ছিল না। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শ দেন। অপরদিকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবদেরকে আতংকিত করে তোলার জন্য তাদেরকে হত্যা করার পরামর্শ দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘হে আবু বকর, তুমি ঈসা ইবনে মারিয়ামের মতো। ঈসা বলেছিলেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

> *“যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার বান্দা আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।”*[১]

‘আর হে উমর, তুমি নুহের মতো। নুহ বলেছিলেন—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

> *“হে আমার রব, আপনি পৃথিবীতে কোনো কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দেবেন না।”*[২], [৩]

বদান্যশীল ব্যক্তি সবসময় বদান্যতা প্রদর্শন করে। কৃপণ ব্যক্তি চিরদিন কৃপণ রয়ে যায়। নম্র ব্যক্তিরা সবসময় নম্রই থাকে। রাগী ব্যক্তি সবসময় রাগান্বিত রয়ে যায়। ঈমান মানুষের মধ্যে বেড়ি পরিয়ে দেয়; কিন্তু এটা মানুষের স্বভাবকে পরিবর্তন

[১] সুরা মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ১১৮
[২] সুরা নূহ, ৭১: ২৬
[৩] মুসনাদে আহমদ, ৩৬৩২। যঈফ।

করে না।

হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا

> *'মানুষ খনি-বিশেষ, জাহেলিয়্যাতের যুগে যারা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তারা ইসলামি জ্ঞান লাভ করে।'*[১]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহেলি যুগে যেমন নম্র ছিলেন ইসলামেও তেমন নম্র রয়ে যান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহেলি যুগে কঠোর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন ইসলামেও তিনি কঠোরতার পরিচয় দেন। খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহেলি যুগে প্রথম সারির একজন সমরবিদ ছিলেন ইসলামেও তিনি প্রথম সারির সমরবিদের স্বাক্ষর রাখেন।

কিন্তু এটি মন্দ চরিত্রের পক্ষে সাফাই হতে পারে না। কারণ চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নফস উৎকর্ষ লাভ করে থাকে। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদায় পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ঘটে থাকে। অন্যথায় এমন কোনো ব্যক্তি পাওয়া যাবে না, যে নারীদের প্রতি আগ্রহ রাখে না। এমন কোনো নারী পাওয়া যাবে না, যে পুরুষের প্রতি আগ্রহ রাখে না। এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না, যে ধন-সম্পদকে অপছন্দ করে। কিন্তু বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে পরিমার্জিত করে। তারা হালাল সম্পদ এবং উত্তম পন্থা অবলম্বন করে। আবার এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে যায়। হালাল-হারাম নির্বিশেষে তারা সম্পদ জমা করতে থাকে।

চতুর্থ পাঠ

জায়েজ ক্ষেত্রে লটারি করাটা ভিত্তিহীন বিষয় নয়। এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। এটা এক ভালো বিষয়।

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এটি নবীদের রীতি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে বের হওয়ার সময় স্ত্রীদের মধ্যে

[১] সহিহ বুখারি, ৩৩৮৩

লটারি করেছেন। লটারি থেকে যাঁর নাম বের হতো তিনি তাকে নিয়ে যুদ্ধ যেতেন।[১]

এর মাধ্যমে কোন স্ত্রীকে যুদ্ধে নিয়ে যাবেন—এ মধুর সমস্যার সমাধান হতো। এ ছাড়াও এতে স্ত্রীগণের মনোতুষ্টির বিষয় ছিল। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কাউকে নিয়ে গেলে অন্যান্য স্ত্রীগণের মনে কিছুটা ভিন্ন রকম ধারণা আসতে পারত। স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা-বিধান না করার বিষয়টি তখন চলে আসত।

কিন্তু লটারি এক চমৎকার সমাধান। এটা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি দান করে।

প্রয়োজনে আমরাও এই পন্থা অবলম্বন করতে পারি।

এক অর্থসংস্থায় আমি এ নীতি পরীক্ষা করেছিলাম। এ সংস্থার সদস্যরা সকলেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করত। এরপর যে-কোনো একজন সব অর্থ নিয়ে যেত। এভাবে করে প্রত্যেকের পালা আসত। প্রত্যেকেই ধারাবাহিকভাবে সকল অর্থ নিতে পারত। কিন্তু তাদের তিনজন প্রথমে অর্থ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। অন্যদের তেমন একটা প্রয়োজন ছিল না। আমি তাদের বললাম, তোমাদের তিনজনের নাম আমরা একটি কাগজে লিখব। এরপর আমরা একটি একটি করে তিনটি কাগজ ওঠাব। যার নাম প্রথমে আসবে সে প্রথমে টাকা গ্রহণ করবে। আর যার নাম দুই নম্বরে আসবে সে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করবে। এভাবে চলবে। এতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এক বন্ধুকে অন্য বন্ধুর ওপর প্রাধান্য দেওয়ার সমস্যা থেকেও তারা মুক্তি পায়।

পঞ্চম পাঠ

আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

মাত্র দুটি অক্ষরের মধ্যে তার সকল নির্দেশনা। তিনি বলেন, 'কুন' তথা হও, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

মানুষ-খেকো হিংস্র মাছকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সে ইউনূস আলাইহিস সালাম-কে গিলে নেয়। কিন্তু হজম করেনি। মাছের পাকস্থলী এবং তার হজমের উপাদানের কারণে তিনি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে এগুলো

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৪১৪১

থেকেও রক্ষা করতে পারতেন।

যে সত্তা আগুনকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর জন্য ঠান্ডা এবং নিরাপদ স্থান বানিয়ে দিয়েছেন, তিনি চাইলে মাছের পেটকে ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর জন্য ঠান্ডা এবং নিরাপদ স্থান বানাতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যতটুকু চান ততটুকুই রক্ষা করেন। যতটুকু বিপদে ফেলতে চান ততটুকুই বিপদে ফেলেন।

আমি জানি না, এমনটা বলা সঠিক হবে কি না যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর আমলের পার্থক্যের কারণে আল্লাহ কর্তৃক তাদের হেফাজতে পার্থক্য ঘটেছে। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলির ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি তা অত্যন্ত যত্নসহকারে পালন করতেন। তাই তিনি আগুন থেকে বের হয়ে এসেছেন। তার কোনো ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু ইউনুস আলাইহিস সালাম আজাব না আসায় রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে যান। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীতই তিনি এমনটি করে ফেলেন। নবুওয়াতের সম্মানের প্রতি লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা তার জীবনকে রক্ষা করেছেন। ঘটে যাওয়া এ কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য তিনি তাকে সমস্যায় নিপতিত করেন।

ষষ্ঠ পাঠ

মানুষের সঙ্গে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করুন।

যদিও আমাদেরকে সকলের সঙ্গে সদাচার করার আদেশ করা হয়েছে, তবুও অন্য সকলের চেয়ে কোনো কোনো মানুষের ব্যাপারে আমাদেরকে ভ্রাতৃত্বমূলক আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ করুন, প্রথমবার লটারিতে নাম আসার সঙ্গে সঙ্গেই লোকেরা ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে সমুদ্রে ফেলে দেয়নি। কারণ তিনি তাদের এক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতেম তাই-এর মেয়েকে সম্মান করেছিলেন। কারণ তার পিতা আরবের একজন মর্যাদাবান ও সম্মানিত লোক ছিলেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবের একজন সেনাপতি এবং প্রসিদ্ধ

ঘোড়সাওয়ার ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সেনাপ্রধানই বানিয়েছিলেন।

ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু জাহেলি যুগে সিংহ-প্রকৃতির ছিলেন। ইয়ারমুকের জিহাদেও তাকে মুজাহিদ বাহিনীর ডান অংশের নেতৃত্ব প্রদান করা হয়।

অভিজাত ও অনুগ্রহশীল ব্যক্তির পদস্খলন ঘটে গেলে তা হালকাভাবে গ্রহণ করুন।

বদান্য ও ইতর—উভয় শ্রেণীর মানুষই সমস্যা-সংকটে পড়ে থাকে। বদান্যশীলের সাহসিকতা ও বীরত্ব ইতর শ্রেণীর সাহসিকতা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।

কিছু মানুষ রয়েছে প্রয়োজন দেখা দিলেই যারা অন্যের কাছে হাত পাতে। আবার কিছু মানুষ রয়েছে যারা ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করলেও অন্যের কাছে এক লোকমা খাবার চায় না। ভিক্ষার লাঞ্ছনা থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করতে চায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কেমন গোলাম আজাদ করা উত্তম?' তিনি বলেন, 'যেটা মনিবের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান।'[১]

সপ্তম পাঠ

মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'মুসলমান কি ভীরু হতে পারে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' 'মুসলমান কি কৃপণ হতে পারে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' 'মুসলমান কি মিথ্যুক হতে পারে?' তিনি বলেন, 'না।'[২]

কারণ, মিথ্যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অভ্যাস। সকলেই তা ঘৃণা করে থাকে। অতীত এবং বর্তমান যুগের মানুষজন—সকলেই এই ক্ষেত্রে সমান।

ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায় মিথ্যাকে এত অপছন্দ করত যে, এর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছিল। আর ইউনুস আলাইহিস সালাম তো এই শাস্তি থেকেই পালায়ন করেছিলেন। মিথ্যা বলার অপরাধে বালকটিকে হত্যা

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৫১৮
[২] বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, হাদিস-ক্রম : ৪৪৭২

করে ফেলার আশঙ্কায় সে ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর কাছে সাক্ষ্য চেয়েছে।

যদি নবীকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী কাফের সম্প্রদায় মিথ্যাকে এমন অপছন্দ করতে পারে, এর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে, তাহলে পরম সত্যবাদী বিশ্বস্ত নবীর ওপর ঈমান আনয়নকারী মুসলমান কীভাবে মিথ্যুক হতে পারে!

ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম

আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِيْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُوْرَةٌ وَأَنَا مَأْمُوْرٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُوْلًا فَلْيُبَايِعْنِيْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُوْلُ فَلْيُبَايِعْنِيْ قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُوْلُ فَجَاءُوْا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا

'এক নবী জিহাদে বের হবার প্রাক্কালে নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, "এমন কোনো ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোনো নারীকে বিয়ে করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না, যে ঘর তৈরি করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না, যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং তার প্রসবের অপেক্ষায় আছে।"

অতঃপর তিনি জিহাদের জন্য বের হলেন। আসরের নামাজের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময় তিনি একটি জনপদের কাছাকাছি পৌঁছুলে সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ

পালনকারী। হে আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন!" সূর্যকে থামিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহ তাকে বিজয় দান করলেন। তিনি গনিমতের সম্পদগুলো একত্র করলে এগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য আগুন এল, কিন্তু আগুন তা জ্বালাল না। [১]

'ওই নবী তখন বললেন, "তোমাদের মধ্যে (গনিমত) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যেন আমার কাছে বায়আত হয়।" একজনের হাত তখন নবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। নবী বললেন, "তোমাদের গোত্রেই আত্মসাৎকারী রয়েছে। তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার হাতে বায়আত হয়। এ সময় দুব্যক্তি বা তিন ব্যক্তির হাত তার হাতে আটকে যায়। তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎকারী রয়েছে।" অবশেষে তারা গাভীর মস্তক-পরিমাণ স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। এরপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল।

'তবে আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রতি লক্ষ করে আল্লাহ আমাদের জন্য তা হালাল করে দিয়েছেন।' [২]

প্রথম পাঠ

ঘটনায় যে নবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তিনি ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম।

কুরআনুল কারিমে তার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে—

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ

'যখন মুসা তার যুবক (সঙ্গী)-কে বললেন।'[৩]

মুসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকাবস্থায় ইউশা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত

[১] পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য গনিমতের সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিল না। বরং তা এক স্থানে একত্রিত করা হতো। আকাশ থেকে আগুন এসে তা ভস্মীভূত করে দিত। আগুন না এলে বা তা ভস্মীভূত না হলে এ গনিমত আল্লাহর কাছে মাকবুল হয়নি বলে বিবেচিত হতো।—অনুবাদক

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩১২৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস-ক্রম : ১৭৪৭

[৩] সুরা কাহাফ, আয়াত-ক্রম : ৬০

লাভ করেননি। সমুদ্রে নিরাপদ রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে যখন ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন, এর কিছুদিন পরে মুসা আলাইহিস সালাম তার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তার অনুপস্থিতিতে সামেরি বনি ইসরাইল থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে একত্রিত করে। এর মাধ্যমে তাদের জন্য একটি গো-বৎস তৈরি করে তাদেরকে এর উপাসনা করতে বলে।

হারুন আলাইহিস সালাম তাদেরকে এটা করতে নিষেধ করেন। তিনি প্রাণান্তকর বাধা দিয়ে যান। মুসা আলাইহিস সালাম ফিরে আসা পর্যন্ত তারা গো-বৎসকে পূজা করার দৃঢ় সংকল্প করে। মুসা আলাইহিস সালাম ফিরে এসে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি গো-বৎসকে জ্বালিয়ে দেন। সামেরিকে বিতাড়িত করেন।

এরপর তাদেরকে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।' কিন্তু সেখানে এক শক্তিশালী সম্প্রদায় থাকার অজুহাতে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন তারা বহু স্পর্ধা প্রদর্শন করে। মুসা আলাইহিস সালাম-কে তারা এমনও বলেছে—

إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

> *'যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে আমরা কখনো সেখানে যাব না। বরং আপনি ও আপনার রব যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসলাম।'*[১]

আল্লাহ তাআলা তখন তাদেরকে তিহ ময়দানে প্রবেশ করান। ৪০ বছর পর্যন্ত তাদের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।

তারা সেই ভূমিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দিনে বের হতো, রাত পর্যন্ত চলতে থাকত। রাতে তারা ঘুমিয়ে নিতো। সকালে আবার সফর শুরু করতে চাইলে দেখত তারা গতকাল যেখান থেকে সফর শুরু করেছে এখন আবার সেখানেই চলে এসেছে।

তিহ ময়দানে অবস্থানের এ সময়েই হারুন আলাইহিস সালাম মারা যান। এর দুবছর পর মুসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা

[১] সুরা মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ২৪

ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম-কে নবুওয়াত প্রদান করেন। তাকে হিসেবে নির্বাচিত করেন। তিনি আমালেকাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেন। উল্লিখিত হাদিসে এ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

কখনো পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করবেন না; বরং ধরন অর্থাৎ গুণগতমান নিয়ে আলোচনা করুন। সংখ্যার আধিক্যের মাধ্যমে বন্ধু চেনা যায় না, চেনা যায় উত্তম আচরণের মাধ্যমে। বন্ধু-বান্ধবরা আপনাকে ঘিরে থাকাটা যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়। স্বচ্ছল অবস্থায় আপনার জন্য প্রকৃত বন্ধু চেনা সম্ভব হবে না। বিপদ আসুক, তখন দেখতে পাবেন কতজন বন্ধু আপনার পাশে থাকে।

ইউশা আলাইহিস সালাম-কে দেখুন, তিনি সঙ্গীদের গুণাগুণের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। তিনি জানেন, আধিক্য ও অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। আল্লাহর জন্য উৎসর্গপ্রাণ নির্বাচিত কিছু লোকের মাধ্যমেই বিজয় লাভ করা যায়। বহু লোককেই তিনি বাহিনীতে শরিক করেননি। তারা কোনো পাপাচারী বা গুনাহগার ছিল না, বরং তিনি যাদের মন অন্য কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে শরিক করেননি। তিনি ঐ ব্যক্তিকে শরিক করেননি যে কারও সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে কিন্তু এখনও ঘরসংসার করেনি। এখন যুদ্ধে এল স্ত্রীর কাছেই তার মন পড়ে থাকবে।

সেই ব্যক্তিকে শরিক করেননি, যে কোনো ঘর বানানো শুরু করেছে কিন্তু এখনো তা পূর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় যুদ্ধে শরিক হলে তার মন বাড়ির দিকে ঝুঁকে থাকবে।

তিনি সেই ব্যক্তিকে শরিক করেননি, যে গর্ভবতী উটনী অথবা মেষ ক্রয় করে তার প্রসবের অপেক্ষা করছে। এখন সে যুদ্ধে শরিক হলে তার মন উটনী এবং মেষের দিকেই ঝুঁকে থাকবে।

আমরা উক্ত বিষয় থেকে পরিমাণ নয়, শিখতে পারি কাজের এবং কর্মীর গুণাগুণের বিষয়টি। তেমনিভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, দুনিয়া মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। ঈমান মানুষের স্বভাবকে পরিমার্জিত করতে পারে কিন্তু একে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয় না। লোকজনের সঙ্গে চলাফেরার সময় আমাদেরকে বিষয়টি ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ প্রায়শই ভুলে

গিয়ে থাকে।

হাসান ইবনে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ছোট্ট শিশু। হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে তাকে কোলে নিয়ে বলেন—

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

> *‘আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।[১]*

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। মাত্র তিন আয়াত দিয়ে তিনি নামাজ শেষ করে ফেলেন। এরপর বলেন, ‘আমার আশঙ্কা হয়েছে সন্তানটির জন্য তার মা অস্থির হয়ে উঠবে।’

মানুষ ঈমান আনলেও তারা কখনও ফেরেশতা হয়ে যেতে পারে না। মুমিন সদা আপন সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও ধন-সম্পদের প্রতি ভালোবাসা রাখে। মুমিন নারীও আপন স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদের প্রতি ভালোবাসা রাখে। দ্বীন গ্রহণ করার অর্থ হারাম থেকে বেঁচে থাকা, জীবন থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া নয়।

মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করার সময় অবশ্যই এই বিষয়টি আমাদের ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

তৃতীয় পাঠ

সকল বিষয় আল্লাহ তাআলার হাতে।

জুমার দিন আসরের শেষ সময় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। জুমার দিন সমাপ্ত হয়ে শনিবার শুরু হয়ে গেলে বনি ইসরাইল যুদ্ধ করত না। এ কারণেই ইউশা আলাইহিস সালাম সূর্যকে সম্বোধন করে বলেছেন, ‘আমিও আদিষ্ট তুমিও আদিষ্ট।’

এটাই হলো প্রকৃত ঈমান। পাহাড় টলে গেলেও ঈমান টলে না। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল বিষয় আল্লাহ তাআলার হাতে। এই বিশ্বজগতের

[১] সুরা আনফাল, ৮: ২৮

ফেরেশতা, জিন, মানুষ, প্রাণী, পাখি ও জড়পদার্থ—সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ছোট্ট পিপীলিকা—সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশের সামনে সমান। কোনো জিনিসই তাকে অক্ষম করতে পারে না। কোনো কিছুই তার মর্যাদা ত্রুটিযুক্ত করতে পারে না।

আমাদেরকে যদিও উপকরণ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবুও উপকরণ গ্রহণ করা অবস্থায় আমরা ভুলে যাব না যে, এগুলো আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ তাআলার অনুমতি না হলে এ-সকল উপকরণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ফলাফল পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা চাইলে উপকরণ ব্যতীতই আমাদের দিতে পারেন।

স্মরণ রাখুন, মুমিন আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত। আল্লাহ মুমিনের সততা ও খোদানিষ্ঠা দেখলে তার জন্য বিশ্বজগতের নিয়ম-নীতি পরিবর্তন ও কম-বেশি করতে পারেন।

চতুর্থ পাঠ

একজন সেনাপতি শুধু যুদ্ধ-বিষয়ক জ্ঞান রাখলেই যথেষ্ট হবে না।

কোনো প্রতিষ্ঠান-পরিচালক শুধু পরিচালনা-বিষয়ক জ্ঞান রাখলেই যথেষ্ট হয় না। একজন ইঞ্জিনিয়ার, যাকে কর্মচারীদের খোঁজখবর রাখতে হয়, তার শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে দক্ষতা থাকলেই চলে না। একজন ডাক্তার, যাকে অসুস্থ ব্যক্তিদের খোঁজখবর রাখতে হয়, তার শুধু ডাক্তারি বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখলেই হয় না। সফল তো সেই ব্যক্তি যে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বোঝে। তাদের স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করে।

মানুষ দায়িত্বশীল ব্যক্তির আগে মানবিক ব্যক্তিকে পছন্দ করে। তারা আদেশদাতার আগে সাহায্যকারীকে পছন্দ করে।

জ্ঞানী দায়িত্ববান ব্যক্তি মানুষকে নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে নয়, বরং অন্তরের মাধ্যমে অনুগত করে রাখেন। বলা বাহুল্য, পরিচালকের প্রতি মায়া-মহব্বত হলে কর্মচারীরা স্বেচ্ছায় তার কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। তখন অনাবশ্যক কাজও তারা সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেবে।

ব্যর্থ দায়িত্বশীল হলো সে, যে নিজেকে নিয়ম-কানুনের গোলাম বানিয়ে রাখে।

হ্যাঁ, এটা সঠিক যে, মানুষের বিষয়গুলো ঠিক রাখার জন্য নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু ঝানু লোকদের নিয়ম-কানুন তৈরির প্রয়োজন হয় না, বরং তারা এমনিতেই মানুষকে নিজেদের অনুগত রাখতে পারে।

পঞ্চম পাঠ

নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যেও স্তর-ভেদ রয়েছে।

ইউশা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম-এর বাহিনীর প্রতি লক্ষ করুন। দুনিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রত্যেককে তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। দেখা গেল, খুব কম মানুষই তার নির্ধারিত মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। এমনকি এ নির্বাচিত মানুষদের মধ্যেই কেউ কেউ আবার গনিমতের সম্পদ চুরি করেছে।

তাই কারও প্রতি অন্ধভাবে আস্থা রাখবেন না। আবার মানুষের এই পরিমাণ দোষ অনুসন্ধান করবেন না যে, তা ওয়াসওয়াসার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করুন। সকল ধরনের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি পরিহার করুন।

এ দুনিয়া পুরোটাই এক জাদু ও ফেতনা। আল্লাহ তাআলা যাকে রক্ষা করেন সেই একমাত্র রক্ষা পেয়ে থাকে।

ষষ্ঠ পাঠ

আকিদার ক্ষেত্রে সকল নবী-রাসুল একমত। কিন্তু শরিয়তের ক্ষেত্রে তাদের ভিন্নতা রয়েছে।

পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন প্রত্যেকেই তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তারা উলুহিয়্যাতের দাওয়াত দিয়েছেন। মৃত্যু, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। কিন্তু ইবাদত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ তাআলাই এটি করেছেন। পূর্ববর্তী সকল উম্মতের ওপর গনিমতের সম্পদ হারাম ছিল। কিন্তু আমাদের শরিয়তে হালাল।

পূর্ববর্তী উম্মতের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল—যুদ্ধে বিজয়ী হলে গনিমতের সম্পদ একত্রিত করে একটি স্থানে রাখা হতো। তারপর আকাশ থেকে আগুন এসে তা

জ্বালিয়ে দিত।

এই যুদ্ধে আগুন প্রথমদিকে ইউশা আলাইহিস সালাম-এর গনিমতের সম্পদ জ্বালিয়ে দেয়নি। কারণ এতে কিছুটা ত্রুটি ছিল। এক ব্যক্তি গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল। ইউশা আলাইহিস সালাম যখন গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করার বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তদারকি করে সেটা গনিমতের স্তূপে এনে রাখলেন। এবার আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিল।

আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের গনিমত কবুল হওয়ার এটাই ছিল আলামত।

রাসুল-কন্যা যাইনাব ও আবুল আস ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

> *মক্কাবাসী যখন বদরযুদ্ধে বন্দী হওয়া স্বজনদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ স্বরূপ বিভিন্ন পণ্য প্রেরণ করছিল তখন আবুল আস ইবনে রবির মুক্তিপণ স্বরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ে যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কিছু অর্থ-সম্পদ পাঠান। তাতে তিনি একটি গলার হারও পাঠান। হারটি ছিল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র। আবুল আসের সঙ্গে বিয়ের সময় এটি যাইনাবকে দেওয়া হয়। হারটি দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তর অত্যন্ত বিগলিত হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'যদি তোমরা ভালো মনে করো তাহলে এই হারটি তাকে (যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা) ফেরত দিয়ে বন্দীকে মুক্ত করে দিতে পারো।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ।' তখন তারা তাকে মুক্ত করে দেন। যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র হার তাকে ফেরত দিয়ে দেন।'*[১]

প্রথম পাঠ

আবুল আস ইবনে রবি হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ে যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র খালাতো ভাই। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ হলেন তার মা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করে বলেন, 'আবুল আস ইবনে রবি'র কাছে আমি মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। সে আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছে এবং তা রক্ষা করেছে।'[২]

[১] মুসনাদে আহমদ, হাদিস-ক্রম : ২৬৩৬২
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৭২৯

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে আবুল আস যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করেছিলেন।

যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন প্রথম সারির একজন মুমিনা। তার প্রবল আশা ছিল, স্বামী তার পিতার নবুওয়াত ও রিসালাতকে সত্যায়ন করবেন। মেনে নেবেন। তিনি যখন যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ঈমান আনার বিষয়ে অবগত হন, তখন ঈমানের কারণে তাকে কোনো ধমক দেননি, তিরস্কারও করেননি। ঈমান থেকে বিচ্যুত করার কোনো চেষ্টাও করেননি।

বরং ভালোবাসাপূর্ণ ভাষায় বদান্যশীলদের পদ্ধতিতে বলেন, 'আল্লাহর কসম, তোমার পিতা আমার কাছে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি নন! তোমার সঙ্গে একই পথে চলার চেয়ে আমার কাছে উত্তম কোনো বিষয় নেই, হে প্রিয়তমা! কিন্তু আমি এটা অপছন্দ করি যে, লোকে বলবে, তোমার স্বামী আপন সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত করেছে। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য পিতৃপুরুষের ধর্মকে অস্বীকার করেছে। হে যাইনাব, তুমি কি আমাকে এই ক্ষেত্রে অপারগ মনে করবে না?' যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারলেন। তিনি আশা করতে থাকেন, একদিন এমন সময় আসবে যখন তার স্বামী মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যাবেন।

কুরাইশরা যাইনাবকে পৃথক করে দেওয়ার জন্য আবুল আসকে চাপ দিতে থাকে। তেমনিভাবে তারা আবু লাহাবের ছেলেদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দেওয়ার জন্য বলতে থাকে। আবু লাহাবের ছেলেরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয়। কিন্তু আবুল আস তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'না, আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রীকে পৃথক করতে পারব না। আমি আমার স্ত্রীর পরিবর্তে কুরাইশের অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করাটাও পছন্দ করি না।'

যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামীর কাছে বহাল থাকেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে থাকেন। ইসলামে তখনও মুশরিক স্বামী এবং মুমিন স্ত্রীর মধ্যে বাধ্যতামূলক বিচ্ছেদের বিধান নাজিল হয়নি।

বদরের ময়দানে মুসলমানরা যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখোমুখি হন আবুল আস তখন মুশরিকদের কাতারে ছিলেন। মুসলমানদের বিজয় এবং কুরাইশদের পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বহু মুশরিক নিহত হয়। অনেকে হয় বন্দী। বন্দীদের কাতারে আবুল আসও ছিলেন।

মক্কাবাসীরা বন্দীদের মুক্তির জন্য বিভিন্ন পণ পাঠায়। যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামীর মুক্তির জন্য গলার হার পাঠান। এ হারটি তার মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের সময় তাকে হাদিয়া দিয়েছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র এই হারটি চিনে ফেলেন। প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কথা স্মরণ হয়ে গেলে তার মন বিগলিত হয়ে যায়। তিনি সাহাবিদেরকে জামাতার মুক্তিপণের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে তার মায়ের স্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও তাদের সঙ্গে কথা বলেন। সাহাবিগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় সাড়া দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল আসকে মুক্ত করে দেন। সেই সঙ্গে তিনি যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে মদিনায় পাঠিয়ে দিতে বলেন। কারণ তখন মুশরিক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ চলে এসেছিল।

আবুল আস যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

তিনি মক্কায় গিয়ে দেখেন যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা অশ্রুসজল নয়নে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কারণে আবুল আসও ভগ্নহৃদয়ে তার কাছে গিয়ে বলেন, 'তোমার পিতা তোমাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলেছেন। কারণ ইসলাম আমার এবং তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। তুমি এখন আমার জন্য হালাল নও। আমি তোমাকে তার কাছে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছি। আমি এ ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারি না।'

যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কোনো আপত্তি জানাননি। তিনি আপন রবের নির্দেশ অনুসরণ করেন। আবুল আস তখন যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে আপন ভাই কিনানার সঙ্গে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেন। কিনানার দায়িত্ব ছিল তাকে যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে পৌঁছে দেওয়া।

যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখান থেকে তাকে মদিনায় নিয়ে যাবেন।

কিন্তু কুরাইশরা তাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। মক্কায় অবস্থান করা মুসলমানরা তখন অত্যন্ত দুর্বল ছিল।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে কুরাইশরা বদরপ্রান্তরে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। তাই কুরাইশরা তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। হাব্বার ইবনে আসওয়াদ যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র দিকে এগিয়ে আসে। সে বর্শার মাধ্যমে তাকে ভয় দেখায়।

কিনানা তখন তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে যান। তিনি নিজ তিরগুলো সামনে ছিটিয়ে চিৎকার করে বলেন, 'আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই তোমরা জানো আমার তিরের নিশানা ব্যর্থ হয় না। তোমাদের যে ব্যক্তি সামনে আসবে আমি তার শরীরে তির বিদ্ধ করে দেব।'

আবু সুফিয়ান তখন সামনে এসে বলেন, 'তির নামিয়ে ফেলো। আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি তির নামিয়ে ফেললে আবু সুফিয়ান তার কাছে এগিয়ে এসে বলেন, তুমি সকলের সামনে প্রকাশ্যে এ নারীকে নিয়ে বের হয়ে ভুল করেছ। তুমি তো জানো, আমরা এক বিপদের গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি আমাদের শোচনীয় পরাজয়ের কথাও জানো। এখন তোমরা এভাবে চলে গেলে মানুষ আমাদেরকে দুর্বল ভাববে। তারা একে আমাদের অপমান মনে করবে। কসম! তাকে তার পিতার কাছে যেতে বাধা দেওয়ার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি এখন ফিরে যাও। পরিবেশ শান্ত হলে তুমি একে নিয়ে যেয়ো।'

এরপর যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আপন পিতার কাছে পৌঁছে যান।

যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনায় হিজরতের পর স্বামী আবুল আসের কাছ থেকে প্রায় ছয় বছর বিচ্ছিন্ন থাকেন। এই সময় যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা পিতার কাছে অবস্থান করেন।

অপরদিকে আবুল আস ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকেন। তিনি বদরের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি কুরাইশদের এক ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে বের হয়েছিলেন। সেই ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে মক্কায় ফেরার সময় মুসলমানদের এক যোদ্ধাদলের সঙ্গে তাদের মুকাবিলা হয়। মুসলমানেরা তখন আবুল আসের সঙ্গে-

থাকা ধনসম্পদ নিয়ে নেন। আবুল আস পলায়ন করেন। এরপর তিনি রাতে লুকিয়ে যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কাছে যান। তার কাছে নিরাপত্তা চান। যাইনাব তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

ফজরের নামাজের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে ইমামতি করছিলেন, যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন চিৎকার করে বলেন, 'লোক সকল! আমি আবুল আস ইবনে রাবি'কে নিরাপত্তা দিয়েছি।'

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, তোমরা যা শুনেছ আমিও তাই শুনেছি। জেনে রাখো, মুসলমানদের অতি সাধারণ ব্যক্তিও সকল মুসলমানের বিপরীতে কাউকে আশ্রয় দিতে পারে।' [১]

এরপর তিনি যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কাছে গিয়ে বলেন, 'হে মেয়ে, তুমি তার সম্মান করো। সে যেন তোমার সঙ্গে একান্তে না থাকে। কারণ, তুমি তার জন্য হালাল নও।' যাঁরা তার সম্পদ হস্তগত করেছিলেন তিনি তাদের বলেন, 'তোমরা আমাদের এ লোকটিকে চেনো। তোমরা তার অর্থ-সম্পদ লাভ করেছ। আমি চাচ্ছি যদি অনুগ্রহ করে তা ফিরিয়ে দিতে! আর যদি তোমরা তা না করো তাহলে এটি আল্লাহ তাআলার সম্পদ, তোমরাই এর অধিক যোগ্য।'

তারা বললেন, 'আমরা অবশ্যই ফিরিয়ে দেব।' তারা তার সকল সম্পদ ফেরত দিয়ে দেন। এগুলো নিয়ে তিনি মক্কায় চলে যান। প্রত্যেককে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, 'হে কুরাইশগণ, তোমরা কেউ কি আমার কাছে কোনো কিছু পাওনা আছ?' তারা বলল, 'না। তুমি তোমার দায়িত্বে-থাকা সব আদায় করে দিয়েছ।'

তখন তিনি বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। আল্লাহর কসম! কেবল এই কারণেই তার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে থাকাবস্থায় আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি যে, তোমরা ধারণা করবে আমি তোমাদের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি!'এরপর তিনি হিজরত করে মদিনায় চলে যান। সেখানে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং

[১] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম: ২৭৫১

যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাবকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন। যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা আমৃত্যু তার সঙ্গে জীবন যাপন করেন। যাইনাবের মৃত্যুর কয়েক বছর পর তার স্বামী আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুও মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় পাঠ

যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কাছে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো বহু উপায় ছিল। বরং বিচ্ছেদের যত উপায়-উপকরণ হতে পারে তার সবগুলোই তার কাছে ছিল।

তখনকার পরিস্থিতি বলে দিচ্ছিল যে, অচিরেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তবুও তিনি তার সঙ্গে জীবনযাপন করতে থাকেন। কারণ তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন আর আবুল আসও তাকে খুব মহব্বত করতেন। তেমনিভাবে কাউকে ভালোবাসলে আমাদেরকে একসঙ্গে থাকার উপায় নিয়ে ভাবতে হবে। বিচ্ছেদের উপায় নিয়ে নয়। বাহ্যিক জোড়াগুলো ছিন্ন হয়ে গেলেও একমাত্র অন্তরই আমাদের সম্পর্কে জোড়া লাগিয়ে রাখতে পারে।

তিনি একজন মুমিন নারী ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ে ছিলেন। আর তার স্বামী ছিলেন কাফের। বিচ্ছেদের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। তিনি পিতা ও আপনজনদের ছেড়ে মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন। মক্কায় অবস্থান-করা দুর্বল মুসলমানদের একজন ছিলেন। স্বামী তার পিতা এবং তার ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু তবুও তিনি এসবের ওপর ধৈর্যধারণ করেছিলেন। কারণ তিনি তার সঙ্গে কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু বিচ্ছেদের কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম ছিলেন। মনের সঙ্গে মনের মিল হয়ে গেলে ব্যক্তিগত স্বার্থ সেখানে তিরোহিত হয়ে যায়।

সেখানে 'আমি' বলতে কিছু বিদ্যমান থাকে না; বরং সেখানে শুধুই 'আমরা' থাকে। মারাত্মক বিপদও এ সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না; বরং বিপদ এ ভালোবাসাকে আরও সুদৃঢ় করে।

আমাদের ব্যক্তিগত কষ্ট-মুসিবত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরং আমাদের

সকলের কষ্ট-মুসিবতই মুখ্য বিষয়।

তৃতীয় পাঠ

ইসলাম উত্তম আচরণের ধর্ম।

এ ধর্ম এমন এক সত্তার পক্ষ থেকে এসেছে, যিনি মানুষের আকার-আকৃতির প্রতি লক্ষ করেন না, বরং লক্ষ করেন মানুষের অন্তরের প্রতি।

তিনি সকল অন্তর ও রুহের চিকিৎসক। তার ধর্ম মানব-স্বভাবের অনুকূল, প্রতিকূল নয়। ভালোবাসা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়; বরং বহু ক্ষেত্রেই এটি ইবাদত। আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুভব-অনুভূতি দান করেছেন। তিনি কখনো এমন শরিয়ত প্রেরণ করবেন না, যা এই স্বভাব-অনুভূতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এই ধর্মের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র জন্য আবুল আসকে ভালোবাসতে বাধা প্রদান করেননি। যদিও তিনি অমুসলিম ছিলেন। তিনি যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক আবুল আসকে আশ্রয় দেওয়াটাকে অস্বীকৃতি জানাননি। যদিও আবুল আস যাইনাবের জন্য তখন হালাল ছিলেন না।

ভালোবাসা কোনো দোষ নয় যে, একে গোপন করে রাখতে হবে। কিংবা এটা কোনো অপরাধ নয় যে, এই কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে। বরং এটা অন্তরের বিষয়। আর অন্তর তো রহমানের দুই আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে।

তবে ভালোবাসার আদব রয়েছে। ইসলাম তার নীতিমালা তৈরি করে দিয়েছে। আবুল আসের সঙ্গে কী করা যাবে, কী করা যাবে না, যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা এ ব্যাপারে ভালোভাবেই জানতেন। ধর্ম তাকে যতটুকু অনুমতি দিত তিনি তাকে ততটুকুই ভালোবাসতেন। ঈমান ও ভালোবাসা—তার মধ্যে উভয়টি একই সঙ্গে ছিল। আবুল আসের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার পর যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা চাইলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারতেন।

দীর্ঘ ছয়টি বছর... কত দীর্ঘ সময়... আবুল আসকে ভুলে যাওয়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিল। তিনি চাইলে নতুন করে কারও সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারতেন।

কিন্তু আবুল আস ইসলাম গ্রহণের পর তিনি পুনরায় তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

চতুর্থ পাঠ

এক দিকে রয়েছে ভালোবাসায়-কুরবান-হয়ে-যাওয়া এক কন্যা, বিপরীতে রয়েছেন পিতৃত্বের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি-রাখা অত্যন্ত বিচক্ষণ এক পিতা।

যে লোকটি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তার মুক্তিপণ হিসেবে নবীজির স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র হার এসেছে; যেটা তিনি আপন মেয়েকে হাদিয়া দিয়েছেন। এতে নবীজির অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। একজন দয়ালু পিতার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ বিষয়টি লক্ষ করেন।

এরপর তিনি জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি এমন কোনো ব্যক্তি নন যার পিতৃত্ব তার ইনসাফের ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে। তিনি ইচ্ছা করলে নিজের পক্ষ থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারতেন। কেউই তার বিরোধিতা করত না।

কিন্তু তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তোমরা ভালো মনে করো তাহলে মুক্ত করে দেওয়া যায় আর মুক্তিপণ হিসেবে যেই হার এসেছে তা যাইনাবের কাছে ফেরত দিয়ে দেওয়া যায়।'

অপরদিকে আরেকটি বিষয় লক্ষ করুন। তিনি মেয়েকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে রাখেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটায় ততক্ষণ তিনি তাদেরকে বাধ্য করেননি।

এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তার ঘর থেকেও নবীজি নিজ কন্যাকে তুলে আনেননি। পিতৃত্বের ক্ষমতাবলে তিনি মেয়ে ও স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাননি। পিতৃত্বের অর্থ এটা নয় যে, সন্তানকে বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কিংবা এর অর্থ এটা নয় যে, নিজে নিজেই কোনো সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করে সেটাকে বাস্তবায়ন করে ফেলা হবে।

বরং পিতৃত্ব হলো—মায়া-মমতা ও উত্তম আচরণের এক কোল। এর কাজ হলো সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করা, সন্তানকে সাহায্য করা, তার বিচ্যুতিগুলো শুধরে দেওয়া।

মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে কিছু ভুল-ত্রুটি করার অধিকার সংরক্ষণ করে। কারণ, বহু বিষয় এমন আছে, আমরা ভুল করেই শিখে থাকি।

কখনো কখনো বোঝার জন্য আমরা অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী থাকি। অভিজ্ঞতার বিপরীতে তাত্ত্বিক উপদেশ তেমন একটা উপকারে আসে না।

সন্তান যে কাজ করতে চায় আপনি যদি সে-কাজে অসন্তুষ্ট হন, তাকে বাধা প্রদান করেন, তাহলে এটি তাকে সে-কাজ থেকে বিরত রাখবে না; বরং এর ফলে সে সর্বোচ্চ আপনার সামনে কাজটি করবে না।

এ-ধরনের ভুল সন্তানকে জীবন বুঝতে সাহায্য করবে। অবশ্য এমন ভুলের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যাবে না যেগুলোতে কোনো উপকার হয় না। অর্থাৎ যে ভুল থেকে শেখার কিছু নেই বরং বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যাবে না।

পিতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে জীবন-পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা। তারা কম ক্ষতিতে কীভাবে জীবনকে সফল করতে পারে সে ব্যবস্থা নেওয়া। তারা ভয় পাবে বলে জীবন থেকে তাদের হাত গুটিয়ে রাখা পিতৃত্ব নয়। সন্তানকে ভুল থেকে বিরত রাখাটা পিতার দায়িত্ব নয়; বরং ভুল অনুপাতে মোক্ষম সময়ে তাকে সতর্ক করাটাই তার দায়িত্ব। সন্তানকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনে বাধা দেওয়াটা পিতার দায়িত্ব নয়; বরং সেই অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত উপকারিতার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হলো তার দায়িত্ব।

সন্তান যাতে পড়ে না যায় এজন্য তাকে ধরে রাখাটা পিতার দায়িত্ব নয়; বরং পড়ে গিয়ে সে যেন নতুন করে দাঁড়াতে পারে এজন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই তার দায়িত্ব।

চিৎকার, চাপাচাপি ও বাধ্যকরণের মাধ্যমে সন্তানের মনের গভীরে নসিহত প্রদান করা যায় না; বরং এর আগে বুঝতে হবে যে, কখন সন্তানের নসিহতের প্রয়োজন, কখন ক্লান্তি-হেতু হেলান দেওয়ার মতো তার একটি কাঁধের প্রয়োজন, কখন তার কষ্ট শোনার মত কোনো কানের প্রয়োজন। আপনি এমন পিতা হবেন না, সন্তানেরা যাকে দেখে দৌড়ে পালায়! বরং এমন পিতা হোন সন্তানেরা যার দিকে দৌড়ে আসে।

এমন দেয়াল হোন, ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ জীবনের ক্লান্তিতে যাতে তারা হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পারে। এমন দেয়াল হবেন না, যা তাদের জীবন-পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; যা তারা ডিঙানোর চেষ্টা করে থাকে।

এমন ডাল হোন, মুক্তির সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে যে ডালে তারা আশ্রয় নিতে পারবে। এমন ডাল হবেন না, কষ্ট পাওয়ার কারণে মানুষ যেটাকে রাস্তা থেকে দূরে নিক্ষেপ করে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উত্তম আদর্শ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করছেন আর তার মেয়ে যাইনাব এসে উচ্চস্বরে বলছেন, তিনি মুসলমানদের শত্রু তার পূর্বের স্বামীকে আশ্রয় দিয়েছেন!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করেন। যারা বিষয়টি জানত না তিনি তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করেন। এরপর নিজ মেয়ের কাছে যান। অত্যন্ত নম্রভাবে তাকে এ পরিস্থিতির দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

মানুষের সামনে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিতে তিনি তাকে ধমক দেননি। পূর্ব থেকে অনুমতি না নেওয়ায় তিনি তাকে তিরস্কার করেননি। অপরিচিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়ায় তিনি তাকে কোনো অপবাদ দেননি। এর মাধ্যমে যাইনাব হকের ক্ষেত্রে সাহসিকতা এবং শক্তি লাভ করেন। আপন আবেগ-অনুভূতি সত্ত্বেও তিনি বুঝতেন, কোথায় তাকে থেমে যেতে হবে। তিনি জানতেন, এই ভালোবাসার কতটুকু তার অনুকূলে আসবে এবং কতটুকু যাবে প্রতিকূলে।

পঞ্চম পাঠ

ভালোবাসা সাধারণ কোনো বিষয় নয়, এক মহান বিষয়। এটি সবসময় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।

অর্থ-সম্পদ ও টাকা-কড়ি থাকলে সকলেই আপনার সাথে সম্পর্ক করতে চাইবে। আপনাকে ভালোবাসবে। কবিরা আপনার ভালোবাসায় শব্দের খই ফোটাবে।

কিন্তু ভালোবাসা তো অন্তরের বিষয়। এটা ভাষায় প্রকাশ করার জিনিস না।

যারা আপনার ভালোবাসায় শব্দের খই ফোটায়, যারা আপনার জন্য শব্দের শৈলী সাজায়, দুঃসময়ে আপনি তাদের খুঁজে পাবেন না। তারা আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে।

পক্ষান্তরে প্রকৃত প্রেমিক—যে ভালোবাসা ও মহব্বতের কথা মুখে প্রকাশ করতে

পারে না—সে আপনার পাশেই পড়ে থাকবে। কারণ তার অন্তরজুড়ে শুধুই আপনি। ভালোবাসার দাবিদারদের দেখবেন, বহু ক্ষেত্রেই তারা আপনার জন্য কোনো কষ্ট করতে রাজি নয়। তারা আপনার সাথে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে ইচ্ছুক নয়। কারণ তারা আপনাকে মন থেকে ভালোবাসে না।

আপনি তাদেরকে যেমন ভাবছেন, আসলে তারা তেমন নয়। তাহলে আপনি কেন তাদেরকে ভালোবাসতে যাবেন?

আপনি যতদিন পর্যন্ত তাদের কাছে সহজ-সরল ও হাস্যোজ্জ্বল থাকবেন ততদিন আপনি তাদের কাছে উত্তম হিসেবে বিবেচিত হবেন। কিন্তু আপনি কঠোর অবস্থানে গেলে তারা আপনাকে ছেড়ে হাজারটা সঙ্গী-সাথি জুটিয়ে নেবে। তারা আপনার পথ ছেড়ে দিয়ে হাজারও নিষ্কণ্টক পথ বেছে নেবে।

এই সকল বিপদ-আপদ ও দুর্গম পথ আপনার সামনে কল্যাণের দুয়ার খুলে দেবে। এর মাধ্যমেই আপনি প্রকৃত প্রেমিক এবং নকল প্রেমিকের পরিচয় পেয়ে যাবেন।

বুঝতে পারবেন আসলে কারা হৃদয় দিয়ে আপনাকে ভালোবাসে আর কারা শুধু মুখে মুখেই ভালোবাসার বুলি আওড়ায়।

ভালোবাসা তো এক আগুন। যা হৃদয়কে ছারখার করে দেয়। প্রকৃত প্রমিক তো কখনো এ আগুনে কষ্ট অনুভব করবে না।

কারও ভেতর ভালোবাসার আগুন জ্বলতে থাকলে প্রেয়সী হাজারও মাইল দূরে অবস্থান করলেও সে তার অন্তরেই বিদ্যমান থাকে। উপস্থিত লোকদের মাঝেই সে তাকে দেখতে পায়। হাজারও ব্যস্ততার মধ্যেও সে তার জন্য মুচকি মুচকি হাসে। তার স্মরণে চোখের পানি ঝরায়।

এই ভালোবাসার কারণেই যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা আবুল আসের জন্য মায়ের স্মৃতি বিজড়িত হার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অধীর অপেক্ষায় ছিলেন, স্বামী তার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলেও ফিরে আসবেন নিরাপদে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে সকলের সামনে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আমি আবুল আসকে আশ্রয়ে দিয়েছি!' তিনি তাকে ছাড়া অন্য কারও কাছে বিবাহ বসতে রাজি হননি।

সন্দেহ নেই, যাইনাব ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিতা একজন নারী। কিন্তু তার এ আচরণ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কেননা ভালোবাসার প্রশ্নে নারীরা পুরুষের চেয়েও বেশি উদার-উদগ্রীব হয়ে থাকে। কাউকে ভালোবাসলে তার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে দেয়। অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু পুরুষেরা এটা পারে না।

তবে আবুল আসের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'কে ছেড়ে তিনি অন্য কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হননি। কুরাইশের লোকজন তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, 'যদি তুমি যাইনাবকে তালাক দাও তাহলে তোমার কাছে কুরাইশের সম্ভ্রান্ত মেয়ে বিয়ে দেব।' তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কসম আল্লাহর! আমি আমার স্ত্রীকে ছড়তে পারব না। আমি তার পরিবর্তে কুরাইশের অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না!'

এ ক্ষেত্রে তিনি কোনো ধরনের লজ্জা ও সংকোচবোধ করেননি। তিনি বলেননি, 'যাইনাব তো আমার ধর্ম পরিত্যাগ করে ফেলেছে! আপন সম্প্রদায়ের মাঝে আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে! তাই তাকে কেন রাখবো?'

এমনকি যখন যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে ছেড়ে মদিনায় চলে গেলেন তখনও তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। এভাবেই ছয় বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়েও তিনি যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র কথা ভুলতে পারেননি।

তিনি এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। ভালোবাসার টানে একসময় যাইনাবের কাছে ফিরে এসেছেন।

ষষ্ঠ পাঠ

আপনি নিরাশ হবেন না।

নিষ্ঠুর অন্তরও মাঝে-মধ্যে নরম হয়ে যায়।

দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তিটি কখনো নিকটে চলে আসতে পারে। অসম্ভব বিষয় সম্ভব হওয়ার জন্য কখনো মাত্র কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।

যেটাকে আজ অসম্ভব মনে করছেন, আগামীকালই তা আপনার সামনে হাজির দেখতে পারেন। উত্তম ও কল্যাণকর বিষয়গুলো আমাদের কাছে পৌঁছতে সবসময় কিছুটা সময় নেয়। কিন্তু এগুলো একদিন অবশ্যই পৌঁছে থাকে।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ক্ষণিকের সাক্ষাৎ কখনো বহু বছরের প্রতীক্ষার কষ্ট মুছে দিতে পারে। কিন্তু এর পূর্বে আপনাকে বুঝতে হবে, যে-কোনো বিষয়ে অপেক্ষা করা উচিত।

আপনাকে বুঝতে হবে যে, এক অন্তরের ওপর অপর অন্তরের অধিকার রয়েছে। দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে তা খোলার অপেক্ষা করবেন না। এ দরজা আপনাকে স্বাগত জানাবে না।

প্রথমে জানুন, আপনি আসলে কী চান। এরপর আপনি আপনার রাস্তায় চলতে থাকুন। বেশি ডান বা বামে তাকাবেন না। আপনি এই পথে চলতে গিয়ে সম্মুখীন হতে পারেন বহু কষ্টের! বহু বাধার! বহু জায়গায় হোঁচট খেতে পারেন! বহু জায়গায় দেখতে পারেন যে, পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে! হতাশার বহু চিহ্ন ফুটে উঠতে পারে! দীর্ঘ ক্লান্তির পরে মনে হতে পারে যে, বোধহয় আত্মসমর্পণের সময় চলে এসেছে!

কখনো দেখবেন এ পথের অনেক পথিক ঝরে গেছে। আপনি অচিরেই বুঝতে পারবেন, কখন আপনাকে তড়গড়ি করে এগিয়ে যেতে হবে আর কখন অপেক্ষা করতে হবে। কখন আপনাকে পদক্ষেপ নিতে হবে আর কখন অপেক্ষা করতে হবে। কখন আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সারা দিতে হবে।

তখন গন্তব্যে পৌঁছে যা অর্জন করবেন কখনো রাস্তায়ই এর চেয়ে অধিক সুস্বাদু ও আনন্দের বিষয় অর্জন করতে পারবেন।

সপ্তম পাঠ

ইসলাম আগমনের পূর্ব থেকেই আরবদের আচার-ব্যবহার ও চরিত্র অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রশংসনীয় ছিল। আরবরা কখনো কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করত না। অতীতে তারা কোনো অঙ্গীকার দৃঢ় করতে চাইলে শুধু মুখের ভাষাতেই অঙ্গীকার প্রদান করত। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তাদের কাছে ব্যক্তিত্বের ওপর এক আঘাত ছিল। আরবদের ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত উঁচু।

অঙ্গীকার পূরণ করা সম্পর্কে তাদের বহু ঘটনা রয়েছে; যা আমাদেরকে অবাক করে দেয়।

হানি ইবনে মাসউদ শাইবানি। পারস্যে তিনি সম্রাটের সামনে দৃঢ়চেতা ছিলেন।

বাদশাহর হুমকি-ধমকি তাকে ওয়াদা পূরণে বাধা দিতে পারেনি। সব বাধা উপেক্ষা করে নুমান ইবনে মুনজিরের আমানত এবং তার পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন।

এমনিভাবে অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে সামওয়াল এক প্রবাদবাক্য হয়ে আছে।

তাই (কারও অঙ্গীকারপূরণের প্রশংসা করতে গিয়ে) মানুষ বলে থাকে, 'সামওয়ালের চেয়েও অধিক অঙ্গীকারপূরণকারী।'

ঘটনাটি হলো—ইমরাউল কায়েস তার কাছে কিছু বর্ম ও অস্ত্র আমানত রাখে। এরপর সে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদন নিয়ে রোমান বাদশাহর কাছে গমন করে। হারেস ইবনে সিমার গাসসানি এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। তাই সে সামওয়ালকে গচ্ছিত সরঞ্জামগুলো দিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। সে সামওয়ালের কাছ থেকে এগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে থাকে। কিন্তু সামওয়াল তা দিতে অস্বীকার করে। সে তাইমা প্রাসাদে আশ্রয় নেয়।

সামওয়ালের ছেলে প্রাসাদের বাইরে ছিল। হারেস গাসসানি তার ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

তার মাধ্যমে সে দরকষাকষি করতে থাকে। আবেদনে সাড়া না দিলে ছেলেকে হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু সামওয়াল অঙ্গীকার পূরণে অটল থাকে। একসময় তার চোখের সামনেই তার সন্তানকে জবাই করা হয়। তবুও সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনি।

আরবদের এ সংক্রান্ত বহু ঘটনা রয়েছে। এটা সেগুলো উল্লেখ করার স্থান নয়।

ইসলাম এসে আরবদের বহু গুণাবলি বহাল রেখেছে।

এগুলোকে উত্তম এবং উন্নত চরিত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন আরবদের সাহসিকতা ও বীরত্ব। প্রয়োজনগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। মেহমানের সম্মান করা। কেউ সাহায্য প্রার্থনা করলে বা আশ্রয় চাইলে তাকে সাহায্য করা ও আশ্রয় দেওয়া। সম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিত্ব—প্রভৃতি গুণাবলি প্রাচীনকাল থেকেই আরবদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এবার আমরা প্রাচীনকালের সেই আরব এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার মধ্যে তুলনা করব। বর্তমানে সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক, কিন্তু তাদের আশ্রয় দেওয়ার মতো লোকের সংখ্যা নগণ্য। বহু মানুষ আশ্রয় চাচ্ছে কিন্তু কে তাদের আশ্রয়

দেবে?

পূর্বের আরবরা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। কিংবা লজ্জায় পড়ে আমরা তাকে গায়েব করে রেখেছি, যেন রাতের আঁধারে আরব-আভিজাত্য উলঙ্গ হয়ে পড়েছে।

আমাদের মধ্যে-থাকা সর্বোৎকৃষ্ট অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করাকে আমরা আজ ফ্যাশন-স্টাইল বানিয়ে নিয়েছি। যুগোপযোগী ভাষার নামে আমরা আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ ভাষা পরিত্যাগ করে কিছু শূন্যগর্ভ ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছি। বিশ্বের চোখে অধিক সভ্য হওয়ার জন্য নিজেদের ব্যক্তিত্ব ঝেড়ে ফেলছি।

বিপদাপদে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে আমরা ভাই-বন্ধুদের পরিত্যাগ করছি। কেউ যেন জঙ্গি না বলে এজন্য আমরা ধর্ম থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি।

কেউ যেন আমাদেরকে আরব আখ্যা না দেয় এজন্য আমাদের সকল চমৎকার বৈশিষ্ট্য ঝেড়ে ফেলছি।

আল্লাহর ওপর স্পর্ধা প্রদর্শনকারী

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ

> *'বনি ইসরাইলের দুই ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তাদের একজন গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকত আর অপরজন ইবাদত-বন্দেগিতে থাকত মগ্ন।*
>
> *ইবাদতগুজার ব্যক্তিটি তার বন্ধুকে গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখে বলত, "তুমি বিরত হও।" একদিন তাকে গুনাহ করতে দেখে বলল, "তুমি বিরত হয়ে যাও।" তখন ঐ ব্যক্তিটি বলল, "আমাকে আমার রবের হাতে ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার ওপর রক্ষণাবেক্ষণকারী করে পাঠানো হয়েছে?"*
>
> *ইবাদতগুজার ব্যক্তিটি বলল, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না!" কিংবা সে বলেছে, "আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।"*
>
> *এরপর তাদের উভয়ের রুহ কবজা করা হয়। তারা উভয়ে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে একত্রিত হয়। আল্লাহ তাআলা তখন ইবাদতগুজার লোকটিকে বললেন, "তুমি কি আমার ব্যাপারে জানতে কিংবা তুমি কি*

> *আমার ক্ষমতার ওপর কর্তৃত্ববান?" আর পাপাচারীকে বললেন, "যাও, তুমি আমার রহমতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করো।" এবং অপরজন (অর্থাৎ ইবাদতগুজার ব্যক্তির) ব্যাপারে (ফেরেশতাদের) বললেন, "তোমরা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও।"* [১]

প্রথম পাঠ

নেক আমল এবং ইবাদত-বন্দেগিতে অধ্যবসায় মানুষকে বান্দা থেকে ইলাহের স্তরে পৌঁছে দিতে পারে না।

কিছু মানুষ আছে যারা নামাজ-রোজা করে আর নিজেদেরকে আল্লাহর স্থানে নিয়ে যায়। মানুষকে তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ভাগ করে। তারা বলে, 'এই দল জান্নাতি, অমুক দল জাহান্নামি।' যেন জান্নাত-জাহান্নামের ঠিকাদারি তাদের হাতে! আখেরাতের বিচারের ময়দানে যেন সে-ই কাজি। আমলের অহংকার তাকে ভুলিয়ে দেয় যে, সে নিজেও আল্লাহ তাআলার রহমতের অধীন। তার কোনো আমলই সরাসরি কবুল হয় না।

আমরা তো আমলের মাধ্যমে 'আরাফ' পর্যন্ত নাও পৌঁছতে পারি, জান্নাত তো আরও দূরের বিষয়। তবুও সে মনে করে যে, বান্দার ওপর বিচার করার দায়িত্ব তার হাতেই অর্পণ করা হয়েছে। সে নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে তাদের বিচার করে। মনে করে, সে নিজে এত উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছে যে, এখন আল্লাহ তাআলার গায়েবি বিষয়ে সে কথাবার্তা বলতে পারে। আল্লাহর ওপর এতটাই স্পর্ধা দেখায়, যেন আকাশে পৌঁছার জন্য তার একটি দরজা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে সে দেখতে পারে যে, কারা জান্নাতি আর কারা জাহান্নামি! আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার রহমতের অধীন। তিনি চাইলে আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আমলকারী, পাপাচারী, চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারী, ত্রুটিকারী—সকলেই আমরা এই আশায় আল্লাহর ইবাদত করি যে, হতে পারে আমরা তার রহমত লাভ করব, এর মাধ্যমে তার মাগফিরাত পাওয়ার যোগ্য হব।

---

[১] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস-ক্রম : ৪৯০১

দ্বিতীয় পাঠ

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধের অর্থ অন্যদের দোষ-ত্রুটির পাহারাদার বনে যাওয়া নয়। এর অর্থ এটি নয় যে, আমরা অশ্লীল বিষয়গুলো আলোচনার টেবিলে উঠিয়ে নিয়ে আসব। বরং এর অর্থ হলো কারও থেকে কোনো গুনাহ বা অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখলে তাদেরকে ঘৃণা না করে বা তাদেরকে আঘাত না দিয়ে সতর্ক করব।

যেমন যদি কাউকে দেখতে পান, সে তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়ছে, তাহলে তাকে তিরস্কার বা আঘাত দেওয়ার পরিবর্তে তার কাছে বিনয়ের সঙ্গে নামাজ পড়ার ফজিলত তুলে ধরুন।

কোনো নারীকে পর্দার ক্ষেত্রে শিথিলতা করতে দেখলে তার কাছে উলঙ্গপনার দোষত্রুটি তুলে ধরার পরিবর্তে পর্দা পালনের সৌন্দর্য এবং ভালো দিকগুলো তুলে ধরুন।

কোনো লোককে গিবত বা কূটনামিতে লিপ্ত দেখলে তাকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করার পরিবর্তে জানিয়ে দিন, মৃত মানুষের গোশত খাওয়া থেকে আমরা আমাদের নফসকে যেন পবিত্র রাখি।

আশার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগি করা যায়। আবার ভয়ের মাধ্যমেও তার ইবাদতে মগ্ন হওয়া যায়।

আপনি আল্লাহর পথের দাঈ হয়ে থাকলে মানুষের কাছে আল্লাহর রহমতের কথা তুলে ধরুন। তাহলে তারা ভালোবেসেই আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে আসবে। তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা উল্লেখ করুন, তাহলে তারা আল্লাহকে ভয় করবে।

সাবধান, তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেবেন না!

আপনি ধারণা করছেন যে, আপনি তার সাহায্য করছেন, অথচ হতে পারে এটি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এক মন্দ আচরণ। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

যে ব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছিল সে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশকারী দাঈকে পেয়ে তার মাধ্যমে একশ'র কোটা পূর্ণ করেছে। এরপর যখন পরম দয়াময় ক্ষমাশীল আল্লাহর রহমতের রাস্তা প্রদর্শনকারী দাঈকে পেয়েছে

তখন তাওবা করেছে।

আল্লাহকে ডাকার পূর্বে প্রথমে আল্লাহকে চিনুন। না জেনে তার ব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না। অন্যথায় এ অজ্ঞতার কারণে আপনি নিজের আমলকে নিচে নামিয়ে ফেলবেন, যে ব্যক্তি তার রবের কাছে ফিরে যাওয়ার রাস্তা অনুসন্ধান করছে তার দরজা রুদ্ধ করে বসে থাকবেন!

তৃতীয় পাঠ

শব্দ প্রয়োগে সতর্ক হোন! বহু কথা রয়েছে যা তার বক্তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

> *'মানুষ হয়তো আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কোনো কথা বলে, সে একে তেমন কিছু মনে করে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বহু উঁচু করে দিয়ে থাকেন। আবার মানুষ কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে ফেলে, সে একে তেমন কিছু মনে করে না, কিন্তু এ কারণেই সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'*[১]

আমাদের কথাগুলো কর্তনকারী তরবারির ন্যায়। তাই অসতর্ক অবস্থায় এর প্রয়োগ ঘটাবেন না। মন্দ কথা আপনার এবং আশপাশের মানুষদের মধ্যকার সম্পর্কের বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। আবার কখনো একটি উত্তম কথাই সুসম্পর্ক গড়ে দিতে পারে।

তাহলে যে বাক্য আল্লাহ এবং তার বান্দার সম্পর্ককে নিঃশেষ করে দেয় তা কত জঘন্য হতে পারে! আবার কোনো কোনো কথা বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দিতে পারে।

স্মরণ রাখুন, আপনি এমন মানুষকে সম্বোধন করছেন, আল্লাহর সঙ্গে তার কেমন সম্পর্ক তা আপনি জানেন না। আপনি তাকে কোনো এক পাপাচারে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৬৪৭৮

লিপ্ত দেখেছেন আর বলে ফেলেছেন—'আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না!' এভাবে বান্দাকে তার রবের ব্যাপারে নিরাশায় ঠেলে দিচ্ছেন!

অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন—

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

> *'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন।'*[১]

আকাশের বিষয়ে ফায়সালা দেওয়ার আপনি কে, আপনি জান্নাত-জাহান্নামের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছেন! আল্লাহ তাআলা নিজেই যা বলেননি আপনি তার ব্যাপারে সেটা বলার কে?

গুনাহ আকাশকে ছুঁয়ে ফেললেও তো তিনি একদিনের জন্যও তাওবার দরজা বন্ধ করেন না। তিনি তো ওই সত্তা, কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে যিনি এক ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

যিনি তার নবীকে বলছেন—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

> *'হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আজাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোনো করণীয় নেই। কারণ তারা অন্যায়ের ওপর রয়েছে।'*[২]

তাহলে এক্ষেত্রে আপনার করণীয় কী থাকে?

চতুর্থ পাঠ

এক বন্ধু অপর বন্ধুর আয়না।

বন্ধু তো সে নয়, যে আপনার জন্য গুনাহকে সজ্জিত করে তোলে এবং গুনাহকে নিয়মিত করতে সহযোগিতা করে; বরং বন্ধু তো সে, আপনি উদাসীন হয়ে গেলে

[১] সুরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৫৩
[২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত-ক্রম : ১২৮

যে আপনাকে সজাগ করে দেয়, ভুল হয়ে গেলে শুধরে দেয়, পথ হারিয়ে ফেললে পথ বাতলে দেয়, গর্তে পড়ে গেলে উদ্ধার করে, ভালো কাজ করলে আপনার হাতে ধরে, মন্দ কাজ করলে তাতে মৃদু আঘাত করে। বন্ধু তো আপনার বর্ম। যে আপনাকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করে চলে। যদিও এই শত্রু আপনার নিজের নফস হয়।

হাদিসে উল্লিখিত ঘটনায় দুজন বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নয় বরং বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ভালো বন্ধুটি খারাপ বন্ধুকে তাওবা করাতে চেয়েছিল। তাই সে দাওয়াতের ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে দাওয়াতের পদ্ধতি-বিষয়ে ভুল করেছে।

নিয়ত ভালো হলেও ভুল পদ্ধতি আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। তেমনিভাবে ভালো নিয়ত মন্দ পদ্ধতিকে সঠিক করে দিতে পারে না। পদ্ধতি এবং শৈলী হলো চিন্তা-চেতনা পরিচালিত হওয়ার মূল ভিত। ব্যক্তি এর মাধ্যমে আপন চেতনাকে উত্তম ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে।

কিন্তু এর বিপরীত হয় না। বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা আপনাকে আল্লাহর সঙ্গে মন্দ আচরণের অনুমতি দেয় না। তার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া আপনাকে আল্লাহর সীমা লংঘন করার সুযোগ এনে দেয় না। আমাদেরকে ভালো নিয়ত এবং ভালো নিয়তের মাধ্যমে মন্দ দমনের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে হবে।

পঞ্চম পাঠ

শেষ ভালো যার সব ভালো তার। তাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে।

আপনি সবসময় আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত-বন্দেগি করুন। কিন্তু ভুলে যাবেন না, উত্তম পরিণাম এবং দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে সবসময় তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

মন্দ পরিণাম বহু বছরের ইবাদত-বন্দেগিকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারে। উত্তম পরিণাম আপনার বিগত দিনের বহু গুনাহ্ মিটিয়ে দিতে পারে।

স্মরণ রাখুন, যদি আল্লাহর রহমত এবং করুণা লাভ না হয় তাহলে আপনার আমল আল্লাহর ব্যাপারে আপনার কোনো কাজে আসবে না।

আপনি যতই উত্তম আমল করুন, এ কথা কখনো ভুলে যাবেন না—আপনি

অত্যন্ত দুর্বল এক সৃষ্টি।

এই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি দিনে সত্তরেরও অধিকবার আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতেন এবং তাওবা করতেন।'[১]

অথচ আল্লাহ তাআলা তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল গুনাহ (উদাহরণস্বরূপ) ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২]

কোনো আমল আপনাকে আল্লাহ তাআলার রহমত এবং তার মাগফিরাত থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিতে পারে না। তার রহমত ও মাগফিরাতের মাধ্যমেই আপনি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছুতে পারেন। আর এ দুটি না থাকলে আপনি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে পারেন।

তাই নিজ আমলের ওপর নির্ভর করবেন না। ভালো কাজের মাধ্যমে ধোঁকা খাবেন না।

শরীরে একটি গোশত-খণ্ড রয়েছে। যদি তা ভালো হয় তাহলে গোটা শরীর ভালো থাকে। আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে গোটা শরীরটাই বিনষ্ট হয়ে যায়। তা হলো—অন্তর।[৩]

এই অন্তর ভালো হওয়া বা মন্দ হওয়াটা রহমানের দুই আঙুলের মধ্যে।

হাদিসে এসেছে—'তোমাদের কেউ সারা জীবন জান্নাতের আমল করে থাকে, এমনকি তার এবং জান্নাতের মধ্যে শুধু একহাত দূরত্ব বাকি থাকে, এমন সময় কিতাব (তাকদির) তার ওপর অগ্রগামী হয়ে যায়, তখন সে জাহান্নামিদের আমল করে জাহান্নামে নিপতিত হয়।

আবার তোমাদের কেউ সারা জীবন জাহান্নামিদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার এবং জাহান্নামের মধ্যে শুধু একহাত দূরত্ব বাকি থাকে, তখন কিতাব (তাকদির) তার ওপর অগ্রগামী হয়ে যায়, তখন সে জান্নাতিদের আমল করে জান্নাতে প্রবেশ করে।'[৪]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম :৬৩০৭
[২] সুরা ফাতাহ, আয়াত-ক্রম : ২
[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৫২
[৪] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩২৩২

ষষ্ঠ পাঠ

আল্লাহ তাআলার আদালতে ইনসাফ ব্যতীত ভিন্ন কিছু পাওয়া যাবে না।

সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের সুযোগ করে দেবেন। উল্লিখিত ঘটনায় দেখতে পেলাম যে, তাদের মধ্যকার বিষয়টি মূলত আল্লাহ এবং বান্দার সম্পর্কিত বিষয় ছিল।

এ ক্ষেত্রে হক ছিল আল্লাহ তাআলার। যিনি অত্যন্ত দয়ালু। তার এক বান্দা তার রহমতকে খাটো করে দেখিয়েছে। যিনি পরম ক্ষমাশীল, একজন সাধারণ মানুষ তার ক্ষমার ব্যাপারে অন্যকে সন্দেহে নিপতিত করেছে।

অর্থাৎ তার কাছে দুই ব্যক্তি আসল। এক ব্যক্তি ঠিকঠাক আমল করেছে কিন্তু আল্লাহর প্রতি সে মন্দ ধারণা পোষণ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা কখনো তাকে (তার বন্ধু) ক্ষমা করবেন না। আর অপরজন গুনাহ করে এসেছে। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে তার ধারণা ভালো ছিল। সে বলেছে, 'আমাকে এবং আমার রবকে ছেড়ে দাও।'

আর আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, 'বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে আমি তার প্রতি তেমন আচরণ করে থাকি।' [১]

পাপাচারী কিন্তু আল্লাহর প্রতি উত্তম ও সুধারণা পোষণকারী, তাকে তিনি রহমতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। আর উত্তম আমলকারী কিন্তু কুধারণা পোষণকারী, তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করালেন।

দেহের ইবাদত যদি অন্তরের ইবাদতের সঙ্গে মিলিত না হয় তাহলে আকাশের দাঁড়িপাল্লায় তার কোনো ওজন নেই। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো তার রহমত, ইনসাফ, ক্ষমা, প্রতিদান এবং শাস্তির ওপর ঈমান আনা।

যদি গুনাহের পর আপনার মধ্যে অনুশোচনা তৈরি হয় তাহলে এটি আপনাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিতে পারে। আর যদি কোনো ভালো আমল করার পর আপনার মধ্যে অহংকার চলে আসে তাহলে এটি আপনাকে আপনার অজান্তেই জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিতে পারে।

তাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখুন।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৭৪০৫

জাহেলি যুগের প্রথম শপথগ্রহণের ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِيْ هَاشِمٍ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِيْ إِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ أَغِثْنِيْ بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِيْ لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوْا عُقِلَتْ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيْرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِيْ اسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّيْ رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَتَبَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ بَنِيْ هَاشِمٍ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِيْ طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِيْ فِيْ عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِيْ اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيْتُ دَفْنَهُ قَالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكُثَ حِيْنًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا آلَ قُرَيْشٍ قَالُوْا هَذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِيْ هَاشِمٍ قَالُوْا هَذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ قَالَ أَيْنَ أَبُوْ طَالِبٍ قَالُوْا هَذَا أَبُوْ طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِيْ فُلَانٌ أَنْ أُبْلِغَكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِيْ عِقَالٍ فَأَتَاهُ أَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوْا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ كَانَتْ

تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيْزَ ابْنِيْ هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَلَا تُصْبِرْ يَمِيْنَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ يُصِيْبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ هَذَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّيْ وَلَا تُصْبِرْ يَمِيْنِيْ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ فَحَلَفُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ

> *'জাহেলি যুগে সর্বপ্রথম কাসামাহ[১] আমাদের হাশেমি গোত্রে অনুষ্ঠিত হয়। কুরাইশের কোনো একটি শাখা-গোত্রের একজন লোক বনু হাশিমের এক ব্যক্তিকে মজুর হিসাবে নিয়োগ করেছিল। মজুরটি তার সঙ্গে উটের কাছে গেল। ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর এক ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এ লোকটি তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর খাদ্যপূর্ণ বস্তার বাঁধন ছিঁড়ে যায়। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, "আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য করো, যেন আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে।" মজুর তাকে একটি রশি দিল। ঐ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। এরপর তারা (যখন মজুর ও মালিক) অবতরণ করল তখন একটি ছাড়া সকল উট বেঁধে রাখা হলো। মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তি মজুরকে জিজ্ঞেস করল, "সকল উট বাঁধা হলো কিন্তু এ উটটি বাঁধা হলো না কেন?"*
>
> *মজুর উত্তরে বলল, "এ উটটি বাঁধার কোনো রশি নেই।" সে জিজ্ঞেস করল, "এই উটটির রশি কোথায়?"*
>
> *এ কথা শুনে মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে শেষ পর্যন্ত এ আঘাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল।'আহত মজুরটি যখন মুমূর্ষু*

[১] কাউকে কোনো মহল্লায় জখমের চিহ্নসহ নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে আর তার হত্যাকারী জানা না গেলে নিহত ব্যক্তির লোকজনদের দাবির প্রেক্ষিতে সে মহল্লার পঞ্চাশজন ব্যক্তির এ মর্মে শপথ করা যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি আর তার হত্যাকারীকেও জানি না। পরিভাষায় একে কসামাহ বলা হয়। (বাহরুর রায়েক, ৮/৪৪৫) —অনুবাদক

অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুণছিল, তখন ইয়ামানি এক লোক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এবার হজে যাবেন?" সে বলল, "না, তবে অনেকবার গিয়েছি।" আহত মজুরটি বলল, "আপনি কি আমার সংবাদটি আপনার জীবনে যে কোনো সময় পৌঁছে দিতে পারেন?" ইয়ামানি লোকটি উত্তরে বলল, "হ্যাঁ।"

'তারপর মজুরটি বলল, "আপনি হজ উপলক্ষে মক্কায় উপস্থিত হলে, 'হে কুরাইশের লোকজন' বলে ডাক দেবেন। তারা আপনার ডাকে সাড়া দেওয়ার পর আপনি বনু হাশিম গোত্রকে ডাকবেন। তারা আপনার ডাকে সাড়া দিলে আপনি তাদেরকে আবু তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তাকে পেলে জানিয়ে দেবেন যে, অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে।" এর কিছুক্ষণ পর আহত মজুরটির মৃত্যু হয়ে যায়।

'মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তিটি মক্কায় ফিরে আসে। আবু তালিব তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের ভাইয়ের কী হয়েছে?" সে বলল, "আপনার ভাই হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করেছি। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি সমাহিত করেছি।" আবু তালিব বললেন, "তুমি এরূপ করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি।"'এভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

তারপর ঐ ইয়ামানি ব্যক্তি, যাকে সংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য মজুর ব্যক্তিটি ওসিয়ত করেছিল, সে হজ পালনের জন্য মক্কায় উপস্থিত হলো। এসে 'হে কুরাইশগণ' বলে ডাক দিল। লোকেরা বলল, "এই যে কুরাইশ।" সে আবার বলল, "হে বনু হাশিম।" লোকেরা বলল, "এই যে বনু হাশিম।" সে জিজ্ঞেস করল, "আবু তালিব কোথায়?" লোকজন আবু তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামানি লোকটি বলল, "আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার কাছে এ সংবাদটি পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে ওসিয়ত করেছিল যে, অমুক ব্যক্তি মাত্র একটি রশির কারণে তাকে হত্যা করেছে।"

'এ কথা শুনে আবু তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির কাছে গমন করে বললেন, "আমাদের তিনটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি তোমাকে মেনে

নিতে হবে। যেহেতু তুমি তাকে ভুলে হত্যা করেছ তাই হয়তো হত্যার বিনিময়ে একশত উট দেবে, অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য ৫০ জন লোক শপথ করে বলবে যে তুমি তাকে হত্যা করোনি। যদি তুমি এও করতে অস্বীকার করো তবে আমরা হত্যার বদলায় তোমাকে হত্যা করব।"

'হত্যাকারী ব্যক্তিটি তখন নিজ গোত্রীয় লোকদের কাছে গমন করে ঘটনা বর্ণনা করল। ঘটনা শুনে তারা বলল, "আমরা হলফ করব।" তখন বনু হাশিম গোত্রের এক নারী— হত্যাকারীর গোত্রে যার বিয়ে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও হয়েছিল—সে আবু তালিবের কাছে এসে বলল, "হে আবু তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি আমার এ সন্তানটিকে ৫০ জন শপথকারী থেকে রেহাই দেবেন, যে স্থানে শপথ নেওয়া হবে সেখানে তাকে নেবেন না।" আবু তালিব তার আবদার মঞ্জুর করলেন।

'তারপর হত্যাকারীর গোত্রের এক পুরুষ আবু তালিবের কাছে এসে বলল, "হে আবূ তালিব, আপনি একশত উটের পরিবর্তে ৫০ জনের শপথ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিজন শপথকারীর ভাগে দুটি করে উট আসে। আমার দুটি উট গ্রহণ করুন এবং যেখানে শপথ করার জন্য দাঁড় করানো হয় সেখানে দাঁড় করানো হতে আমাকে অব্যহতি দিন।" তারপর অপর ৪৮ জন এসে যথাস্থানে শপথ করল।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম, শপথ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ঐ ৪৮ জনের একজনও বেঁচে ছিল না।[১]

প্রথম পাঠ

কাসামাহ (শপথগ্রহণ) জাহেলি যুগের এক বিচারব্যবস্থা। ইসলাম একে বহাল রেখেছে। এ অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদনের অনুমতি দিয়েছে। এই ঘটনায় উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে যে মুকাদ্দামা মিলে যাবে সেই ক্ষেত্রে এই অনুযায়ী আমল

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ৩৮৪৫

করা হবে।

ব্যক্তিটি জুলুমের শিকার হয়ে মারা যাচ্ছে, জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে আরেক ব্যক্তির কাছে আবেদন করছে, যেন সে আবু তালিবকে তার নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে দেয়। এই ক্ষেত্রে হত্যাকারী তিনটির যেকোনো একটি গ্রহণের ইচ্ছাধিকার পাবে।

এক. আরবের রীতি অনুযায়ী যা ইসলাম পরে শর্তসাপেক্ষে বহাল রেখেছে, দিয়াত বা রক্তপণ স্বরূপ ১০০ উট প্রদান। দুই. হত্যাকারী ব্যক্তির বংশের ৫০ জন লোক শপথ করবে যে, সে হত্যা করেনি। তিন. হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে।

ইসলাম এই বিচারকার্য পছন্দ করেছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুযায়ী ফায়সালা করেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের মধ্যে এ পদ্ধতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। তারা যখন খায়বারের ইহুদিদের হাতে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার দাবি করেন তখন তিনি এই পদ্ধতিতে বিচার করেন।

দ্বিতীয় পাঠ

প্রাচীনকালের আরবের লোকেরা কাবা শরিফে গিয়ে রুকন এবং মাকামে ইবরাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করত।

জাহেলি যুগেও তাদের অনেকে নিষিদ্ধ কাজ এবং রক্তপাত করাটাকে গুরুতর মহাপাপ মনে করত। মিথ্যা শপথ করতে তারা অস্বীকৃতি জানাত।

আবার তাদের মধ্যে এমন বহু লোক ছিল যাদের অঙ্গীকারের কোনো বালাই ছিল না। না-দেখা সত্ত্বেও তারা শপথ করে ফেলত।

কখনো সম্পূর্ণ মিথ্যা শপথ করত। ঘটিয়ে ফেলা বিষয়কে অস্বীকার করে বসত। যেমনটা আমরা এই ঘটনায় প্রত্যক্ষ করলাম।

এ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হয়েছিল যে, সে চাইলে তার সম্প্রদায়ের ৫০জন ব্যক্তিকে তার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হওয়ার ব্যাপারে শপথ করাতে পারে।

তখন তার কাছে হাশেমি গোত্রের এক নারী আসে, হত্যাকারী বংশের এক ব্যক্তির

সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল। নারীটি এসে তার সন্তানকে এই শপথ থেকে রেহাই দেওয়ার আবেদন জানায়। আরেক ব্যক্তি মূর্তি পূজা করা সত্ত্বেও এই মিথ্যা শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সে মনে করেছিল যে, ৫০ জনের প্রত্যেকের শপথ হত্যাকারীর জিম্মায় আবশ্যক হওয়া দুটি উটের বদলা হয়ে যায়। তাই সে আবু তালিবকে দুটি উট প্রদান করে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়। অবশিষ্ট ৪৮ জন এ মর্মে শপথ করে যে, এই ব্যক্তি হত্যা করেনি।

এই ঘটনার এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মিথ্যা শপথকারী প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করে।

তৃতীয় পাঠ

আপনার সম্প্রদায় ও পরিবার-পরিজনদের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

ভালোবাসা একবিষয় এবং পক্ষপাতিত্ব ভিন্ন বিষয়। বাতিল তো বাতিলই। আমাদের ভালোবাসার পাত্র কেউ নিয়ে এলেও তা বাতিলই থাকে। আর হক তো হকই। যদিও আমাদের অপছন্দনীয় কেউ তা নিয়ে আসে।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বা আত্মীয়তা—প্রভৃতি বিষয় অভিজাত লোকদের দল হতে পারে না; বরং উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারই তাদের দল।

মেয়ের প্রতি ভালবাসার অর্থ এটা নয় যে, আপনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে অন্যায় ক্ষেত্রে তার পক্ষপাতিত্ব করবেন! ছেলেকে ভালোবাসার অর্থ এটা নয় যে, সে তার স্ত্রীর ওপর জুলুম করাকে আপনি মেনে নেবেন! বন্ধুকে ভালোবাসার অর্থ এটা নয় যে, তার ঘুষ গ্রহণে আপনি চোখ বুজে থাকবেন। প্রকৃত ভালোবাসা হলো—যাদেরকে আমরা ভালোবাসি তাদেরকে জুলুম থেকে বিরত রাখা। তাদের জুলুমের মুখে চুপ থাকা, তা গোপন করা, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা—এগুলো তো প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গে জুলুমে অংশগ্রহণেরই নামান্তর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন, 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো চাই সে জালেম হোক বা মাজলুম।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে মাজলুম হলে তো আমরা তাকে সাহায্য করব কিন্তু সে জালেম হলে আমরা তাকে কীভাবে সাহায্য করব?'

তিনি বললেন, 'তাকে বাধা প্রদান করবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।'[১]

চতুর্থ পাঠ

আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করবেন না।

জাহেলি যুগের মানুষগুলো যেন ধর্মের দিক থেকে আপনার চেয়ে অধিক মুত্তাকি না হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তো মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোনো কাফেরের উপর জুলুম করাটাও পছন্দ করেন না। তাহলে এর মাধ্যমে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করাকে তিনি কীভাবে পছন্দ করতে পারেন?

আমাদের আলোচ্য ঘটনার হত্যাকারী, নিহত ব্যক্তি, নিহত ব্যক্তির পরিবার—সকলেই মুশরিক ছিল।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার নামে কোনো মুশরিক অপর কোনো মুশরিকের উপর জুলুম করাকে পছন্দ করেননি। এই কারণে যারা তার নামে মিথ্যা কসম করেছিল এক বছর অতিবাহিত না হতেই তাদের সকলেরই মৃত্যু হয়ে যায়। এর মাধ্যমে বোঝা গেল, দুনিয়াতে প্রতিশোধ না নিলেই বিষয়টি শেষ হয়ে যায় না।

ঘটনার নথিপত্র সেখানেই বন্ধ করে দেয়া হয় না।

বরং একটু পরই আখেরাত অপেক্ষা করছে। সেখানে বিচার কায়েম হবে। সে বিচারে এমন এক দলিল থাকবে, যাতে ছোট-বড় সকল কার্যাবলির হিসাব থাকবে। সেখানকার বিচারক হবেন আকাশ ও জমিনের মহাপ্রতাপশালী মালিক আল্লাহ তাআলা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাত-পা—সবকিছু যাঁর সামনে একে একে সাক্ষ্য দিতে থাকবে।

বিষয়টিকে ভালোভাবে স্মরণে রাখুন, দুনিয়ার জীবনের মুক্তি তো কেবল ক্ষণিকের মুক্তি!

জ্ঞানী তো সে, যে পরকালের বিচারের কাঠগড়ায় মুক্তি পাওয়ার জন্য দুনিয়ার কাঠগড়ায় সত্য বলে যায়।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস-ক্রম : ২৪৪৪

পঞ্চম পাঠ

ইসলাম তার পূর্ববর্তী আরব-জীবনের ওপর 'জাহেলি' শব্দটি প্রয়োগ করেছে। এ জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞতা কেবল ধর্মীয় দিক থেকে প্রযোজ্য। কারণ তারা ওই সময় মূর্তিপূজা করত। অবশ্য ওই সময় তারা বিভিন্ন অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল, কিন্তু তাদের অনেকেই বহু চারিত্রিক শিষ্টাচারে ঋদ্ধ ছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস থেকে এ কথার প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন—'আমি তো মহৎ চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[১]

এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি যে, আরবের লোকেরা সুউন্নত চরিত্রকে খুব পছন্দ করত। এটা ইসলামের ইনসাফ। ইসলাম প্রতিপক্ষের সঠিক বিষয়গুলোর স্বীকৃতি দান করে থাকে আর ভুল বিষয়গুলোতে ভিন্ন অবস্থান বর্ণনা করে।

তাই কোনো ব্যক্তির প্রতি রাগান্বিত হয়ে গেলে তার শ্রেষ্ঠত্ব, কৃতিত্ব এবং তার উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বিস্মৃত হবেন না। আর কোনো মানুষকে ভালোবাসলে তার ভুল-ত্রুটির কথা ভুলে যাবেন না।

আমরা এমন এক উম্মত—যারা নিষ্ঠার ভিত্তিতে কাউকে ভালোবাসে এবং নিষ্ঠার ভিত্তিতেই কাউকে অপছন্দ করে।

ষষ্ঠ পাঠ

জাহেলি যুগের আরবদের আচার-আচরণের আলোচনা চলে আসায় প্রাসঙ্গিকভাবে এ সংক্রান্ত তাদের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

আশা করি, তা এ কিতাবের কস্তুরীপূর্ণ মোহর হবে।

[১] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/১৮

প্রথম ঘটনা

কায়েস ইবনে সাদকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কি কখনও আপনার চেয়ে বদান্যশীল কাউকে দেখেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা একবার এক বেদুইন নারীর কাছে আশ্রয় নিলাম। তার স্বামী ঘরে এলে তিনি স্বামীকে বললেন, "আমাদের কাছে দুজন মেহমান এসেছে।" তখন তিনি একটি উট জবাই করে বলেন, "এটা আপনাদের জন্য।" এর পরের দিন তিনি আরেকটি উট এনে তা জবাই করে বলেন, "এটা আপনাদের জন্য।" আমরা তাকে বললাম, "গতরাতে যেটা জবাই করা হয়েছে আমরা সেখান থেকে সামান্যই খেয়েছি।" তিনি বললেন, "আমি আমার মেহমানদেরকে বাসি খাবার খাওয়াই না।" 'আমরা তার কাছে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। তখন প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছিল আর তিনিও প্রতিদিন আমাদেরকে এভাবে আপ্যায়ন করছিলেন। এরপর যখন আমরা সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন তার বাড়িতে একশত দিনার রেখে দিলাম। যাওয়ায় সময় ওই নারীকে বললাম, "আপনার স্বামীর কাছে আমাদের ওজর পেশ করবেন।"

'আমরা বের হয়ে গেলাম। যখন দিনের আলো কিছুটা ফুটে উঠল তখন আমরা পেছন থেকে এক ব্যক্তির চিৎকার শুনতে পেলাম। লক্ষ করে দেখলাম সেই বেদুইন লোকটি বলছেন, "হে সম্মানিত আরোহীগণ, দাঁড়ান! আপনারা আমাদেরকে মেহমানদারির মূল্য পরিশোধ করে গিয়েছেন!" বেদুইন লোকটি আমাদের কাছে এসে বললেন, "আপনাদের এই দিনার নিয়ে যান, অন্যথায় এ বর্শার মাধ্যমে আপনাদেরকে আঘাত করব।"

'আমরা দিনারগুলো গ্রহণ করে সেখান থেকে প্রস্থান করি।'

দ্বিতীয় ঘটনা

জাহেলি যুগে এক বেদুইন তার তাবুর বাইরে শোরগোল শুনতে পেয়ে অবস্থা দেখার জন্য বের হয়। বের হয়ে দেখে যে, তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে এসেছে। সে তাদের জিজ্ঞেস করে, 'ঘটনা কী?' তারা বলল, 'আমরা একটি ফড়িংয়ের পিছু নিয়েছি। ফড়িংটি আমাদের হাত থেকে পলায়ন করে তোমার তাবুতে আশ্রয় নিয়েছে। এখন আমরা এটি নিয়ে যেতে চাচ্ছি।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে তার তাবুতে প্রবেশ করে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বের হয়ে বলল, 'একটি ফড়িং আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, আমি কীভাবে তাকে তোমাদের কাছে অর্পণ করতে পারি!' বেদুইন লোকটি এই ফড়িং পাহারা দিতে থাকে। একসময় সূর্যের তাপ কমে যায়। বালু ঠান্ডা হয়ে যায়। ফড়িংটি উড়ে চলে যায়। তখন সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে, এখন চাইলে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি ধরতে পারো। এরপর লোকটি তাবুতে প্রবেশ করে।

তখন থেকে আরবের লোকেরা পক্ষপাতিত্বের কারণে কারও প্রশংসা করতে চাইলে বলে থাকে—

'সে ফড়িংয়ের আশ্রয়দানকারী লোকটির চেয়েও অধিক আশ্রয়দানকারী!'

তৃতীয় ঘটনা

কবি ফারাজদাকের দাদা সা'সাআকে জীবন্ত-প্রোথিত-কন্যাদের ত্রাণকর্তা বলা হতো।

এর কারণ হচ্ছে, তিনি একবার নিজ সম্প্রদায়ের এক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। লোকটি একটি কূপ খনন করছিল আর তার স্ত্রী পাশে বসে ক্রন্দন করছিল।

ফারাজদাক নারীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেন ক্রন্দন করছ?' সে বলল, 'আমার স্বামী আমার এই মেয়েটিকে জীবন্ত প্রোথিত করতে চায়।' তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। লোকটি বলল, 'দারিদ্র্যের কারণে এমন করছি।' তিনি বললেন, 'মেয়েটিকে আমি দুটি উটের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে ক্রয় করে নিলাম। তুমি তাকে আর জীবন্ত প্রোথিত করো না।' লোকটি বলল, 'ঠিক আছে।' তিনি তাকে দুটি উট প্রদান করে বলেন, 'মেয়েটিকে তুমি নিজে লালন-পালন করো।'

এরপর তিনি এটা বলতে বলতে চলে যান যে, এটি এমন এক মর্যাদাকর বিষয়, আমার পূর্বে কোনো আরব যা অর্জন করতে পারেনি। আরশের কসম! আমি কোনো সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার ব্যাপারে জানতে পারলে অবশ্যই তাকে রক্ষা করব।

তিনি তিনশত মেয়েকে জীবন্ত প্রোথিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

চতুর্থ ঘটনা

নুমান ইবনে মুনজির আরবের একজন প্রসিদ্ধ বাদশাহ ছিলেন।

তার নিয়ম ছিল—একদিন তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সকলকেই হত্যা করতেন আর অপর দিন সাক্ষাৎ-ঘটা সকলের সঙ্গে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করতেন। বিপুল অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিতেন। অর্থাৎ একটি ছিল তার যুদ্ধের দিন আর অপরটি শান্তির দিন।

একবার তাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি নুমানের যুদ্ধের দিন দারিদ্র্যের কারণে ঘর থেকে বের হয়। লোকটি পথ চলছিল। পথিমধ্যে নুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যায়। সে বুঝতে পারে— নুমান তাকে হত্যা করবেন।

লোকটি তখন নুমানকে বলল, 'বাদশাহ, আপনার কল্যাণ হোক, আমার ছোট ছোট সন্তানাদি এবং পরিবার-পরিজন রয়েছে। তারা সকলেই ক্ষুধার্ত। আজ আমি তাদের খাবারের অনুসন্ধানে বের হয়েছি। দিবসের শুরুতে কিংবা শেষে যখনই আপনি আমাকে হত্যা করুন, এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে

বাদশাহ যদি আমাকে এই সামান্য খাবার তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুমতি দিতেন তাহলে এগুলো পৌঁছে দিয়ে আমি আপনার কাছে ফিরে আসতাম!'

বাদশাহ বললেন, 'আমাদের কেউ তোমার জামিন না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না। যদি তুমি না ফিরে আসো তাহলে আমরা তোমার পরিবর্তে জামানতদাতাকে হত্যা করব।'

শুরাইক ইবনে আদি নুমানের দাবা খেলার সঙ্গী ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লোকটির দুরবস্থা দেখে তার অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বাদশাহর কল্যাণ করুন! আমি তার জামানত গ্রহণ করলাম।' লোকটি দ্রুতগতিতে নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়।

এদিকে দিবসের বেশিরভাগ অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। বাদশাহ নুমান শুরাইককে বললেন, '

দিবসের বড় একটি অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু এখনো তোমার লোকটি

উপস্থিত হলো না।' শুরাইক বললেন, 'সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত বাদশাহ আমাকে কিছুই করতে পারবেন না।'যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল নুমান তখন শুরাইককে বললেন, 'তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও।' শুরাইক বললেন, 'এই তো এক ব্যক্তি দৌড়ে আসছে। আশা করি সেই হবে তাঈ। সে যদি তাঈ না হয় তাহলে বাদশাহর আদেশ শিরোধার্য।'

সকলেই অপেক্ষা করতে থাকে। একসময় তারা দেখতে পায়, তাঈ গোত্রের লোকটি অতি দ্রুত দৌড়াতে দৌড়াতে এসে উপস্থিত হয়। এরপর সে নুমানকে বলে, 'বাদশাহ নামদার, আপনি আদেশ করুন।'

বাদশাহ নুমান তখন কিছুসময় মাথা নিচু করে রাখেন। এরপর মাথা উঁচু করে বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের দুজনের চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক ব্যক্তি আর কাউকে পাইনি।

হে তাঈ! তুমি ওয়াদা পূরণের ক্ষেত্রে কারও জন্যই কোনো শীর্ষস্থান বাকি রাখোনি।

আর হে শুরাইক! তুমি বিপদে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কারও জন্য কোনো শীর্ষস্থান রাখোনি।

আল্লাহর কসম! আজ থেকে আমি কাউকে কোনো কষ্টে ফেলব না।

আমি আমার যুদ্ধের দিন উঠিয়ে নিলাম। আমার অভ্যাস পরিত্যাগ করলাম।'

পঞ্চম ঘটনা

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

একবার হাতেম তাঈকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আরবে কি আপনার চেয়ে বড় দানবীর কেউ আছেন?'

তিনি বললেন, 'আরবের সকলেই আমার চেয়ে বড় দানবীর। এক রাতে আমি এক এতিম বালকের কাছে যাই। তার একশটি ছাগল ছিল। এরমধ্য থেকে সে আমার জন্য একটি ছাগল জবাই করে। ছাগলটি পেশ করলে আমি বলি, "ছাগলের মগজ কতই-না সুস্বাদু!" বালকটি এরপর আমার কাছে একটি একটি করে মগজ আনতে থাকে আর আমি বলতে থাকি যথেষ্ট হয়েছে। 'সকাল হলে দেখি বালকটি

তার মালিকানায় থাকা একশ ছাগলের সবগুলো জবাই করে ফেলেছে! এখন তার কাছে একটি ছাগলও অবশিষ্ট নেই!'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি তখন বালকটির সঙ্গে কী আচরণ করেছেন?' তিনি বলেন, 'আমি তাকে আমার সেরা উটের মধ্য থেকে একশটি উট প্রদান করি।'

লোকেরা বলল, 'তাহলে তো আপনি তার চেয়ে বড় দানশীল!'

তিনি বললেন, 'না, বরং সেই আমার চেয়ে বড় দানশীল। কারণ, আমার কাছে যা ছিল আমি তার সামান্য কিছু তাকে প্রদান করেছি, কিন্তু সে তার কাছে যা ছিল তার পুরোটাই আমাকে দিয়ে দিয়েছে।'

মাকতাবাতুল আসলাফ কর্তৃক

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	বই	লেখক
১	সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. (মৃত্যু: ৭৯৫ হি.)
২	সালাফদের দৃষ্টিতে আহলে হাদীস	আবদুল্লাহ আল মাসউদ
৩	তাজওইদ	যাইনাব আল-গাযী
৪	রুকইয়াহ	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
৫	দুখের পরে সুখ	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
৬	কুররাতু আইয়ুন : যে জীবন জুড়ায় নয়ন	ডা. শামসুল আরেফীন
৭	শয়তানের চক্রান্ত	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
৮	গুরাবা	আবূ বকর আল-আজুররী রহ. (মৃত্যু ৩৬০ হি.)
৯	নবীজীর সংসার ﷺ	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
১০	নবীজীর দিনলিপি ﷺ	শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরি
১১	সালাফের দরবারবিমুখতা	ইমাম আবু বকর মাররূযী রহ. (মৃত্যু: ২৭৫ হি.)
১২	গুনাহ মাফের আমল	ড. সায়্যিদ বিন হুসাইন আফফানী
১৩	ইসলামের ইতিহাস : নববী যুগ থেকে বর্তমান	ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি
১৪	কুররাতু আইয়ুন - ২	ডা. শামসুল আরেফীন
১৫	ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ : নববী যুগ থেকে বর্তমান	সাদিক ফারহান
১৬	যিকিরে-ফিকিরে কুরআন	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
১৭	সান্নিধ্যের সৌরভে	ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)
১৮	নবীজির পাঠশালা ﷺ	আদহাম শারকাভি

নবীজি ﷺ এর মুবারক হাদিসভাণ্ডারে পূর্বেকার নবীগণের ঘটনা, তাঁদের উম্মতের ঘটনা কিংবা সাহাবীদের বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আচ্ছা... কেমন হয়, যদি এসব ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এর শিক্ষণীয় বিষয়গুলো একত্রিত করা হয়? কোন ঘটনা থেকে আমরা কী শিখতে পারি, কীভাবে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি তা একেবারে সহজ ভাষায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে বুঝিয়ে দেয়া হয়?

জি, এমনটিই করা হয়েছে 'নবীজির পাঠশালা ﷺ' বইটিতে। এতে নবীজি ﷺ এর মুবারক হাদিসভাণ্ডার হতে ৩১টি বিশুদ্ধ হাদিস একত্রিত করা হয়েছে। ঘটনা বর্ণনার পর তা থেকে গ্রহণীয় শিক্ষাগুলো দারস আকারে প্রতি ঘটনার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি দারসে রয়েছে জীবনঘনিষ্ট উপদেশমালা, আছে জীবন পথে চলার পাথেয়। কিছু ঘটনা হয়ত আপনি জানেন। বারবার শুনেছেন, পড়েছেন। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, এভাবে কখনো ভেবে দেখেন নি। একই ঘটনা হয়ত পড়বেন এবার। কিন্তু এবার তা হৃদয়কে নাড়া দিবে। জীবন পরিবর্তন করে দিবে ইন শা আল্লাহ।

তাহলে দেরি কীসের? চলুন ঘুরে আসি, নবীজি ﷺ এর পাঠশালায়। মুগ্ধ হয়ে হাদিসের গল্প-ঘটনা শুনবো, সাথে এর মাঝে ছড়িয়ে থাকা মনিমুক্তোও সেচে আনবো। নবীজির পাঠশালায় ﷺ আপনাকে স্বাগতম।

মাকতাবাতুল আসলাফ
দোকান নং: ১৮ (আন্ডারগ্রাউন্ড),
ইসলামি টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
01762391754, 01733498004

ISBN

Cover: Abul Fatah I 01914783567